কা ম রু জ্জা মা ন জা হা ঙ্গী র

চেমলনামা

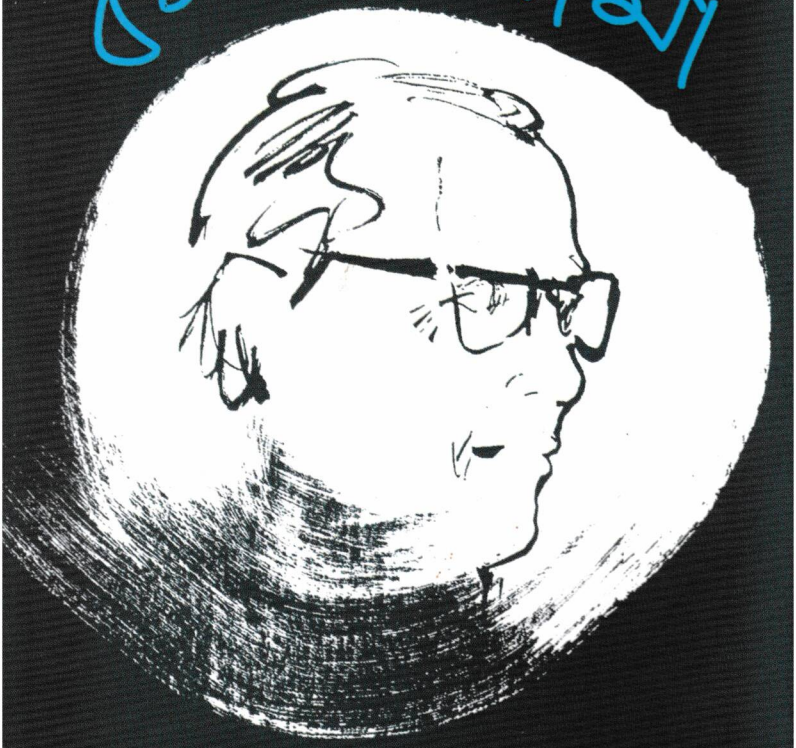

কমলকুমার মজুমদার ছিলেন লেখকদের লেখক। এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল বহু বছর আগে। তাঁর গদ্য নিয়ে, বাক্যবিন্যাস নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। তাঁর সৃজনে, বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পে ফরাসি বৈদগ্ধ্যের, ভাষারীতির ছাপ থাকলেও আদ্যন্ত বাংলা এবং বাঙালির জীবনের নানা অনুষঙ্গকে গভীর বোধে তিনি বহুমাত্রা নিয়ে ছুঁয়ে ছিলেন। তাঁর ভাষা কখনো-সখনো পাঠককে প্রহত করলেও তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে আছে জীবনের নানা দিক, যা ক্লেদ, ঘৃণা, দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রেম-অপ্রেম উন্মোচনে বহুবর্ণিল ও বহুকৌণিক।

কমলকুমার মজুমদারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই গ্রন্থে বিরলপ্রজ এই লেখকের সৃজনভাবনা ও সৃষ্টির উদ্যান নিয়ে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

Rokomari.com
কমলনামা
কামরুজ্জামান জা...
181029
96262#292853-1

কমলকুমারকে পাঠ করা মানে কথনশিল্পের নবতর এক ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া – এক নিঃসঙ্গতার দাপটকে বুঝতে পারা। কমলকুমার একটা নাম মাত্র নয়, কথাশিল্পের একটা ইতিহাস সৃজনকারী। সেই ইতিহাসে আলাদা একটা ভাষা আছে, আড্ডামুখর চরিত্র আছে, শিল্পসংস্কৃতির চরিত্রসমূহকে চিহ্নিত করার নিজস্ব কৌশল আছে। তাঁর আছে ভালোবাসা, শিল্পের প্রতি নিগূঢ় টান। তিনি একা যেন সেই ধারায় থাকতে চান না। কিন্তু তাঁর বলার ধরনটা এমন যে তাঁকে একা একাই কূলকিনারা পাড়ি দিতে হয়।

কথাশিল্পের চলতি ধারাকে তিনি মান্য করতে চাননি, – কথনশিল্পে তিনি নিজের একটা মেজাজ, সত্য, রুচি নির্মাণ করে গেছেন। কথনশিল্পের উপনিবেশ-মানসকে তছনছ করে উপনিবেশ-উত্তর দেশজ সাহিত্যময়তাকে লালন করেছেন। দেশজ লৌকিকতাতে নিজের ধারায়, স্বশাসিত ভাষায়, এমনকি কথনের ইউরোপতার বদলে আমাদের নিজস্ব মেজাজ বের করায় সচেষ্ট থেকেছেন। তবে তা ছিল একান্তই কমলের; যা অতীব জটিল। ছোটকাগজের দ্রোহমুখর প্রবণতাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের সাহিত্যজগতের আলাদা সত্তা যেন।

এ লেখক কমলকুমারের সার্বিক সাহিত্য-প্রবণতা, অবস্থান, মানসিকতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। কমলকুমারের মতো জটিল লেখককে পাঠ করার জন্য, তাঁকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় এক গ্রন্থ হয়ে থাকবে তা।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর

তাঁর জন্ম ১৯৬৩-এ, মামাবাড়িতে। কিশোরগঞ্জস্থ বাজিতপুর থানার সরিষাপুর গ্রামে শৈশব-কৈশোর, যৌবনের প্রাথমিক পর্যায় কাটান তিনি। স্কুল-কলেজের পড়াশোনা করেছেন গ্রাম ও গ্রামঘেঁষা শহরে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা করেন চট্টগ্রামে। লেখাজোখা তাঁর কাছে অফুরন্ত এক জীবনপ্রবাহের নাম। মানুষের অন্তর্জগতে একধরনের প্রগতিশীল বোধ তৈরিতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন জায়গায় – ছোট বা বড়কাগজে তিনি লিখে যাচ্ছেন। কথাসাহিত্যের ছোটকাগজ *কথা*র সম্পাদক।

ISBN-978-984-33-8567-3

কমলনামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ চারটি

মৃতের কিংবা রক্তের জগতে আপনাকে স্বাগতম (জাগৃতি প্রকাশনী)

স্বপ্নবাজি (ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ)

কতিপয় নিম্নবর্গীয় গল্প (শুদ্ধস্বর)

ভালোবাসাসনে আলাদা সত্য রচিত হয় (জোনাকী)

উপন্যাস তিনটি

পদ্মাপাড়ের দ্রৌপদী (মাওলা ব্রাদার্স)

যখন তারা যুদ্ধে (জোনাকী)

দেশবাড়ি শাহবাগ (শুদ্ধস্বর)

প্রবন্ধগ্রন্থ দুটি

উপন্যাসের বিনির্মাণ, উপন্যাসের জাদু (জোনাকী)

কথাশিল্পের জল-হাওয়া (শুদ্ধস্বর)

সাক্ষাৎকারভিত্তিক গ্রন্থ একটি

কথা'র কথা (আগামী প্রকাশনী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা ম রু জ্জা মা ন জা হা ঙ্গী র

বেঙ্গল
পাবলিকেশন্‌স

বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঙ্গল
পাবলিকেশন্‌স

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ॥ প্রকাশক আবুল খায়ের, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, বেঙ্গল সেন্টার, প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড খিলক্ষেত, ঢাকা ১২২৯, বাংলাদেশ।
ফোন ০১৫৫১৮৮৮০০০, ০১৫৫১৮৮৮১১১, ০৯৬৬৬৭৭৩৩১১
গ্রন্থস্বত্ব নাভিদ জামান ধ্রুব ও রেনেসাঁ জামান ঐশী
প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল
মুদ্রণ এম কে প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৮৯/১ তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮
মূল্য ৩০০ টাকা
ISBN-978-984-33-8567-3

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি, সাহিত্যব্যক্তিত্ব, প্রিয়জন
সাজ্জাদ শরিফকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

কমলের জীবন, কমলের সাহিত্য ৯

লীলায় দ্রোহে কমলকুমারের উপন্যাস ২৩

গল্পের কমলকুমার লোকায়ত দ্রোহের মায়াবী বাউলিয়ানা ৪৪

আসুন, আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করি এবং এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলি ৭৭

অন্তর্জলী যাত্রার সঙ্গ, প্রসঙ্গ, প্রতিসঙ্গ ৭৯

*শবরীমঙ্গল*কথা ৯১

পিঞ্জরে বসিয়া শুককথা ৯৭

গোলাপ সুন্দরী : কথাই যখন গোলাপের সৌন্দর্য ১০৪

মায়ারও যে জন্মান্তর হয়! ১১০

দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়ানো উপন্যাস ১১৮

সৌন্দর্য, স্বাধীনতা কিংবা পমেটমকথা ১২৪

নামহীন গোত্রহীন মানুষের দুর্ভিক্ষকথা ১৩১

মানবপূজারি কমলকুমার ১৩৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলের জীবন, কমলের সাহিত্য

আমরা কথাশিল্পী কমলকুমার মজুমদারকে স্মরণ করছি, তাঁর জীবন আর সাহিত্যযজ্ঞে নিমগ্ন হচ্ছি। তিনি যে জন্মেছিলেন তাতে শতবর্ষ পার হয়েছে, — তাঁর এ স্মৃতির ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের কাছে অপরিহার্য সত্তা রূপে বিরাজ করছেন। তিনি যে জীবন পার করে গেলেন, তা আসলে সমাপ্ত হবার নয়, তা যে রয়ে যাবে, তাই আমরা স্মরণ করতে চাই। সময় যত যাচ্ছে, যতই কথাসাহিত্যের নানান বাঁকবদল আমরা প্রত্যক্ষ করছি, ততই যেন কমলকুমারও আমাদের অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। তিনি কেন এভাবে এমন ভিন্ন ঘরানার সাহিত্য সৃজন করলেন; কেন তাঁর জীবনটাই অন্যদের ভিড়ে মিশে যায় না, — কেন তিনি একা একাই আলাদা হয়ে থাকেন, তা নিয়ে আমরা ভাবি। আমাদের কথা বাড়তে থাকে। আমরা কমলের সাহিত্য, তাঁর সৃজনময়তায় মত্ত হই। সাহিত্য নিয়ে তাঁর কত ধরনের ভাবনা, কত তার আয়োজন! তাঁর কি এমনটি না হয়ে উপায় ছিল না? কলোনিয়াল সাহিত্য আর সনাতন ধর্মের কিছু ধারাই কি তাঁকে ভিন্ন ধারার সাহিত্য রচনার প্রতি আকর্ষণ করল? তিনি দেশজ রূপে নিজেকে কতভাবে যে জারিত করতে থাকলেন! তাঁর ভাষা আলাদা হলো। তাঁর সৃজনভঙ্গি আলাদা হলো, তাঁর লেখনশৈলী একেবারে নিজস্ব হয়ে গেল। বাংলার অনেকটুকু জমিন তাঁর লেখায় আছে, অনেকটুকু ধর্মপথও তাঁর লেখায় মিশেছে; শুধু গঙ্গা নয়, অনেক জলই তাঁর প্রেমে পড়েছে। তিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে বেহুলাবাংলার ঘ্রাণ মেখেছেন। তিনি যে জটিল-কঠিন হলেন, তার জবাব না হয় তিনিই দেবেন, কিন্তু তাঁর সৃজিত মানবলীলার কাছে আমরা যাব। আমরা কমলকুমার নিয়ে তাই অনেক কথাই ভাবি। তাঁকে আমাদের ভাবনায় রাখতে হয়। এবার তাঁর যে জন্মশতবর্ষ! আমরা প্রতিবার তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃজিত নানা কথা, স্মৃতি, ভাবের পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকি, — তাঁকে নিয়ে আমরা কথা বলি, তাঁর সখিতা ছাড়তে আমাদের মন চায় না। কেন তাঁর সঙ্গে কথা বলি? কেন আমরা তাঁর সঙ্গলিপ্সা ত্যাগ করি না? কারণ আমাদের মায়া তবু রয়ে যায় তো। কার জন্য তা রয়ে গেল? কার জন্য আবার, কমলকুমারের জন্য!

আমরা কমলকুমারকে স্মরণ করব, একটা ব্যক্তিত্বকে আমাদের একেবারে মনমাজারে এনে ছুঁয়ে দেখব। আমরা একটা ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করব, তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা সম্পর্ক হয়ত করে নেবো। আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বের নানান অবস্থানের ভেতর দিয়ে, চিন্তার ভেতর দিয়ে, কর্মের ভেতর দিয়ে হয়ত আমাদেরকেও দেখে নিতে পারব। একশ বছর পার হয়ে আসা একটা ব্যক্তিত্বকে আমরা নানাভাবে দেখতে পারি। এর জন্য তাঁর জীবন আছে, আছে তাঁর রচনা, তাঁর পছন্দের সাহিত্য, নানান কথাবার্তা। তাঁর তো শুধু দারুণ জীবন নাই, আছে সখিতার এক জগৎ, পছন্দের এক লীলাক্ষেত্র, কাব্যতৃষ্ণার জায়গা, আছে ভাববিগ্রহের অপার জায়গা-জমিন।

কমলকুমারের মতো সাহিত্যমগ্ন মানুষের জন্মশতবর্ষ পালন তো একটা ঘটনা বটে। তিনি নিজেই একটা অবস্থান হয়ে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, ফিল্মে, চিত্রে, নাটকে, সম্পাদনায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর রসবোধ, সাহিত্যময়তা, জানার পরিধি এত ব্যাপক যে তাঁকে চলমান এক সাহিত্যমগ্নসত্তা বলা যায়। তিনি এক ভ্রাম্যমাণ রেফারেন্স, এক ডিকশনারি যেন। সাহিত্যের এক ইতিহাসও বটেন! আমরা সেই ইতিহাসসনে খানিক মগ্ন থাকার জন্য নিজেদেরকে দেখার বাসনা থেকেই যেন এতসব কথার ইতিবৃত্ত করছি। তাঁর জীবনের নানান ইতিহাস, কথকতা, পাঠের বিচিত্র কথন আছে, আমরা তাতে না গিয়ে আপাতত তাঁর পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর ধরন নিয়েই কিছু কথা বলি। তাঁর জীবন, শিল্পময়তা, তাঁর রঙের কথা, চিত্রের কথা, এমনকি মৃত্যুলগ্নতার কথা ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করি।

তাঁকে পাঠ করাও তো একটা বিষয় বটে। তাঁকে আমি কখন থেকে পাঠ করছি তা একেবারে হিসাব করে বলা মুশকিল, তবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ পাঠের সঙ্গে আরও আরও বিষয় যুক্ত করতে হবে। তাঁকে পাঠ মানে শুধু তাঁর সাহিত্যপাঠ বলে আমি মানতে চাইছি না। এজন্য অবশ্য একধরনের জৈবিক বাসনা প্রয়োজন, তাঁর কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি তাঁর পাঠকে তাঁর প্রিয় গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন বলে মনে করা যায় না। তাহলে তো বিদ্যাসাগর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিম, সঞ্জীবচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শরৎ, জগদীশ, বনফুলের গল্প বা *বিষাদ সিন্ধু*, *চাহার দরবেশ*, *মেঘদূত*, *ঠাকুরমার ঝুলি* ইত্যাদির রস নিলেই হলো। কিংবা উপনিবেশপূর্ব সাহিত্যকথার সঙ্গে পরিচয় করে নিলেই হয়। অথবা রামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ আর রামপ্রসাদের কাব্যবিগ্রহ আত্মস্থ করে নিলেই হয়। তবে এর সঙ্গে একটা বিষয় বলা যায়, তাঁকে আত্মস্থ করতে হলে, দেশি-বিদেশি ক্লাসিক যেমন জানা দরকার, তেমনি শাক্ত পদাবলির সমস্ত আয়োজনে নিজেকে সমর্পণ করা দরকার।

যে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠানবিমুখতা থাকে

আমরা এটা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে তাঁর ব্যক্তিত্বের লালন, চর্চা, বিকাশ বড়ই অদ্ভুত। তিনি কলকাতার মানুষ, কিন্তু কলকাতা তাঁকে সেইভাবে যেন স্পর্শ করে না। তিনি কফি হাউসে গেলেও মানুষটি যেন মদময় জীবনের সেই খালাসীটোলারই। কলকাতার ভিড়বাট্টা নয়, গঙ্গাতেই তিনি মগ্ন থাকতে চেয়েছেন। শহরের মধ্যবিত্ত নয়, রিখিয়ার সাঁওতালরা যেন তাঁর অন্তর জুড়ে থাকল। তিনি এমন এক জগৎ নির্মাণে মত্ত ছিলেন, যার কোনো ফলোয়ার ছিল না। বড় কাগজে তিনি লিখেছেন, এমনকি *আনন্দবাজারে* তাঁর লেখা আছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটুকু জায়গা যেন ছোটকাগজই দখল করে রেখেছে। তিনি প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা (যেটুকুই পড়েছেন আর কি!) করলেন, অথচ তাঁর অন্তর দখল করে আছে পড়াশোনা না-জানা রামকৃষ্ণ।

তিনি যে ভাষার ভেতর বড় হয়েছেন, মানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার কথা বলা হচ্ছে আর কি, তাতে তো তাঁকে একজন মানিক বা সতীনাথই হওয়ার কথা! তা তো তিনি হন নাই। যে চিহ্নের ভেতর, বাক্যের ভেতর, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর তিনি ছিলেন, তা তাঁকে টানেনি। তিনি আলাদা এক চরিত্র হয়েছেন। তিনি তাঁর কালকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু ১৯৪৭ সালে, তখন তাঁর 'লাল জুতো' বের হয়। কিন্তু তখনো বাঙালির বা ভারতীয়র মানসকাঠামো থেকে উপনিবেশ বিদায় নেয়নি। তবে বাংলার একটা লোকাচার তো ছিল। তাও তাঁকে টানতে পারেনি। তিনি ফ্যাশনেবল থাকলেও তাঁর শিল্প-সাহিত্যচর্চার শুরু থেকে ধুতি-পাজামা পরেটরে আলাদা এক স্টাইল নিলেন। বোদলেয়ার, মালার্মে তাঁকে টানলেও, সুধীন-বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ মোহ থাকলেও, রামকৃষ্ণ-রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রই তাঁকে অধিক আকর্ষণ করতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সময় ছিল প্রগতিশীলতার, অন্তত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে যারা থাকত তারা মার্কস-অ্যাঙ্গেলস-মাও দ্বারা দারুণভাবে প্রীত ছিল। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদও তখন একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য বা রাজনীতির রোমান্টিকতায় তিনি মজলেন না। তিনি একধরনের চরিত্র দাঁড় করালেন। তাকে কেউ বাঙালিত্ব অর্জন বলতে পারেন, কেউ ইহজাগতিক হিন্দুত্ব বলতে পারেন, আমার কাছে তাকে শিল্পের তুখোড় স্বাধীনতাপিপাসু এক সত্তা মনে হয়েছে। মানিক বা জগদীশে খানিক নেশা জাগলেও এর প্রতি মগ্ন হননি তিনি। তিনি সবই ভেঙে দেখতে চেয়েছেন। নতুন ধরনের লোকসংস্কৃতি গড়তে চেয়েছেন। নিজস্ব এক মানবলীলায় তিনি মত্ত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য, নতুন নতুন কাঠামো দাঁড় করানো, নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করা ছিল তাঁর ব্রত। এক হিসাবে তিনি নান্দনিক নৈরাজ্যবাদী। যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে দেখে নেওয়ার বাসনা তাঁর ছিল। তাঁর বাসনা, তাঁর সাধনা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে আলাদা এক অবস্থান দিয়েছে।

কমলকুমার পাঠ

আমরা এখানে স্মরণ করব যে তিনি একদিনে আমাদের পরিচিত অতি জটিল কমলকুমার হন নাই। তাঁর জীবনেও নানান ভাংচুর আছে। নানাভাবে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়ার বিষয় আছে। তাঁর টোটাল সাহিত্যকে পাঠ করতে গেলে আমরা তাঁর সাহিত্য ইতিহাস যেমন জানব, তাঁর মেজাজের প্রকৃত কারণও বোঝার চেষ্টা করব। তিনি একধরনের নান্দনিক ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আমাদের মাঝে অবস্থান নিয়েছেন। নানা ধরনের কায়দা জারি করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যকে একেবারে ধীরেসুস্থে বোঝার জন্য তাঁর গল্প দিয়েই তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ করতে হবে। তাঁর 'লাল জুতো', 'জল', 'মধু', 'তেইশ' ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে 'মল্লিকা বাহার', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'মতিলাল পাদরী' হয়ে 'তাহাদের কথা', 'রুক্মিণীকুমার', 'প্রিন্সেস', 'আমোদ বোষ্টুমি' ইত্যাদির পর 'বাগান কেয়ারি', 'খেলার বিচার', 'পিঙ্গলাবৎ' ইত্যাদি পাঠ করতে থাকব। এইসব গ্রন্থপাঠেরও আগে আমরা বরং তাঁকে নিয়ে লেখা নানান গ্রন্থের সঙ্গে কিছু পরিচিতিমূলক কথা সেরে নিই।

তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম যে কাজটি করেছেন তিনি হচ্ছেন রফিক কায়সার — তিনি লিখলেন *কমলপুরাণ*। তখনো বোধ করি বাংলা ভাষায় কমলকুমারকে নিয়ে গোটা একখান গ্রন্থ রচনা হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই হিসাবে তাঁর গ্রন্থটির আলাদা একটা মর্যাদা আছে। তাতে কমল বিষয়ে পরিচিতিমূলক কিছু কথা আছে। তবে এটা বলতেই হয়, কমলকুমার বিষয়ে লেখক তাঁর বিশ্বাসকে একরকম প্রভাব খাটিয়েই পাঠককে একধরনের স্বর দিতে চেয়েছেন! তাতে কমল বিষয়ে হতবিহ্বল পাঠক নিজের একটা সিদ্ধান্তে কদ্দূর পৌঁছতে পারবেন, তা ভেবে দেখার দরকার আছে। এ গ্রন্থে তাঁর কিছু গল্প-উপন্যাস নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। একটা টোটাল ধারণা দেওয়ার চেষ্টাও আছে। প্রথমেই তিনি কমলপুরাণ শিরোনামে একটা নিবন্ধ বা মুক্তগদ্য লিখেছেন। তাতে কমলকুমারের সৃজনশীলতা আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধারণা দিয়েছেন। লেখকের মগ্নতা আর মুগ্ধতাও তাতে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এখানে একজন কমলকুমার সম্পর্কে ক্রমশ পাঠ নিতে শুরু করি। আমরা কমল বিষয়ে সচেতন হই, তাঁকে আমাদের রক্তে-মাংসে-শ্বাসে মিশিয়ে নেওয়ার বাসনা করতে থাকি। এই যে আমাদের একটা প্রস্তুতি, বাসনা, এষণা, চৈতন্যগঠনের তাড়নায় থাকি আমরা, তাতে রফিক কায়সার বিপুল প্রণোদনার কাজটি করেছেন। এখানে ধর্ম, পৌত্তলিকতা, ভাষার স্বেচ্ছাচারী(!), কৌলীন্য, তান্ত্রিক গদ্যশৈলী, হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাহক, ব্যর্থকাম লেখক হিসেবে যেভাবে তাঁকে বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে কারো ভিন্নমত থাকতেই পারে। তাঁকে মানিকের সহযাত্রী ভাবা যায় কি না, তা তো আরো বেশি করে দেখতে হবে। এইভাবে কখনো হতচকিত, ক্রোধ, কখনো-বা প্রবাদপুরুষের মতোও দেখেছেন! ক্রমে ক্রমে তিনি সাতটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম নিয়ে সাতটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে স্থান পেয়েছে *অন্তর্জলী যাত্রা*, *সুহাসিনীর পমেটম*, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*, *খেলার প্রতিভা*, রুক্মিণীকুমার, *শ্যাম-নৌকা*, *গোলাপ সুন্দরী*। এই সমস্ত লেখার ভেতর দিয়ে পাঠকের সঙ্গে রচনাকারের একধরনের বৈরিতা বা মতভিন্নতা হতেও পারে, কিন্তু পাঠক তো একজন কমলকুমার সম্পর্কে, তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছু পাঠ-সহায়তাও পাবেন। সেই দিক থেকে বাংলা ভাষায় কমলপাঠ বিষয়ে এ-গ্রন্থের একটা মর্যাদা তো আছেই।

আমরা দ্বিতীয় যে গ্রন্থটির কথা বলব, তা হচ্ছে, শোয়াইব জিবরানের *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল* নামের একটা গবেষণামূলক গ্রন্থ। এটি লেখকের থিসিসও বটে। এতে কমলকুমারের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবন, সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে অনেক ডিটেইল কাজ আছে। তিনি প্রচুর সময় আর শ্রমও এজন্য দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতে কমলকুমারের শিল্পী-মানস আর উপন্যাসচিন্তা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা আছে। অনেক ইনফরমেশন আছে, পাঠক তাতে অনেক উপকৃত হবেন। এ গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, কমলকুমারের আটটি উপন্যাস বিষয়ে অনেক কথা, ঘটনা, রচনাকৌশল, ব্যাখ্যা জানতে পারবেন। তাতে উল্লিখিত মেসেজ, কাহিনি সম্পর্কে সমাধান, থিম নিয়ে কথাবার্তা হয়ত কারো পছন্দ না-ও হতে পারে, কিছু কিছু উপন্যাসে, বিশেষ করে তাঁর শেষ দিকে লেখা কিছু উপন্যাসে কাহিনি তেমন নেই বলে যে মতামত জানালেন, তাতে কারো ভিন্নমত থাকতেও পারে, কিন্তু কমলকুমারের উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা নিয়ে রাখার জন্য এ গ্রন্থের কোনো বিকল্প এখনো আমরা পাইনি।

আমরা এখানে আরো একটি গ্রন্থের কথা স্মরণ করব, — সেটা হচ্ছে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের *কাব্যবীজ কমলকুমার মজুমদার*। এটিই আমার কাছে বেশ নির্ভরশীল পরিচায়ক গ্রন্থ মনে হয়। কমলকে দেখার ধরনটা তাঁর একেবারে সত্তা জাগানিয়া। তিনিই কমলের ডিটেইলে দারুণভাবে নিমগ্ন হতে পেরেছেন। কমলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করার যাবতীয় সাধনার ভেতর তিনি ছিলেন। গল্প-উপন্যাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে, নিশ্বাস লাগিয়ে লাগিয়ে কমলে যুক্ত হয়েছেন তিনি। তবে তাঁর লেখার একটাই সমস্যা, তিনি কমলকুমারকে ঐতিহ্যের ভেতর ফেলে যাচাই করতে চেয়েছেন। তাঁকে বঙ্কিম, মাইকেল, রবিঠাকুরের ধারাবাহিক একজন লেখক বলে রায় দিতে চেয়েছেন। এখানেই একজন কমলকুমারকে তিনি প্রায় ধসিয়ে দিলেন। এই জায়গায় অনেকেই হয়ত বীরেন্দ্রর সঙ্গে ভিন্নমত রাখবেন। তাঁর অ্যান্টিট্রাডিশনাল, উপনিবেশ-পূর্ব সময়কে, কর্মযজ্ঞকে ছুঁয়ে যেতে পারেননি তিনি। কমলকুমারের সাধনা, সাধারণের ভেতর অসাধারণের রম্যসৌন্দর্য, কলাকৈবল্যবাদকে তিনি ছুঁয়ে দেখেননি। শাক্তসাধনার বিষয়েও তাঁর অত রয়েসয়ে দেখার বিষয় নেই। তবু তিনি যা করেছেন তাতে কমলকুমার পাঠ বিষয়ে আমাদের অনেক আরাম হবে।

কমলবাসনা

আমরা কমলকুমার বিষয়ে পাঠ করতে গেলেই তাঁর জীবনবাসনার কথা বলতে পারি, তিনি যেভাবে নিজেকে একটা পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, তা তো এক কথায় বলার বিষয় নয়, দেখারও বিষয় নয়। তবে শেষ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি মানুষের সহজ সৌন্দর্যকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করতে ছিলেন বলে মনে করা যেতেই পারে। তা একদিনে হয়নি। গল্পে একরকম, উপন্যাসে আছে ভিন্নতা। তিনি যখন গল্পকার থাকেন, তখন জীবনকে, সাহিত্যকে নানান ভাবে, ধীরেসুস্থে, এমনকি ভেঙেচুরে দেখতে চান। তাই তো তাঁর প্রথম দিকের গল্পের সঙ্গে মাঝখানের বা শেষের দিকের গল্পের একটা যৌথতা আমরা পাই না। যেন আলাদা গল্পকার, আলাদাভাবে তিনি তাঁর গল্প সাজিয়েছেন। 'লাল জুতো', 'মধু', 'জল', ইত্যাদির সঙ্গে 'মল্লিকা বাহার', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'মতিলাল পাদরী' যেমন খাপ খায় না, তেমনি 'খেলার বিচার', 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'আর চোখে জল' বা 'পিঙ্গলাবৎ' ঠিক মিশ খায় না। কীভাবে যেন তারা আলাদা হয়ে থাকে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পে আমাদের ৫০-৬০ দশকের যে স্বাভাবিক শৈল্পিক প্রবণতা, তা আছে। কিন্তু 'মল্লিকা বাহার' বা 'রুক্মিণীকুমার'-এ তিনি ভিন্ন মেজাজে আসতে শুরু করলেন। 'খেলার বিচার', 'কালই আততায়ী', 'দ্বাদশ মৃত্তিকা'য় তিনি উপনিবেশ-পূর্ব সময়ে সরতে থাকেন। তিনি একাই তা করেন। তখনই তিনি উপন্যাসেও ডিক্লেয়ার দিয়েই যেন প্রচলিত সাহিত্যজগৎকে রীতিমতো ছুড়তে থাকেন। তিনি সরলতার কথা বলেন, গেঁয়ো, গ্রাম্যতার কাছে দৃশ্যত সমর্পণ করলেও তিনি কার্যত উপনিবেশের শেখানো বুলি থেকে সরে সরে যান। তিনি সরল-সূক্ষ্মতা, সহজ জীবনের কথা বলতে থাকেন। কিন্তু তিনি যা বলেন, যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাতে ইংরেজ জমানার শেখানো বুলি নেই। প্রমথ চৌধুরী বা রবীন্দ্রনাথদের পরম ঈশ্বর নেই, সাংস্কৃতিক আধুনিকতা নেই। তিনি রামকৃষ্ণ আর রামপ্রসাদে আস্থা রাখেন। তাঁরা কলকাতার জন্য চ্যালেঞ্জ, তাঁরা অনেক দূরে থাকেন। তাঁরা ব্রাহ্ম হতে জানেন না, তাঁরা আধুনিক নন, তাঁরা ইংরেজবাসনা চেনেন না। তাঁরা দৃশ্যক কালিকাকীর্তনে নিজেদের সঁপে দেন। মা কালীর ভক্ত তাঁরা। তারা গ্রাম্য, তাঁরা কালিকাকীর্তনের মানুষ, তারা সহজ কীর্তন চেনেন, তারা বৈষ্ণব পদাবলির প্রেম সম্পর্কে তত বিজ্ঞ নন, তারা সেই পদাবলির ম্লানতা সম্পর্কে হয়ত কখনো জানেন না। তবে তাঁরা সহজ, তাঁরা মানবলীলা চেনেন, তাঁরা কালিকাকীর্তনের মাধ্যমে একধরনের শাক্তপ্রেম জাগ্রত রাখতে জানেন। তাতে তাঁরা সরল হন। সেই জীবনের সঙ্গে কমলকুমার নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি কঠিনের ভেতর দিয়ে সরল হন। তিনি বঙ্গকীর্তনে নিমগ্ন থাকেন। তিনি মানুষের সর্বজীবনে একটা সাধারণ ধারা জারি করতে চান। সর্বলৌকিকতার একটা প্রয়াস তাঁর আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি প্রাকৃতিকও বটেন! প্রকৃতির ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে আলাদা মানবিক জাত হবার যে সাধনা তাঁর আছে, জীবনকে জড়ানোর কর্মযজ্ঞ তাঁর আছে, তা আমাদের সাংস্কৃতিক আবহের ভিন্ন এক লীলা হয়ে ধরা দেয়। এ লীলা এ বঙ্গের, — তাকে আমাদের প্রণাম।

রূপে রূপের ফেরিওয়ালা

তিনি একেবারে একটা স্থির দর্শন বা চৈতন্য দিয়ে তাঁর লেখাজোখা শুরু করেননি। তাঁর এই যে অত রূপান্তর তা একেবারে প্রকাশ্য রূপ নেয় গল্পে। বরং উপন্যাসের মানুষটা অনেকটাই স্থির। যেন সেখানে তিনি চরম দশাপ্রাপ্ত এক সাধক। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, মাধবায় নম, মনজাগানিয়া নৈরাজ্যবাদীর সারাৎসার হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু সাহিত্যে তাঁর সৃজিত ভাংচুর, ক্ষণে ক্ষণে জীবন বদলানোর বিষয় তাঁর গল্পে আছে। 'লাল জুতো' বা 'মধু' ইত্যাদি গল্পে যে মানবিক রূপ দেখি, তা তো 'প্রিন্‌সেস' বা 'বাবু' কিংবা 'আমোদ বোষ্টুমি' গল্পে দেখি না। আবার 'আর চোখে জল', 'খেলার আরম্ভ', 'পিঙ্গলাবৎ' গল্পে সর্বমানবিক এক রূপ দেখি। তাঁর ভাষিক সৃষ্টিশীল নৈরাজ্যসনে আমাদের পরিচয় হয়। 'প্রিন্‌সেস' গল্পে কমিউনিস্টদের প্রতি যে সফট কর্নার দেখা যায়, তা তো আমরা আর পাই না। বরং তিনি ক্রমশ বামবিদ্বেষী হয়ে উঠতে থাকেন। এমন এক সাহিত্যভুবন নির্মাণ করতে থাকেন, যেখানে আর কেউ যায়নি। এমনকি তাঁর ফলোয়ারও হয়নি। এইভাবেই একজন কমলকুমার ক্রমাগত নিজেকে নির্মাণ করেছেন। শিল্পের জন্য শিল্পের এক নান্দনিক জায়গা সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি ভাষার জন্য মান্যতা, রূপময়তা, কোলাহল পরিত্যাগ করে একলা এক জগৎ সাজিয়েছেন। তিনি রূপের একক ফেরিওয়ালা হয়েছেন।

নারীর বিপ্রতীপ অবয়ব

এটা একটা সাধারণ মত যে তিনি ভারতীয় রতিশাস্ত্রের কাছে নারীকে যেন সমর্পণ করেছেন! কিন্তু তা তো সত্য মনে হয় না। *সুহাসিনীর পমেটমের* কথাই ধরা যাক, — এখানে যে সৌন্দর্যের কথা এসেছে তাতে স্বকীয়তা আছে। নিছক দেহের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার বিষয় তো এখানে নেই। পুরুষের আধিপত্য কি *অন্তর্জলী যাত্রার* যশোবতীও অক্ষরে অক্ষরে পালন করল? বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়েটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সংস্কার, একটা জান্তব পদ্ধতি। সেখানে নির্ভরশীল নারী হিসেবে তার কীই-বা করার ছিল। কিন্তু তার বেঁচে থাকার যে আকুতি, বৈজুর সঙ্গে তার মানবিক রিলেশন, তা তো শাস্ত্র মেনে হয়নি। এমনকি *অনিলা স্মরণেতে* লাবণ্য দেবী আর রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীর যে জৈবিকতা, ইহজাগতিক তৃষ্ণা তাও তো শাস্ত্র মেনে হয়নি। অথবা আমরা 'মল্লিকা বাহার' নামের গল্পে সমপ্রেমের যে চমৎকার আবহ দেখলাম, তাতে নারীর স্বাধীন-জীবনই তো প্রকাশ পেয়েছে।

কমলকুমার নারীকে সৃষ্টি করেছেন, শাস্ত্রের কাছে বন্ধক দেননি, এমনকি পুরুষতন্ত্রের কাছে রেখে দেননি। প্রকৃতিরূপে, মাতৃরূপেও রাখেননি। এখানেই রামকৃষ্ণের স্বোপার্জিত আকাঙ্ক্ষা থেকেও দূরে সরে গেছেন যেন। একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো, লোকাচার প্রেমীর মতো, ব্রতকথার নিবেদিত কথক হিসেবে আলাদা এক সংস্কারের কাছে নিজেকে নিয়ে গেছেন।

কমলের ভাষা

কমলকুমার বিষয়ে সবচেয়ে উচ্চারিত বিষয় হচ্ছে তাঁর ভাষা। অনেকেই এমনটি বলে থাকেন, ভাষা নাই তো কমল নাই। ভাষাতে সৃষ্টি হয়, সৌন্দর্য হয়, কথাসাহিত্যও হয়। কিন্তু তাই বলে ভাষাই সব? তার ভাব কিছুই নয়? আমার তো মনে হয়, তাঁর ভাবই আসল, ভাবই ভাষাকে এভাবে বদলে দিচ্ছে। তিনি তাঁর সৃজিত ভাবে এভাবেই মজে আছেন যে, এমন দশায় তিনি নিমজ্জিত সেখানে পবিত্র চেহারা আর থাকে না। তিনি ভাষাকে ক্রমাগত আক্রমণ করেন, ভেঙেচুরে দেন, রক্তাক্ত করেন। গদ্যের যে ছন্দ আছে, বাক্যছন্দের এক লীলা যে থাকতে পারে, তা আমরা কমলেই সবচেয়ে বেশি পাই। তাঁর নৈঃশব্দ্যের গীতলতা আর কোথায় অত নিপুণভাবে পাব? যে ভাষা আমরা জানি, প্রতিষ্ঠান যে ভাষা চেনায়, ইংরেজরা যে ভাষায় তার লেনদেন করেছিল, ধর্মের ব্যবসা করেছিল, রাজ্য শাসন করেছিল, তাদের প্রতি নমিত পণ্ডিত আর মুনশিরা মোলায়েম ভাষা চাষাবাদ করছিল, তিনি সেই ভাষা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। প্রচলিত মানভাষা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তাঁর পরিবর্তনটা হয় ধীরে ধীরে। তিনি গল্পের জগতে যে মানভাষা চর্চা শুরু করলেন, অচিরেই তা থেকে তিনি ভিন্ন দিকে চলতে শুরু করলেন। কখনো মনে হয় বিদ্যাসাগরের ভাষামাধুর্য তাঁর ভেতর আছে, বঙ্কিমের খানিক স্পর্শ তাতে দিয়েছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃত-আশ্রিত লোকায়তঘেঁষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ধ্যভাষা হয়ত তিনি চর্চা করবেন! কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি নিজের একটা ভাষাভঙ্গি চালু করলেন, তাতে খানিক সাধুতা, খানিক ফ্র্যাঞ্চ যেন মিশে থাকল — উপনিবেশ-উত্তর ভাষার লোকায়ত ধরনটা খানিক নিলেন, রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের কাব্যালোক তাঁকে মোহিত করল। তিনি শাক্ত পদাবলির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তিনি অন্তরে সরল হয়ে, রামকৃষ্ণের মতো সর্বমানবের প্রেমিকের কাছে থেকে ভাষার একটা নিজস্ব প্যাঁচ দিলেন। তিনি দশাপ্রাপ্ত হলেন, ধূলিবালির বঙ্গজ আবহকে কথার আলাদা রাজত্বে দিলেন। এ জগৎ প্রেমময়, স্নেহ, সর্বোপরি মানবলীলাময়। আমরা সেই ভাষার কাছেই নিজেদেরও যেন খানিক চিনতে চাইলাম। তাঁর ভাষা চর্চা হচ্ছে না, তাঁর ফলোয়ার নেই, — সত্য। কিন্তু ধুলাবালির মানুষের প্রতি, নিম্নবর্গীয় জীবনের প্রতি যে মায়াটা আছে, তা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

তিনি বিকল্প বাস্তবতার সন্ধান করতে গিয়েই ভাষাকে নিজের মতো করে গড়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, তা করা যায় কি না? এই প্রশ্নটি এখানে আসছে, ভাষাকে এমন করা যায় কি না। এ প্রশ্নটি কার? কে আমার বা আমাদের মগজে তা আনে? স্মৃতি নিয়ন্ত্রণ করে? তা তো প্রতিষ্ঠানই। এখন কথা হচ্ছে, একজন শিল্পীকে প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কি না। এই পারা, না-পারা সেই শিল্পের মানসিক গড়নের ওপরই নির্ভর করবে। একজন প্রকৃত শিল্পীকে প্রতিষ্ঠান কখনো স্বস্তি দিতে পারে না। কমলকুমারকেও পারেনি। তাই নিজের মতো করেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, বাক্য গড়েছেন, চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। ক্রিয়া, অন্য পদ, চিহ্ন, নানাবিধ বাক্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। সাধু, মান, লোকভাষার সংমিশ্রণ করেছেন। ভাষাকে তাঁর মতো রং-রূপ-গন্ধ দিয়ে মেখেছেন। তিনি কোনো ধরনের পীর ধরেননি, সাহাবাও নির্মাণ করতে চাননি। তিনি নিজেই নিজের ঈশ্বর। আমরা হয়ত আরো বলতে চাই, এই জর-জড়লা-নদীর অনেকটুকু ধারণ করার জন্য তাঁর ভাষাগত স্টাইলে অত ভাংচুর আনা হয়ত দরকারও ছিল!

কমল-সৃজিত রং

তিনি চিত্রকর্ম দিয়েই তাঁর শৈল্পিক জীবন শুরু করেছিলেন। ফলে দৃশ্য, রং, ভাস্কর্য ইত্যাদির প্রতি তাঁর মোহ, প্রেম, বাসনা বরাবরই ছিল। ফলে তাঁর বাক্যে, তাঁর নীরবতায়, সময়ের ধারাক্রম নির্ণয়ে রঙের অপূর্ব ব্যবহার চোখে পড়ে। রং তো আসলে রূপ নির্ণয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল কাজ। সেই কাজটি তিনি করতে জানতেন। তা তাঁর রক্তের ভেতরই ছিল। আলো যে ক্রমে আসে, সেই আলোর যে নানা রূপ, নানান ঢং তা তিনি আমাদেরকে বারংবার জানান দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্যের প্রতিভূ হিসেবে *গোলাপ সুন্দরী*তেই মগ্ন-নিমগ্ন থাকেননি। গোলাপের সৌন্দর্য যেখানে দরকার, জীবনের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করা দরকার, তা তিনি যেমন করেছেন, *খেলার প্রতিভা* নামের উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের ভয়াল চিত্র এঁকেছেন। সেখানে রং এসেছে জীবনের কঠিন সত্যকে আশ্রয় করে। *অন্তর্জলী যাত্রায়* আলোর ব্যবহার তো গঙ্গাতীরকে একেবারে কাঁপিয়ে এসে এসে থেকে ফের চলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আবার এসেছে। মৃত্যুর কঠিন বাস্তবকে চাঁদের লাল বর্ণের রূপান্তরে আলাদা এক মাত্রা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ এক প্রতীক, চাঁদ লাল বর্ণ হওয়াতেই যেন সীতারামের মৃত্যু হয়। *শ্যাম-নৌকায়* জীবনকে রূপান্তর যেন মায়ার আলাদা রং-রূপ নিয়ে, আমাদের সামনে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়ে হাজিরা দেয়। নানান কলা তাঁর শব্দের শরীর বেয়ে বেয়ে আমাদের মনোমন্দিরে দেদীপ্যমান হয়। রঙের কী যে খেলা আমরা তাঁর কথনে দেখি!

আমরা তাঁর সৃজিত রঙের ভেতর দিয়ে যে কমলকুমারকে পাই, তাতে তিনি সাহিত্যের কবি হয়ে আমাদের মনোজগতে ভাস্বর হতে থাকেন। তিনি নিজেকেই যেন নানান রঙে সাহিত্যের জগতে ক্রমাগত খোদাই করে যাচ্ছেন। রঙের এমন ঈশ্বরত্ব আর কারো কথনে তেমন চোখে পড়ে না। যে কথা তাঁর মনে, শরীরে, উচ্চারণে, চলনে, বলনে ঘুরঘুর করে তা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশকে যথেচ্ছ রূপে প্রকাশই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। সেই কাজটি তিনি করতে জানেন, তাঁর মাত্রাজ্ঞান এখানেও প্রবল। তিনি যে রং ব্যবহার করেন তাতে সচল চিত্র থাকে, ধুলার গন্ধ থাকে, সাধারণত্ব থাকে। কঠিনের ভেতর সাধারণ রঙের নিপুণ মিশ্রণই তাঁর সৃজিত কথাকে যথাযথ প্রাণ দেয়।

কমল-সৃজিত মৃত্যু

তাঁর মতো মৃত্যু-উদ্‌যাপিত সাহিত্যিকও কিন্তু তেমন চোখে পড়ে না। এটা একটা বিস্ময়, এক অদ্ভুত বিষয়! এত মৃত্যু দিয়ে তিনি কী করেন? কেন, প্রায়শই মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি এত কেন মৃত্যুমগ্ন থাকেন। তাঁর সৃজিত মৃত্যু কি এমন কোনো মেসেজ দেয় যা আমাদের জাগতিক ভাবনাকে, এই জীবনকে নড়বড়ে করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কি মৃত্যুনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ি? ধর্মের একটা বড় কাজ মৃত্যুযোগে জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তিনি কি অতি মাত্রায় ধর্মআশ্রিত? এ এক কঠিন-জটিল, হয়ত অমীমাংসিত এক প্রশ্ন বটে! আসলেই কি তা অমীমাংসিত? না, তাও তো নয়। তিনি যে মৃত্যুর আয়োজন করেন, তা যেন প্রকৃতির অংশ, জীবনকে নতুন করে দেখার অংশ। এটাই হয়ত তাঁর রচিত মৃত্যুর ইতিবাচক দিক। *শ্যাম-নৌকা* তো মৃত্যুর এক চলমানতা, *অন্তর্জলী যাত্রা* তো মৃত্যু-আয়োজনকেই যেন গ্লোরিফাই করছে। আবার এখানকার বৃদ্ধ একা যাবে না, তাঁর দোসর লাগবে। সেই দোসর, সেই যশোবতী মৃত্যুকে রীতিমতো রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে বারবার যেন জৈবিক হই। নিজেদের চরিত্র দেখে নিই, মেজাজকে আবারো এই জগতেই দেখি।

খেলার প্রতিভা নামের উপন্যাসে যে মানুষগুলি, দুর্ভিক্ষপীড়িত যেই চরিত্রসমূহ আমাদের সামনে চলাচল করে, তারা মৃত্যু থেকে তো খুব বেশি দূরে থাকে না। একেবারে স্পর্শ করার মতোই সামাজিক অবস্থানে থাকে। অথবা, তারা হয়ত থাকে না, মৃত্যুর চিহ্ন এঁকে দেওয়ার মানসে চলাচল করে মাত্র। *অনিলা স্মরণের* মৃত্যুর কথা মনে হলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। জীবনকে নিয়ে যেন তৃষ্ণার্তও হই আমরা। এই এক মৃত্যু, যে মৃত্যুর জন্য আমাদের যেন প্রস্তুতি থাকে না, আমরা মৃত্যুকে বরণ করতে চাই না। কারণ এ মৃত্যু জীবনের সঙ্গে যেন কোনো যোগসূত্র তৈরি করতে চায় না। এ মৃত্যু ভয়ঙ্কর, — কারণ আমরা অনিলাকে হারাতে চাই না। প্রকৃতির অংশ করতে চাই না। আমরা চাই সে বেঁচে থাকুক, তার মায়ের ভালোবাসাও দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু এখানকার কমল যেন ধৈর্যহীন, বিষপানে একেবারে অস্থির হয়ে আছেন। আমরা অনিলার আত্মহত্যায় হয়ত অসহায় হই, বিমর্ষ হই। আমরা ক্রমাগত শোককাতর হই। সেই কাতরতা আমাদের থাকে *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক-এ, যেখানে একটা পাখির মৃত্যু আমাদেরকে অতিশয় জীবনকাতর করে। আমরা অস্থির হই, আমাদের স্থিরতা ধরে রাখতে পারি না।

তবু আমরা প্রায়শ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের একটা চিহ্ন তাঁর রচনায় দেখি। আমরা সাহসীই হই। মৃত্যু যখন সাহস দেয়, প্রকৃতির অংশ হতে প্রেরণাদায়ী হয়, সেখানে জীবনের রূপ-রস-গন্ধ আলাদা মাত্রা তো পায়ই। এভাবেই কখনো কখনো কিঞ্চিৎ হতচকিত অবস্থার ভেতরও মৃত্যুকে ভালোবাসার মতো করে ভালোবাসতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক বলে রায় দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না। কারণ তাঁর ধর্ম হচ্ছে সাহিত্যের সৃজিত ধর্ম। তিনি প্রথাগত ধর্মের কাছে একেবারে ষোলআনা আশ্রয়ী হন নাই। তিনি সরাসরি দেব-দেবতার বন্দনা করেছেন। ঈশ্বরের কথা বলেছেন তিনি। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় ছিল। তিনি কিছু রিচুয়ালের কথা সরাসরি বলেছেন। সবই আমরা দেখি, তবে যা দেখি না, বা দেখতে চাই না, অথবা দেখতে পছন্দ করি না, তা হচ্ছে তাঁর মানবলীলা। তিনি এখানে রোমান্টিক — আধুনিকও।

আমরা *খেলার প্রতিভা* বা 'নিম অন্নপূর্ণা', *অন্তর্জলী যাত্রা*, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*, 'আমোদ বোষ্টুমি'র কথা বলতে পারি। আমরা তাঁর যে-কোনো কথাসাহিত্য নিয়েও কথা বলতে পারি। তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলছেন, তা সনাতন হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর নন। সনাতন হিন্দু ধর্মের এত মাপজোখের ঈশ্বর নেইও। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর বলি আর একমে দ্বিতীয়ম বলে ভগবানের কথা বলি, তাতে কমলকুমারের ঈশ্বর নেই। কমলের ঈশ্বর একান্তই সৃজনশীল ঈশ্বর। তিনি যে রামকৃষ্ণের কথা বলেছেন, তা একেবারে আচারবাদী রামকৃষ্ণ বলে মনে হয় না। তিনি এক চরিত্র মনে মনে এঁকেছেন, তাতে খানিক রামকৃষ্ণ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর যে মনোজগতের রামকৃষ্ণ তা প্রায়শই চিন্ময়ীরূপেই থাকেন। তিনি মা-কালীর বন্দনা করেছেন, কিন্তু তাঁর রুদ্ররূপ তেমন দেখতে চাননি। মা-কালীর মায়ার রূপেই অধিক তৃষ্ণার্ত থেকেছেন। রামপ্রসাদের কাব্যবিগ্রহ ছুঁতে গিয়ে বিকল্প আধুনিকতা তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাতে বৈষ্ণব পদাবলির বদলে কালিকাকীর্তন স্থান করে নিয়েছে, দেবী বন্দনারূপে প্রকৃতির প্রতি তাঁর দরদ, প্রেম, মায়াই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমের ইউরোপঘেঁষা এক সত্তাবাদী কৃষ্ণপ্রেম তাঁর ছিল না, তিনি রামমোহন-রবিঠাকুরদের পরম ঈশ্বরকে খোঁজেননি, তিনি স্মার্ট আধুনিক হতে চাননি। এমনকি বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্মতা চাইলেও তাঁর মতো বিজ্ঞাননির্ভর, শৃঙ্খলময় ভাষা সৌন্দর্যে তিনি ডুবেননি।

তিনি অতি সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ লোকায়ত ধর্মে ডুব দিয়েছেন। সর্বমানবের মানবলীলার এক স্রোত হয়ত ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্মকে আর কারো ধর্মজ্ঞান বা কর্মযজ্ঞের সঙ্গে মেলানোর কোনো পথ আছে বলে মনে হয় না। তাঁর যে টোটাম-ট্যাবু, যে সংস্কার, যে বিধি, তা তাঁর নিজস্বই। তিনি প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ পেয়েছেন। ভাবকে আশ্রয় করে তাঁর জীবন, ধর্ম, কর্ম, সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন। ফলত, আমরা তাঁকে নানাভাবে দেখার বাসনা ত্যাগ করতে পারি না।

শিল্পী কমলকুমার

এইখানেই শিল্পীসত্তায় কমলকুমারকে দেখতে হবে। তাঁকে পাঠ করতে হবে। আমরা যদি তাঁকে ধর্মের কাছে, ভাষার কাছে সমর্পিত মানুষ বলে রায় দিয়ে রাখি, তাহলে তো প্রকৃত একটা সত্তাকে হারাতে থাকব। তিনি ভাষা দিয়ে কেবল আলাদা হতে চাননি। তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক নেশার মানুষ, দশাপ্রাপ্ত হয়ে, সাধনার চূড়ান্ত প্রান্তে পৌঁছে, নিজেকে আবিষ্কারেরও মানুষ। তিনি নিজের কাছে নিজেকে রাখেননি। মানুষই তাঁর সাধন-ভজন। মানুষই তাঁর ঠিকানা। পথ মানুষকে পথ চেনায়, লোকায়তবান্ধব হয়ে কমলকুমার প্রকৃত স্বজনকে স্বজনের সঙ্গে মেলানোর বাসনা করেছেন। আমরা তাঁর বাসনাকে দেখে-দেখে-চেখে নিজেদেরকেই বারবার আবিষ্কার করতে চাই। এভাবেই আমাদের সঙ্গে তাঁর যেন এক সত্তাবিনিময় হয়। আমরা এক যোগসূত্রপ্রাপ্ত হই, — এভাবেই আমরা হয়ত তাঁকে গ্রহণও করতে থাকি। এক সৃজনশীল নৈরাজ্যবাদীসনে আমরা যেন কালযাপন করছি!

২০.৯.২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলায় দ্রোহে কমলকুমারের উপন্যাস

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসে অতিশয় সত্য থাকে, জীবন তো থাকেই, থাকে প্রকৃতি আর অনেক দূরের স্মৃতি। তিনি নিজের মতো করে বাস্তবতা সৃজন করেন। তাতে লৌকিকতা থাকে, অতি মায়াবী পর্দা থাকেই। সেই পর্দায় জাদুর বিস্তৃতি ঘটে। ভাষার যে দাপটটা থাকে, তাতে তাঁরই নিজস্ব চরিত্র যেন উন্মুক্ত হয়। স্থানকাল মিশেল খায়। জীবনের নানান স্তর মিশে যায়, জগতের কত যে কিছু মিশে যেতে থাকে! তাতে কমলের দ্রোহ থাকে, এবং আরো যা যা থাকে তাই দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা তাঁর কথাসনে, বিশেষত, উপন্যাস নিয়ে আলাদা জগতের ইশারা পাই। সেই ইশারার সঙ্গে সমূলে মিশতে মিশতে আমরা আলাদা এক দুনিয়া সৃজনের কথা শুনব। তিনি যে উপন্যাসের একেবারে পারফেক্ট সৃজনকারী, অতঃপর তা স্বীকার করে নেব। যদি বলি তাঁর কথনে, শিল্পে কিছু হয়ত হয়ই, আর যদি বলে দেওয়া হয় যে, না কিছুই তো হয় না, — তাহলে কি না হয়? এই যে শিল্পভুবন নির্মাণের নানান পথ, তাঁর আগাপাছতলা কে নির্ধারণ করবে? আসলে কমলকুমারের উপন্যাস পড়া মানেই সময়, সংস্কৃতি, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে একভাবে না একভাবে বোঝাপড়া করে নেওয়া। এতে মনের কোনো এক তলে যেন কাঁপন বয়ে যাবার মতন হয়, — সেই কাঁপনের সমাহারে শৈল্পিক লীলা হয়। মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির ভেতর আলাদা এক দ্রোহের জন্ম দেয়। এক হিসাবে মনে হতে পারে, কমল পাঠের প্রয়োজন কী? তিনি তো সাহিত্যের শরিয়ত মারফত হকিকত তরিকত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন না। তাঁর কোনো সাহিত্যিক ধারাও নেই। তাঁকে পাঠ না করেও তো হরহামেশাই নান্দনিক চর্চা হচ্ছে। তাঁকে জানা-শোনা-বোঝা যে অবশ্য-কর্তব্য বলে কেউ কেউ ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতে চান, — তা কেন? এর মূল কারণ লোকায়ত সংস্কৃতিকে জানা, আভিজাত্যমুখর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরব বোঝাপড়া করে নেওয়ারই শামিল হয়। তিনি শিল্পের জগতে আলাদা এক ঈশ্বরত্ব কায়েম করতে সমর্থ হচ্ছেন। আসুন পাঠকসকল, তাঁর এ স্বোপার্জিত রূপকে জানি, এরই ভেতর দিয়ে আমরা বন্দনা রচনা করি।

তিনি, কমলকুমার মজুমদার, যদি শুধুই হন অন্য এক প্রতিষ্ঠান, জটিলতম বাক্যের ধারক, রামকৃষ্ণীয় ভাবের কাণ্ডারি কিংবা ভাষাগত নৈরাজ্যের (!) চালক, কিংবা লেখকদের লেখক, তবে ধরে নিতে হবে যে তাঁকে একঘরে করার চিকন-রাজনীতি আছে তাতে। প্রতিষ্ঠান প্রতিভাকে সর্বতো কাজে লাগায়, বাণিজ্য বসতিতে তা ওস্তাদ। বাক্যের জটিলত্বের আগামাথা কিছুই পাওয়া যায় না। আর ভাষিক নৈরাজ্যকারী বলে তাঁর কাজকে মূলত খাটোই করা হয়। নৈরাজ্য এক চলিষ্ণু প্রতিভাময়তার নামও হতে পারে, যা সমাজ-রাষ্ট্রের ইতরামিকে তার প্রতিভাবলে নাকচ করতে পারে, — কমল সেটা করেছেনও। অন্য কথা হচ্ছে, লেখকের লেখক বলে কিছু থাকে না। জমিদারের জমিদার থাকতে পারে, কিন্তু লেখক এক সার্বভৌম সত্তার নাম, সেখানে কাউকে কর দেওয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। যাই হোক, এবার কমলসাহিত্য, বিশেষত তাঁর উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি আমরা।

কথাসাহিত্যের জটিল বাক্যবিন্যাসকে শিল্পচৈতন্যের একধরনের মান ধরলে, এর জনক হতে পারেন কমলকুমার মজুমদার। বাংলা কথাসাহিত্যের জটিলতম লেখক হিসেবে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের নামটিই বলতে চাইবেন। এটা সত্যি, তাঁর লেখা পড়তে-পড়তে বোঝার জন্যও মেধাময় পরিচর্চার প্রয়োজন। তিনি যে ৩০টির মতো গল্প আর আটটি উপন্যাস লিখেই কথাসাহিত্যে এমন জটিলতার আয়োজন করলেন; এসব শিল্পের নামে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতার ফসল কি না এমন কথকতাও শোনা যায়। এর জন্য আলাদা কোনো শিল্পসাধনার প্রয়োজন ছিল কি না বা তাঁর সাহিত্য সাধনা কি শতাব্দী প্রাচীনতার গৌরব নিতে পারবে? নাকি এসব হেঁয়ালিতে ভরপুর শিল্পযজ্ঞ মাত্র!

*শবরীমঙ্গল*কে কমলকুমার মজুমদারের প্রথম উপন্যাস বলে কেউ কেউ মনে করতে চান। তার জন্য যুক্তিও দাঁড় করান। এর ভাষার কথা বলেন কেউ, অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয় চলে আসে। এখানে *সুহাসিনীর পমেটম* বা *পিঞ্জরে বসিয়া শুকের* ভাষাগত জটিল-নিবিড়তা নেই। চরিত্র সাজানোর নিয়ম বা প্রণালি ভিন্ন। তাদের চলাচল আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার সেই জটিল কিছু বিষয়-আশয় আছে। গল্প সাজানোর নিজস্ব কায়দা আছে। ক্রমশ একজন কমলকুমারকে দেখার কথাও চলে আসে। এখানে মূল মানুষটি হচ্ছে মাধালী; অন্য সবাই নানাভাবে আছে। তবে তারা ব্যক্তি হতে পারে না। কাঠামোর ভেতর তারা ঘুরঘুর করে। লুহানী, মাকড়ি, সুবাই, অদ্বৈত মিশ্র, পাদরি ফিলিপ এমনতর চরিত্র। রোমনিকে নিয়ে কি আলাদা করে কিছু বলা যায়? মনে হয় না। সেও মাধালীপানে নিজেকে বিছিয়ে রাখে যেন। এ হচ্ছে কমলীয় প্রবণতা, যা তাঁর প্রথম দিকের বুননরীতিকে আমাদের স্মরণ করায়। এ উপন্যাসে নানা ধরনের আবহ দেখা যায়। যেমন, মাধালীর সঙ্গে রোমনির কিছু জৈবিক বিষয় আছে। তাতে প্রাণ আছে, আবার তা যেন নেইও। তার বাদে আছে পাদরি ফিলিপের চার্চ, যেখানে মাধালী আশ্রয় নেয়। এবং তার পরে আছে মাধালীর খ্রিষ্টীয় বৈরাগ্য। তারও পর আমরা একে একে অন্যসব চরিত্র পাঠ করব। এ খুবই অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে পাঠক মাধালীর চরিত্রটিতে অদ্ভুত মাদকতা দেখবেন। যেন তার ভেতর এক রামকৃষ্ণ আছে, আছে রামপ্রসাদ, তার ভেতর আছে সাঁওতাল জীবন। তারও গভীরে আছে কালিকাকীর্তন। এ হচ্ছে একধরনের কমলীয় আয়োজন। একধরনের জীবনবিন্যাস, তাতে আমাদেরকে বারবার অবগাহন করতে হয়।

উপন্যাসে বর্ণিত সেই কালটিতেও ধর্মপ্রচারের ভিন্ন রূপের ধারণা আছে। এ বিষয়টি আমরা দেখব। তাতে গুরুত্ব দিয়ে নানান বিবেচনা আমাদের মাথায় আসবে। জমিদাররা তখন আছেন। তাদের নানা পদের দোসর আছে। তারা প্রতিষ্ঠানের কর্তামানুষ। বাঙালি নিজ হাতে তখন পুঁজি খাটানো শুরু করেছে। তারা মাথা তুলছে — নিজেদেরকে চেনা শুরু করেছে। তারাও শিল্প চায়; ব্যবসা চায়। মহাজন হতে চায়। শিল্পপতি হওয়ার বাসনা তারা দেখতে শুরু করেছে। জমিদারির বিকাশও চায় এরা। সাদা চামড়ার সাহেবি নিয়ম বিস্তারে এরা অনেকেই ভীত। সেই সময়ে ঠাকুর পরিবার কলকাতায় শিল্প-সংস্কৃতির অনেকটাই কন্ট্রোল করছে। তারা *তত্ত্ববোধিনী*, *সবুজপত্র* সহযোগে, ব্রাহ্ম-আচার নিয়ে চিন্ময়রূপের অদ্বৈতবাদী জীবনযাপনে বিশ্বাসী হতে শুরু করেছে। এ নিয়ম-কানুন কলকাতার উচ্চপদস্থ পরিবারসমূহকে নিয়মে আনছে। এরা নাকি খ্রিষ্টীয় ধর্মের নিরাকার ঈশ্বর প্রেমে আসক্ত, তা বেশ ছড়ানো হয়। তারই বিপরীতে নানান পথ আছে। বৈষ্ণবীয় কিংবা শাক্ত মতবাদ আসে। ধর্মের নিয়ম-কানুনকে শিথিল করার কথা শোনা যায়। রামকৃষ্ণ তাঁর যত মত তত পথ নিয়ে মানুষের কাছে আসেন। সর্বমানবের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর ফরিয়াদ থাকে। তিনি কলকাতা থেকে, কথিত স্মার্টনেস থেকেও দূরে থাকেন। মানবলীলা তাঁর বড় লীলা হয়। তিনি আসলে প্রাকৃতজনদের কাছে টানতে থাকেন। এই ধাক্কায় জাতপাত ধুলোর সঙ্গে যেন মিশে যাবে! কারণ এখানে আচারনিষ্ঠা বেদ-উপনিষদের কঠিন শৃঙ্খল ধার করার প্রয়োজন নেই। তবে রামকৃষ্ণ প্রকৃতই মা-কালীর ভক্ত, তাঁর মায়ায় তিনি নিমজ্জিত। তাঁর মূল কাজটি ছিল মানুষকে এক জায়গায় এনে জড়ো করা।

উপন্যাসটির শেষদিকে মায়াবী নাটকীয়তা আছে। চরিত্রের বিকাশ আছে। মাধালী যেভাবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত খ্রিষ্টান অদ্বৈতকে মানবপ্রেমে সিক্ত হয়ে জড়িয়ে ধরল তাতে তো আলাদা এক জৈবিক শিহরণ যেন ছড়িয়ে গেল; রাধারূপের আরেক ধারা যেন এতে সজীব হয়ে বাজতে থাকল। পাদরিকেও এখানে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল জীবনের লোকাচার আরেক দিকে যেন মোড় নিল। তাতে জীবনের বহু রূপ প্রকাশ তো পেল। একজন কথাশিল্পী তো ঈশ্বরের চেয়েও সৃষ্টিমুখর। তিনি সব চরিত্রের ভেতর সত্তা লালনের একটা পর্যায় রাখেন। তবে তার মৌলিক বাসনা তো একটা থাকেই। এ তো সেই আমলের গল্পকথা, যখন আমরা ইংরেজ-কোম্পানি দেখি। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন দেখি। মধ্যবিত্তের নবজাগরণ দেখি। কিন্তু এখানে পাঠক এ ধরনের কোনো আমেজই টের পাবে না; এমনকি পাদরিকেও এ উপন্যাসে এতটুকু বিচলিত দেখা যায় না। গ্রাম কি তখন তাই ছিল? সুবাইকে না হয় কোম্পানি-মুৎসুদ্দী হিসেবে ট্রিট করছে; কিন্তু পাদরিকে দেওয়া তার উদাসীনতা যেন মানা যায় না! ধর্মের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার ধরনটি ছিল বিচিত্রই। কেনে, লেই, বটে ইত্যাদি শব্দরাশি প্রয়োগ করলেই কথ্যভাষার মূল স্পিরিটটা আসে না। তাঁর ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা হতচকিত হয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে। অন্য দিকে খ্রিষ্টান সোসাইটির জীবন নিয়ে ডিটেইলের কাজও তেমন চোখে পড়ে কি? এ ব্যাপারে তিনি খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটিপ্রবণ ছিলেন বলেও মনে হয় না। বারবারই হিন্দু সনাতনঘেঁষা জীবনের চিন্ময়ের অতল থেকে মৃন্ময়কে খোঁজার প্রবণতা চোখে পড়ে। বাবা, হুজুর, ভগবান — এ শব্দগুলোও সাঁওতাল খ্রিষ্টান সোসাইটিতে তিনি ব্যবহার করেছেন! এতে হয়ত শিল্পের সার্বিক স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত রিয়েলিস্টিক ইমেজ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। তবে কি কমলকুমার ধর্মীয় ঐকতানের জীবনপ্রবাহে সমর্পিত একজন কথাওয়ালা? তা কিন্তু নয়। তাঁরও স্বাধীন মানবিকপিপাসু মনের কথা পাঠক দেখতে পায় নিশ্চয়। এ উপন্যাসেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে শেষ দিকে আমরা একটা দৃশ্য দেখি, রোমনিকে দেখে মাধালী যেভাবে কম্পমান হলো তাতেই যেন উপন্যাসটির হৃৎপিণ্ডটি একেবারে নতুন করে গড়ে নেওয়া যায়। আমরা চমৎকৃত হই। নিজেদের বাসনাকেই আবার দেখে নিতে পারি। এভাবে সমাপ্তি টানার জন্যই হয়ত একধরনের কামনা তাঁর ছিল। এ ধরনের পাঠে, সমাপ্তিতে বরং তাঁকে ভালোবাসাই জানাতে হয় আমাদের। কারণ তাতে একজন স্বাধীনতামুখর লেখকের সঙ্গে আমাদের ভাববিনিময় হতে পারল। আমরা ক্রমাগত লেখকের অন্যসব উপন্যাস-পাঠের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

গোলাপ সুন্দরী নামের উপন্যাসটি ছোট্ট আয়তনে জীবনবিন্যাসের অপরূপ জাদুকরী খেলা যেন। জীবনের বহুমাত্রিক গদ্যছন্দ যেন এতে বারবার চমকিত করে। *অন্তর্জলী যাত্রার* পূর্বে যে বড়গল্প ঘরানায় লেখা উপন্যাসখানা বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে, জনপ্রিয়তা পেতে পারে, তা হচ্ছে তাঁর লেখা *গোলাপ সুন্দরী*। এর ভাষাই শুধু জটিলতার দিকে অগ্রসরমান নয়, এর ইন্টারনাল বিউটিও চমৎকার। কমলকুমারের সৌন্দর্যব্যাকুলতা এখানে অসাধারণরূপে পাঠককে রীতিমতো চমকে দেয়। তার আগে কেউ খেয়ালও করতে চাননি যে তাঁর লেখাও পাঠকনন্দিত হতে পারে। এও যেন আরেক কমলকুমার। এভাবেই তিনি অনবরত নিজেকে ভাঙেন, ফের নিজেকে সাজানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্রসর হন। পুরো উপন্যাসটাতেই কাব্যময়তার অনাবিল স্রোত পাঠককে প্রত্যক্ষ করতে হয়; যদিও এ উপন্যাসের শেষদিকে কোনো তীক্ষ্ণ-অনুসন্ধানী পাঠক রবীন্দ্রকাব্যময়তার গন্ধ পেতে পারেন। এর মূল চরিত্র বিলাসের টিবি স্যানিটারিয়ামে থাকা, একসময় সেখান থেকে ডিসচার্জ নেওয়া, নির্জন ফুলবাগে ফিরে আসা, ভীষণ অবাক হওয়ার মতো গোলাপ ফোটানো, সেই এক নারীর জন্য অপেক্ষা এবং সেই নারীরও একসময় আগমন, সবই যেন অচিন কোনো মোহের তীব্রতায় ঘটতে থাকে। ঘটনার স্বপ্নময়তায় আটকে পড়ে পাঠক বারবার নিজেকে আচানক কায়দায় নিজেকে যেন ঝালাই করে নেন। এর শুরুতেই যে দৃশ্যময়তা তিনি আঁকতে থাকেন তাতেই ধরে নিতে হয়, এটি আর দশটা লেখার মতো হতে পারে না। এভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য বুনে যাওয়ার অপূর্ব সিনসিয়ারিটি ও মেধাময়তা আর কোথাও চোখে পড়ে না। তাঁর লেখার থিম নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ম্যালা যুক্তি-তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রতীক প্রয়োগ, চিত্রকল্পের বুনন, ডিটেইলের কাজ; এসবের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পেরেছেন বলে মনেই হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলকুমার এখানে পাঠককে রামকৃষ্ণঘেঁষা সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছেন। গোলাপ ফোটানোর পরিকল্পনা, চরিত্রসমূহের মনোজাগতিক চেতনাপ্রবাহ নিস্তেজ বাংলাপাঠককে রীতিমতো চমকে দেয়। এমনটি আর কোথাও কেউ দেখেছে বলে খুব একটা মনে পড়ে না। এ যেন আরেক মাইলফলক। এ উপন্যাসটির সময়কাল স্বদেশি আন্দোলনেরই সময়; কিন্তু রাজনীতির সেই ধারা তেমন করে কোথাও আসেনি। তিনি যেন খুঁড়ে-খুঁড়ে চমৎকার এক সৌন্দর্যে অবগাহন করার জন্য আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন। প্রত্যাশিত সেই নারী মনিক চ্যাটার্জী একসময় আসে সেই অতি আশ্চর্য গোলাপের জন্য; সে হয় জলরং তারও পর ভাস্কর্য। বিলাসের মৃত্যুকেও এভাবেই পৃথক দ্যোতনা দিতে পারেন লেখক। এখানে হিন্দুপূজকের মানসিকতা কাজ করার তেমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিতেও তেমন জোরালোভাবে কারো মনে পড়ার কোনো কারণ নেই মনে হয়। সবচেয়ে বড় বিষয়, এ লেখাটিতে আছে হীরার ঝলক, ক্ষণে-ক্ষণে ঘর্ষণে এর জ্যোতি যেন ক্রমশ বাড়ে। এভাবে এটি একটি অপূর্ব লেখা হয়ে বাংলা উপন্যাস ভুবনে তার জায়গাটি চিরস্থায়ী করে ফেলে।

অন্তর্জলী যাত্রার কথা আমরা নানাভাবে শুনি। এ উপন্যাসই কমলকুমারকে জনচিত্তের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এতে সুবিধা যেমন আছে, গ্যাঞ্জামেরও শেষ নেই। কারণ পাবলিক একটা স্ট্যান্ডার্ড অবস্থাকে বারবার নিরীক্ষা করতে চায়। একেই তারা প্রণম্য মনে করে। আমরা এ উপন্যাসের ভেতর দিয়ে জীবন-মৃত্যু-রং থেকে জৈবিকতার নানান বিন্যাস দেখি, সনাতন ধর্মের নানান প্রথা দেখি, জীবনের রস-গুণের সঙ্গে হাহাকারও দেখি।

এর শুরুটা বড়ই মায়াময়, যেন আলোর ধারা আমাদের মনোজগতে এক আলোক বিচ্ছুরণ করে। তা করতেই থাকে। আমরা গদ্যপদ্যের মিলিত এক স্রোতে পড়ি। এর গল্প এভাবেই এগোয়। আমরা এর শুরুতেই মনে করতে থাকি, কথাশিল্পের জগতেও কাব্য থাকে। রূপের জোয়ার থাকে, শব্দ থাকে, নৈঃশব্দও থাকে। আলোর বন্যায় যেন সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বলার ধরন যে আর কারো মতো নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি এমনই পৃথক যে তাঁর কোনো ফলোয়ারও নেই।

খুব বেশি চরিত্র তথায় নেই। সীতারাম, যশোবতী আর বৈজুই ঘুরেফিরে এসেছে তাতে। আছে ব্রাহ্মণ, গণক, যশোবতীর বাবা। আর আছে গঙ্গার তীর, এর অপার জলের ধারা। যেন মায়ের প্রতিরূপ এটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই দেড়-দুইদিনের ঘটনার ভেতর দিয়ে একটা উপন্যাস হয়। এটা এমন এক সৃষ্টি যাকে বারবার নানাভাবে আবিষ্কার করা যায়। এটিকে হিন্দুয়ানির সারাৎসার বলে এর সব বিষয় একবাক্যে হয়ত বলে দেওয়া যায়। তবে সেই বলা হবে অর্বাচীনের কিছু কথা। লেখক নিজে একে রামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ আর রামপ্রসাদের কাব্যবিগ্রহ বলে একটা সমাপ্তি টানতে চেয়েছেন। ঈশ্বর দর্শনের গল্পও বলেছেন একে। এতেই সব বলা হয়ে গেল? না, তা হয়নি। কারণ তাতে রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, গঙ্গার তীর, ঈশ্বর দর্শন, সনাতন ধর্মীয় কিছু আচার আছে, — তা সত্য। এখানে আবার একজন বৈজু আছে। একজন চণ্ডাল আছে। একজন লয়ের দেবতা, শ্মশানদেবতা শিব যেন সর্বত্র বিরাজ করছেন। একজন শ্মশানকামী কালীও আছেন। তাতে শুধু ধ্বংস নয়, মায়াও আছে। মা-কালীর প্রেমময়ী রূপ আছে, মায়ার দেবী আছেন, একজন যশোবতীর রূপান্তরমুখর চরিত্র আছে। আর সবকিছুর একেবারে গহিন প্রদেশে একজন বৈজু আছে। সে জীবনকে ভালোবাসা দেখায়, মানুষের সতত সুন্দরময় জীবনের চমৎকার রূপ দেখায়। নতুন বউ তাতে রঙিন হয়, সে জীবনকে উদ্ভাসনের পথে আসে। তাই আমরা দেখি। বিকল্প জীবন দেখি। তবে তা আছে একেবারে নৈঃশব্দ্যের মতো। আমরা নানা মাপের, নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে জীবনের হাহাকার যেমন দেখি, বেঁচে ওঠার ধারণাও প্রত্যক্ষ করি। তাতে নান্দনিক আবহ আমরা নতুন মননে দেখতে থাকি।

আমরা যা দেখি, তা যে কমলকুমারের দীর্ঘ সাধনার বিষয়, তা তাঁর কথনলীলার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়। এ এক খেলা, এ এক মানবলীলা বটে। এ যে বাংলা কথনশিল্পের নতুন এক ঠিকানা, ধারণা, বন্দনাও বটে। সাহিত্যের নতুন ব্যঞ্জনা তাতে আছে। শব্দ, বাক্য, উপবাক্য, বাক্যের নানান ভাংচুর, যতিচিহ্নের নবতর ব্যবহার আমরা দেখে দেখে অবাক, বিচলিত, এমনকি আমোদিত হই। তা যে একধরনের সাহিত্যদশার বিষয়, গভীর অনুসন্ধানের বিষয়, তাই মনে মনে বিবেচনা করতে থাকি।

আয়তনের দিক থেকে *শ্যাম-নৌকা গোলাপসুন্দরীর* সহযাত্রী। আবার কাব্যশৈলীর দিক থেকে একে *সুহাসিনীর পমেটমের* সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। এর বাক্যসমূহই শুধু নিজস্ব ঢঙে দীর্ঘ করা হয়নি, বাক্যের গঠন, যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে ভিন্নধারার। এও সত্যি যে, কমলকুমার তাঁর উপন্যাসসমূহের জন্য আলাদা-আলাদা জায়গা-জমিন আর কাঠামোগত বিস্তৃতি রাখেন। এখানে মনে হতে পারে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালাচাঁদ, দুকড়ি, রসিক ওরফে রস আর কালাচাঁদের বাবাটাকে ঘিরে একটা লোকায়ত জাদুর জাল ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার এমনও মনে হতে পারে, তাঁর কাজটা হচ্ছে সনাতন ধর্মের ধারণাকে আবারো পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসার প্রকাশও এতে তীব্রভাবেই আছে। মহিষ চুরিকরত কালাচাঁদ তার বাবাকে তাতে চড়িয়ে চিকিৎসার জন্য যাত্রা করে। এবং এইসবকে ঘিরেই *শ্যাম-নৌকার* গল্পও চালু থাকে। ভাববিগ্রহের এক জাদুকরী নেশা শ্যামরূপী ছায়ায় ছায়ায় বাড়ে। এখানে প্রথমদিকে রসিক আর দুকড়িকে ঘিরে কালাচাঁদের মতো কুলীন ব্রাহ্মণ যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাতে শেষের দিকের কালাচাঁদের বাবার মৃত্যুর যন্ত্রণাময় সৌন্দর্য একেবারেই আলাদা। একটার সঙ্গে অন্যটার যেন কোনো মিলই নেই। আসলে এটুকুর সঙ্গে মিলমিশটি পাঠক দেখবে *শ্যাম-নৌকার* সঙ্গে কঠিন শৃঙ্খলিত মৃত্যুর লোকায়ত ধাঁচ থেকেই।

এ উপন্যাসের অন্যতম দিক হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর-অবিনাশী প্রচেষ্টা করা। পরাজিত না হওয়ার তুখোড় মানবিক চেতনার ভেতর কাজ করেই। কমলকুমার এসব অত্যন্ত কাব্যময়তায় আঁকতে থাকেন। ছোট্ট এ উপন্যাসটির প্রধান নান্দনিকতা হচ্ছে এর ভাষাসৌকর্য। অবশ্য ভাষার যে স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে দেখা যায় তাতে কারো-কারো বঙ্কিমের অপরূপ ভাষামাধুর্যের কথা মনে পড়তে পারে। তবে এখানে ফরাসি-ইংরেজি ঢঙে তিনি তাঁর ভাষাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছেন। কমলকুমারের ভাষার যে জটিলতা এখানে আছে, একে কষ্টার্জিত বলা যাবে না নিশ্চয়ই; মনে হয় এতে আছে ভিন্ন এক নান্দনিক দশা। এ নিপুণতা তিনি তাঁর পুরো উপন্যাসটিতে দেখাতে পেরেছেন।

জীবনকে চেখে-চেখে দেখার, নিবিড়ভাবে ভালোবাসার এক তুখোড় প্রেরণা লালন করে কালাচাঁদের বাবা। ডাক্তার যখন রোগীটাকে গঙ্গাতীরে শ্যাম-নৌকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়ে দেন মৃত্যু অবধারিত এবং হাসপাতালেও ওকে ভর্তি করাতে চান না; কারণ মৃত্যু যেখানে অচিরেই আসছে এবং ডেডবডি ডোম বা নীচুজাতের মানুষজন স্পর্শ করবে। একজন ব্রাহ্মণের ওপর এমন আচার-নিষ্ঠার ধরনে ডাক্তারের আপত্তি আছে। এখানে খুব কৌশলেই জীবনের বহুবিধ ইতিবাচক দিকও প্রচণ্ড সাংকেতিকতায় নিয়ে আসেন তিনি।

এক মৃত্যুর ভেতর দিয়ে এখানে মৃত্যুর এক মিছিল যেন প্রত্যক্ষ করি। কালাচাঁদের বাপকে নিয়েই এ স্বল্পজীবী উপন্যাসটির নানান ক্ষেত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দেখতে পাই। সে তার বাপটাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টাই করে। শেষতক আর তাকে বাঁচানো যায় না। নাকেমুখে রক্ত ওঠে সে মারা যায়। তবে জীবনমৃত্যুর নানান দোলাচলে লোকায়ত জীবনস্রোতের নানান বিষয় আমরা দেখি। বর্ণনার চমৎকার একটা আবহ আমরা দেখি; সমন্বিত চৈতন্যের এক আবহের ভেতর আমরা কখনো কখনো মগ্ন হতে বাধ্য হই। আমরা বাস্তবতার নানান রূপ তো এক ছোট্ট উপন্যাসে খেয়াল করি। উপন্যাসের যে মান্য রূপ, প্রচলিত যে ধারা আছে, চরিত্রের বিকাশ, নানানমুখী চলাচল, তা কিন্তু সেইভাবে আমরা পাই না। বরং কমলকুমার দেশজ রূপায়ণের এক নতুন ধরন আমরা লক্ষ করি। জীবন থেমে যাওয়ার পরও তা চলার একটা বিষয় আমরা লক্ষ করি। কমলীয় বুননের কাছে নিজেদের প্রচলিত ধারণাকে বিভিন্নভাবে মিলিয়ে দেখতে পারি। উপন্যাসের নতুন ধারণার কাছে আমরা শৈল্পিক চৈতন্যকে নতুন দিকে নবায়ন করে নিতে পারি।

কমলকুমারের ভাবনা বারবার দোলায়িত হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট ধারণায় তিনি স্থির হয়ে থাকেননি। যে গঙ্গায় তিনি শূন্যতা দেখছেন কেবল, সেখানেই কালাচাঁদ তার বাবাকে পরম আত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় নির্দ্বিধায় একাকী ত্যাগ করছে। কমলকুমারের ভেতর আসলে লোকায়ত জীবনের প্রতি স্বাধীন ভাবনা যেমন আছে, রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদী মৃন্ময় ঘরানার পৌরাণিক জীবনবিন্যাস তাঁর যাবতীয় সৃজনশীল মেধাকে খানিক হতবিহ্বল করে দেয়।

শ্যাম-নৌকা নামের উপন্যাসটির নামকরণের একটা মোহনীয়তা আছে, — এ যে এমন এক নৌকা, যা মানবিক সত্তার এপার-ওপারের এক যোগসূত্র নির্মাণ করে। এ এমন এক নৌকাও, যা পারাপারের এক সহায়ক হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রতীকময় প্রকাশনা আরো আছে, আরো নানাভাবে আমাদের জীবনভাবনায় প্রস্তাব রেখে যায়। মৃত্যুর কথা তাঁর শিল্পকর্মে আমরা নানাভাবে দেখি। *অনিলা স্মরণে*, *অন্তর্জলী যাত্রা*, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* ইত্যাদিতে নানাভাবে তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। জীবনের বৈরাগ্যসাধনা, আত্মা, পরমাত্মার খেলা আমরা পাঠ করি। ভাবজগতের নানান প্রবাহ আমরা তাঁর সৃজনকর্মে লক্ষ করি।

অনিলা স্মরণে নামের উপন্যাসটিতে আমরা অনিলা বিষয়েই সচেতন হতে পারতাম। কিন্তু তাতে জীবনের অত বেশি দিক উন্মোচিত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে একদিকে আমরা আমাদের মনোযোগকে দিয়ে রাখতে পারি না। নানান সত্য, নানান কথা, অনেক অনেক দ্বন্দ্ব এখানে আছে। অনিলার জীবনে একেবারে যুক্ত হয়ে আছে তার বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন। ফলে তার বাবার মৃত্যুকেও সে মেনে নিতে পারে না। এ মৃত্যুতে মায়ের অবহেলাকে সে দায়ী করে। তার মায়ের প্রেমজ এ নতুন সম্পর্ককে অতি খারাপভাবে সে দেখে। তার মায়ের প্রেমিককে সে মেনে নিতেই পারে না। আলাদা এক চরিত্র হয় সে। প্রতিক্ষণে তার ভেতর যেন নবতর মানুষের জন্ম ঘটে। তার পরিবর্তন অনেক ভাবনার জন্ম দেয়। নানাভাবে নানান সত্তাকে যেন আমরা স্পর্শ করি। তবু আমরা ওর মা লাবণ্য দেবীর জীবনকে অস্বীকার করতে পারি না। তার ভালোবাসাকে আমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি না। ফলে লাবণ্য দেবীর জীবনের নানান দিক আমাদের ছুঁয়ে যায়। তাকে নানাভাবে আবিষ্কারের নেশা হয়ত আমাদের থাকেও। এটি কমলকুমারের প্রথম দিকের রচনা হলেও কমলীয় ভাষিক নমুনা আমরা তাতে দেখি। জীবনের বহু রূপ তাতে প্রত্যক্ষ করি। এর ভাষাসৌকর্যও তাঁর অন্য যে কোনো উপন্যাসের মতো অত জটিল, প্যাঁচ দেওয়া নয়। মায়ার প্রকাশ অনেক সহজিয়া।

অনিলার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটি আমাদেরকে ভাবায়। বাবার প্রতি কন্যার একধরনের প্রীতিময় সম্পর্ক থাকতেই পারে। তবে এ নিয়ে আমরা খুব বেশি উপন্যাস দেখি না। অমিয়ভূষণের *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* নামের উপন্যাসটির নাম আমরা করতে পারি। শহীদুল জহিরের আবু ইব্রাহীমের মৃত্যুতে এ-ধরনের একটা বিষয় খুবই হালকাভাবে আছে। অনিলা তার বাবার স্মৃতিকে ক্ষণে ক্ষণে মনে করে। বাবাকে সে ভুলতে পারে না। তার ভেতর সে ঈশ্বরত্ব দেখে, তার সত্তার ভেতর সে যেন মিশে যেতে চায়। যেন মহামায়া তাকে ভর করে, তা নিয়ে সে ব্যাকুল হয়। একধরনের দশাপ্রাপ্ত অবস্থা তার ভেতর আমরা দেখি। লাবণ্য দেবীর সঙ্গে রঞ্জিত চ্যাটার্জীর সম্পর্কের বিস্তারটি বেশ আকর্ষণীয়। সম্পর্ক ক্রমশ বাড়ে, তারা বিবাহিতও হয়। যা এ উপন্যাসের আলাদা প্রাণ রূপে আমরা দেখি। আমরা আরো লক্ষ করব যে উপন্যাসটি ক্ষুদ্র আয়তনের হলে কী হবে, তাতে চরিত্রের তো বিকাশ ঘটে। অনিলার সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কটি হয়ে উঠেছে কখনো কখনো স্পর্শময়, কখনো সত্তাময়। লাবণ্য দেবী নিজেকে প্রকাশ করেছেন। নিজেকে বদলে নিয়েছেন। আধুনিকতার নতুন উদাহরণ হয়েছেন তিনি। এটিই উপন্যাসটির নতুন চেহারা এবং তা কমলের একধরনের দ্রোহ বটে।

ভাষার ক্ষেত্রে নতুন কিছু দিক আমরা দেখি। লম্বা বাক্য তাতে আছে। সুন্দরকে চিহ্নিতকরণের স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছে। পার্থিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের কথা যেমন আছে, অনিলা বা তার বাবার ভেতর দিয়ে একধরনের বৈরাগ্যও প্রকাশ পেয়েছে। একধরনের সততা, সাধুতার বিকাশ তাতে ঘটেছে বলা যায়। কাব্যময়তার একটা ইশারা আমরা পাই। আমরা বুঝে যাই, কমলকুমার-সৃজিত কথনে ইশারা দেওয়ার এক-একটা জাগতিকতার প্রকাশ ঘটবেই।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক-এর আরম্ভটি অনেক বেশি কাব্যিক। যেন এক দৃশ্যকাব্য আমরা ক্ষণে ক্ষণে উপভোগ করে যাই। শিবপুরীর কাহিনি এটি। কাজেই ধর্মমত আছে। নানান কাহিনি আছে, ধর্মের চলাচল আছে। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পাঠক দেখবে জীবনের কত ভাংচুর শুরু হয়। ধর্মের খোলস ঝরে পড়তে থাকে। কতজন কতভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে তা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। আমরা যেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পাখির কথাই জানতে থাকি। সে পাখি পিঞ্জরে বন্দি থাকে। সে পাখি হচ্ছে মানুষের জীবন।

এ উপন্যাসের কাহিনি বয়ে গেছে সহজ সোজা পথেই। যেন কোনো কাহিনির কাছে লেখক দায়বদ্ধ নন, আলাদা এক শিল্পসৌন্দর্য দর্শন করানোতেই তার একান্ত ভাবনা বিস্তৃত করছেন। শিবমেলায় হারিয়ে বালক সুঘরাই ঘুরতে থাকে। দুনিয়াদারির সঙ্গে সে আপন খেয়ালে পরিচিত হতে থাকে। দুনিয়াতে দেখার কত কিছু আছে! তার তো মনিব আছে, মনিবপত্নী আছে। তাদের চিন্তা আছে, তাকে নিয়ে ফের ভাবনাও আছে। আমরা এক শুকপাখির কথা শুনি। সুঘরাই পাখিটাকে মেলায় নিতে না পারার জন্য দুঃখ করে। ওর মন খারাপ হয়। ওই পাখিটার একসময় রোগ হয়। শরীর ঘায়ে ভরে যায়। একে সে তখন বাইরে ফেলে দেয়। এর ভেতরে লেখক মিথময় কাব্যিক জাদু দেখান যেন। খাঁচায় আটকে থাকা পাখি যেন শোষণ-পীড়নে আটকে কষ্টময় মানুষের বাঁচার চিহ্ন। শিবকে তিনি তার ভাষাশৈলীর গুণে পাঠকের একেবারে সামনে হাজির করেন, প্রাকৃতজনের বন্ধু হিসেবে আনেন। তিনি যেন ভণ্ডধার্মিকের রোষে পড়েন। নিজেকে এসব থেকে আড়ালে রাখার জন্য ঠাকুরদের ছায়া থেকে সুঘরাই নিজেকে সরিয়ে রাখে। মনিবপত্নীর চরিত্রটি লেখক দারুণ দক্ষতায় নিয়ে এসেছেন। তাতে পাঠকের মনে হতে পারে, সুঘরাই নামের হড়িয়াল ডোমের প্রতি তার মায়ামমতা অনেক বেশি; তাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আসলে তো তাকে মানুষের কাতারেই গণ্য করেন না মনিবপত্নী। কথাক্রমেই বলতে হয়, মানব জাতিতে ৯৪ লক্ষ অণুজাতি আছে বলে সনাতন ভেদতত্ত্ব বলে। এর ভেতর ৯০ লক্ষ জাতি আছে নিয়মনিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবজাতির; বাদবাকিরা পাপ-যোনিজাত। শুক পাখিটা নিয়ে নানা ভাবনা তাই হয়, ওইটাও হয়ত এমনই কিছু।

তিনি যেন তার পাঠককে সেই মানুষ আর পক্ষীকুলের ভেতর একটা মনোজাগতিক সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টাতেই নিমগ্ন রাখেন। এ সম্পর্ক যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানবজাতির ভেতর কেবলই ঘুরপাক খায়। সুঘরাই পাখিটাকে নিজের জীবনের অংশ মনে করে কি? অত গভীরভাবে একে সে ভালোবাসে! তাই আমরা হয়ত নানাভাবে অবজার্ভ করি। আমরা দেখি যে তার আঙুল কেটে রক্ত বের হলে পাখিটার কোনো প্রতিক্রিয়া তো দেখাই যায় না; বরঞ্চ পাখিটি চেটে-চেটে তার সেই রক্ত পান করে যেতে থাকে! সেই সময়টা আমরা খেয়াল করতে পারি। সুঘরাইয়ের তখন খুব রাগ হয়; পাখিটাকে আছাড় মারে সে। কিন্তু তাতে কী হয়, — পাখির তো এত রাগ জানার বা বোঝার কথা নয়।

মানুষ নিয়ে আমরা নানাভাবে ভাবি। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রভাবনা নিয়ে আমরা এখানে কথা বলতে পারি। সেখানে মানুষ তো রাষ্ট্রায়ত্ত পশুই। কথা হচ্ছে, পাখির কাছে বালকের এ কোন ধরনের আব্দার? আমরা সুঘরাইয়ের মনোজাগতিক চেহারা দেখি, তার ভালোবাসার কাঙালপনা দেখি। তার খাঁচাটা ডাক্তার দেখেন, তিনিও মুগ্ধ হয়ে যান। মরণ-উন্মুখ পাখিটাকে নিয়ে তার মনোতাপের বা গর্বেরও অন্ত নেই। আমরা সুঘরাইকে দেখি, তার হা-হুতাসনে আমাদের মনোপীড়া হয়। তার যেন রূপান্তর ঘটে, সে যেন বিবর্তনের অনেক স্তরের ভেতর নিমজ্জিত হয়। মনিবের কণ্ঠও তার কণ্ঠে ভর করে! মানুষের নানান পদের ইহজাগতিক রূপ নানাভাবে আমরা দেখি। গল্পের নবতর বিন্যাস দেখি। বর্ণনার তুমুল দাপট দেখে আমরা মুগ্ধ, চমৎকৃত হই। আমরা ভাষারও জাদু দেখি। আমরা একজন কমলকুমারের বহুমাত্রিক বিচরণ দেখে রীতিমতো মোহিত হই। উপন্যাসের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের কাছে আমরা বারবার ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করি।

আমরা নানা উপন্যাসের নানান কাব্যিক স্রোতে মগ্ন হই। আমরা তাঁর সৃজিত অদ্ভুত অপূর্ব উপন্যাস *খেলার প্রতিভা* পাঠ করি। আমি নিজেই ভাবি, বারবারই ভাবতে ভাবতে রীতিমতো ব্যাকুল হই যে 'খেলা' নিয়ে এত ব্যাকুলতা কমলকুমারের কেন ছিল। *খেলার প্রতিভা*, 'খেলার বিচার', 'খেলার দৃশ্যাবলী', সবশেষে লিখলেন 'খেলার আরম্ভ'! এ খেলার সঙ্গে লীলার যোগসাজশ কেমন? খেলার কি মায়া, অথবা রামকৃষ্ণ সর্বমানবমুখর কোনো মায়ার নাম? এখানে মানবচরিত আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ-সংস্কার, লোকাচার নিয়ে ভাবনা আছে। সর্বোপরি জীবনের একটা দিক উন্মোচনের প্রচেষ্টা বর্তমান তো নিশ্চয়ই।

আমরা এ উপন্যাসটিকে সবচেয়ে জটিল এক সাহিত্যকর্ম মনে করতে পারি। এখানে চরিত্রের তেমন নামই নেই। আছে একটা দল, মানুষের দল, — তারা দুর্ভিক্ষের শিকার। তারা মানবেতর জীবনযাপনে জীবন চালায়। জীবন কি তাদের চলে? আমরা এ উপন্যাসের শুরুতেই দেখব বর্গভীমা, মহাপ্রভু, মূলত রামকৃষ্ণের নামেই বন্দনা আছে। এ তো উপন্যাসের বাইরের কিছু মনে হয় না। যেন জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-আবাহন এখান থেকেই শুরু হলো। রামকৃষ্ণে তার ভক্তি থাকলেও 'খেলার আরম্ভ' নামের গল্পে কিন্তু তার এ ভক্তি বা ভালোবাসায় চিড় ধরে। কমলকুমার রামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেই বলেন, ঠাকুর তুমি তাদের ভুলে গেছ। কারণ তারা অতিশয় গরিব। এখানেই কমলকুমারের দ্রোহের একটা ইশারা আমরা পাই। তিনি কথা শুরু করেন ইশারায়, বলতে থাকেন ইশারায়, শেষও করেন ইশারায়ই। এমনই ইশারার এক-এক আয়োজন আমরা তার খেলার প্রতিভা নামের কর্মযজ্ঞে দেখি। আমরা অবাক হই, এই যে দুর্ভিক্ষের খেলা পাঠ করি, তাতে প্রতিভা কোথায় থাকে? কে এই প্রতিভার মালিক? কার ইশারায় অত দুর্ভিক্ষ হয়? আমরা এটা বারবার বুঝতে পারব যে এ দুর্ভিক্ষ একটা সিস্টেমের বিষয়। সবাই দুর্ভিক্ষে পড়ে না। যাদের পয়সা-কড়ি আছে, তারা বরং দুর্ভিক্ষ নিয়ে নানান ছলাকলা করে। আমাদের কেউ কেউ বলেন, এটা প্লটহীন, চরিত্রহীন একটা উপন্যাস, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এটা ঠিক যে এমন কাঠামোর উপন্যাস আমাদের আর নেই। এমন ভাষাও নেই। যতিচিহ্নের এমন ব্যবহার, প্রায় নিয়মহীন প্রয়োগহীন তেমনটি আর দেখা যায় না। ভাষার ঠাসবুনন একেবারে অপূর্ব এক ব্যাপার।

আমরা তাঁর উপন্যাসসমূহের শিরোনাম নিয়ে বরং কিছু কথা বলি। নামের ভেতর দিয়ে তিনি অনেক কথা বলে ফেলেছেন। তাঁর উপন্যাস যেন নামের শিরোনাম থেকে আলাদা এক এক জগতের দিকে যাত্রা করছে। এই যেমন ধরা যাক, *অন্তর্জলী যাত্রার* নামকরণে কেউ কেউ অন্তর জ্বলে যাওয়া যাত্রা ধরনের কিছু মনে করেন। অন্তত বাংলাদেশে এমনটি অনেক হতেও পারে। কিন্তু এ তো এক ধর্মীয় আয়োজনের নাম, যাকে মুসলমান সম্প্রদায় খতমে সাফা ধরনের কিছু বলবেন। এখানে সীতারাম নামের অতি বৃদ্ধকে গঙ্গার তীরে আনা হয়েছে, তার মুক্তির আশাটাই মূল বিষয়। আচার্য-ব্রাহ্মণ গণনা করে পান যে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু হবে তখনই যখন চাঁদ লাল বর্ণ ধারণ করবে! তবে তিনি একা যাবেন না, তিনি তার দোসরসহ যাবেন। তাই যশোবতী হয় বলির পাঁঠা, কুল-মান রক্ষার্থে তার বাবা যশোবতীকে বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কন্যা তা মানে, আবার তার জাগতিক সত্তা যেন তার বিরুদ্ধেই থাকে। শ্মশান-চণ্ডাল বৈজুর সঙ্গে একধরনের জাগতিক সম্পর্ক আমরা দেখি। আমরা *শবরীমঙ্গল* পাঠ করতে থাকলে শবরী নামের এক নৃগোষ্ঠীর সন্ধান পাব, যার ভেতর দিয়ে জীবনতৃষ্ণার আদি জাগতিক অনেক বিষয় আমাদের মনোজগতে ঘুরেফিরে আসে। মাধালীর জীবন-আচার যেন এর ভেতর দিয়ে আলাদা এক মাহাত্ম্যের সন্ধান পাই আমরা। *শ্যাম-নৌকা* নামের উপন্যাসটিও শ্যাম আর নৌকার জাগতিক সম্ভাবনার ভেতর দিয়ে নতুন এক ভাবনায় নতুন এক কথনলীলা প্রকাশ করে। শ্যাম তো এই জীবনের আনন্দ-প্রেম-মায়ার প্রতীক। জীবনকে একেবারে গভীর থেকে ছুঁয়ে দেখার এক ভাব আমাদের আসে। এতে এক প্রেমলীলা হয়। কিন্তু নৌকা তো এখানে পারাপারের এক চিহ্ন। অপার গঙ্গার অপার জীবনের সঙ্গে এক জৈবিকতা প্রকাশ পায়। আমরা এইভাবেই চমৎকার নামকরণের ভেতর দিয়ে জীবনের আরেক জৈবিকতা বুঝতে থাকি। *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* এক পাখির গল্প মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এর মূল চরিত্র সুঘরাইয়ের জীবনের নানান স্তরের ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক জীবনের নানান আবহ আমরা বুঝতে থাকি। জীবনকে একধরনের মুক্ততার ভেতর দিয়েই কমলকুমার আমাদের এ জগতের নানান অর্থ, বর্ণ, রূপ চেনান। *অনিলা স্মরণের* কথা মনে করা যাক, আমাদের মনে হবে অনিলাকেই আমাদের কেবল স্মরণ করতে হয়। কিন্তু অনিলা তো তার বাবা আর মায়ের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সে তার বাবাকে একেবারে জৈবিকভাবেই পছন্দ করে। তাই তার মা কর্তৃক অন্য জনকে ভালোবাসার বিষয়টা মানতে চায় না। সে নিজের জীবনকে বিনাশের পক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা এক জীবনগ্রাসী অনিলাকে স্মরণ করতে করতে তার মায়ের জৈবিকতাকেও স্মরণ করি। আমরা জৈবিক-স্মরণকেই আসলে গ্লোরিফাই করি। আমরা গোলাপ সুন্দরীর কথা মনে করতে করতে আসলে প্রেমজ জীবনকেই জীবনের সর্বস্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। বিলাস টিবি স্যানিটারিয়াম থেকে বাসায় গিয়ে গোলাপের চাষ করে। এমন এক গোলাপের প্রত্যাশী সে হয়, যেখানে এক সুন্দরী আসবে। সে মুখ ফোটে ভালোবাসার কথা বলবে না, বা বলা লাগবে না; কারণ তার এভাবে তথায় আসার ফলে এক গোলাপ ফুটবে। তাতেই ভালোবাসার কথা বলা হয়ে যাবে। এমনই অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যুতিময় ভালোলাগার এক উপন্যাস আমরা পাঠ করি। এর নামকরণের সৌন্দর্য যেন আপন-মহিমাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। এমনই সৌন্দর্যব্যাকুল আরেক উপন্যাস হচ্ছে *সুহাসিনীর পমেটম*, যা আসলে গোলাপ সুন্দরীর আরেক সহযাত্রী। পমেটম হচ্ছে মুখের সৌন্দর্য বাড়ানোর এক কৌটা, যার ভেতর একধরনের পাউডার আছে। এও এক জাদুময়তার প্রতীক যেন। আমরা আরো একটা উপন্যাসের নাম করতে পারি *খেলার প্রতিভা*। এ খেলা আসলে লীলারই আরেক প্রকাশ, যেন প্রতিভা বা অতি বুদ্ধিময়তার রূপচ্ছটা প্রকাশ পায়। তবে তাতে আছে হাহাকারের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা, এ এমনই এক খেলা যেখানে জীবন চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

তার উপন্যাসে শিল্পের স্বরূপ কেমন তা জানার চেষ্টা করতে পারি। কোন নান্দনিক সৌন্দর্যকে তিনি ক্রমান্বয়ে বুনে গেছেন? এটি তাঁর মানসচেতনাকে বোঝার জন্য অপরিহার্য একটা বিষয়। এমনই মনে হয় যে, বহুকণ্ঠআশ্রিত শিল্পরূপ এঁকে যাওয়াই তাঁর মৌলচেতনার উৎস। তাঁর গদ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নান্দনিকতার আয়োজনের আভাস খুবই স্পষ্ট। তবে তাঁর বাক্যের জটিলতম বিন্যাস সেই আয়োজনকে ঝাপসা করে দেয়। বাক্যের হুলস্থুল প্যাঁচগোছ পাঠ-স্বাদুতার প্রধান অন্তরায়। এতেই সহজাত লোকভাবনা ক্রমশ পাঠকের মনোপীড়নের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবনা প্রকাশের ধারায় শুভ আর সৌন্দর্যের ভেতর আলাদা প্রবহমানতা থাকে না। যার ফলে রামকৃষ্ণের লোকায়ত সমাজনিষ্ঠা যত প্রকাশ পায় শিল্পের স্বাধীন বিকাশ ততই রুদ্ধ হয়। তবে এতে যে রামকৃষ্ণীয় ভাবনার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় না তা কিন্তু বলা যাবে না। জিতেন্দ্রীয় অনুভব আর উনিশ শতকীয় সনাতন ভাবঘেঁষা লৌকিক ধর্মের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। মানবিক তৃষ্ণার একটা রূপ কখনো কখনো তাঁর সৃষ্ট জীবনচিত্রে দেখা গেলেও ধর্মীয় আভিজাত্যময় লৌকিক ছাপ ক্ষণে-ক্ষণে জাগরূক থাকে।

তাঁর উপন্যাসে নারীচরিত্র নানান মাত্রা নিয়ে আসে। নারীতে মাতৃরূপ প্রকাশের একটা মানসিক চাপ তাঁর আছে। কিন্তু তিনিই তো গোলাপ সুন্দরী বা সুহাসিনীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যেখানে ভালোবাসা তার অবদমনকে মিইয়ে দিতে পেরেছে। যশোবতীর মতো অত সীমিত ক্ষমতার (সামাজিক শৃঙ্খলই যার মূল কারণ) নারীও ভালোবাসার কাঙাল হয়। প্রেমে কখনো কখনো প্রাণ খোঁজে নেয়। রোমনির (*শবরীমঙ্গল*) মতো প্রকৃতিমুখর এক নারীচরিত্র আমরা পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*কে তিনি প্রায় নারীশূন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রেখেছেন। পাঠকের অন্তত তাই মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে মনিবপত্নী যে মমতা নিয়ে আছেন, মনিবের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারেন, তাও কিন্তু একটা বিষয় বটে। আমরা এখানেই সারদাসুন্দরীর উল্লেখ পাই, যার সাধনা রামকৃষ্ণসাধনার একটা দিক বটে। বর্ণনার ধরনে যে প্রকৃতি আছে, তাতে আছে বিমূর্তসৌকর্যের প্রকাশ, উপমার আধিক্যে প্রকৃতিরূপী নারীর প্রকাশ দেখি।

আমরা সেই সময়কার অর্থাৎ উনিশ শতকের তিনটি সাংস্কৃতিক আবহ নিয়ে কিছু কথা বলতেই পারি। সেই রূপ তিনটির প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্কিম, রবিঠাকুর আর স্বামী বিবেকানন্দকে বিবেচনায় নিতে পারি। আমরা গদ্যের রূপটিকে দেখার জন্য আমাদের বিবেচনাকে বরং আরো একটু পেছনে সরিয়ে দিই। আমাদের বাংলাগদ্যের লিখিত আবহ শুরু হয়েছে ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসনেরও আগে। তখনকার গদ্য অত বিকশিত হতে পারে নাই। পদ্যকে আশ্রয় করে কিছুটা চর্চা হয়েছে, আইনের কাজ চালানো হয়েছে। কিন্তু তবু গদ্য ছিল। তাতে ফারসি-আরবি, সংস্কৃতের প্রভাব ছিল। বাক্যের এমন সুগঠিত রূপ ছিল না। যেটুকু ছিল, তাও পদ্যের দাপটে মিইয়ে থাকত। ইংরেজরা তাদের শাসনের স্বার্থে সিভিলিয়ানদের আরো কাছে আনার জন্য বাংলার চর্চা শুরু করে। বঙ্কিমের ছায়ায়, মায়ার আবহে, সংস্কৃতকে দাপটের ভেতর রেখে একধরনের কথনশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*-এর বৈঠকি ভাষা, লৌকিক আবহের সাধনা খুব বেশি এগুতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্র আর রামমোহনরা যেই ভাষা চর্চা করেন তাতে একাডেমিক একটা ফ্লেভার থাকে। সেই ফ্লেভারকে আধুনিকতার স্পর্শ দেন, কলকাতার মায়া তথা ব্রাহ্মরূপ যুক্ত করা হয় কলকাতার ঠাকুরবাড়ির লিডারশিপে। তাতে যেই কথনশিল্প আসে, তাই আমরা এখানেও পাঠ করি, — তাই প্রমিত রূপ নিয়ে এখনো আমাদের সাহিত্যজগৎকে শাসন করছে বলা যায়। তবে দেশভাগের ফলে, সময়ের ধারাবাহিকতায় ভাষার রূপ বদলাচ্ছে। তবে রামকৃষ্ণ তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনার ভেতর দিয়ে একধরনের লৌকিক আবহ এখনো আমরা লক্ষ করি। তাই হয়ত সাহিত্যসাধক কমলকুমারের হাত ধরে অতি বহুমাত্রিকতার এক ধরন আমরা দেখছি। বহুমাত্রিকতা বলা হচ্ছে এ জন্য, তাঁর ভেতর একটা স্পষ্ট ভাষাব্যবস্থাপনা দেখি না। তিনি যে ভাষার ধরন প্রকাশ করেন, লৌকিক আবহ স্পষ্ট করতে চান, তা অনেকটাই যেন রামকৃষ্ণকে চরমভাবে লালন করার ভেতর দিয়েই এসেছে। ভাষাটা তাঁর, সেই ভাষা বঙ্কিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ধার করা নয়, বরং বিদ্যাসাগরের বাক্যবন্ধনকে নিজের মতো করে কমলকুমার ব্যবহার করেছেন। তাতে বৈদিক সৌন্দর্য আছে, দেবী কালীর নানান মেজাজের প্রতি তাঁর সাংস্কৃতিক পক্ষপাত আছে, লোকায়ত আবহ আছে, সবকিছুর পর একজন স্বোপার্জিত সাহিত্যসাধক আছেন।

তাঁর সৃজিত সাহিত্যে যে লোকায়ত আবহটা আছে, কালচারাল হেজিমনি যে আছে, আমরা তা টের পাই। এখানে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গকেও আলাদা করে দেখতে হবে। কারণ আমাদের এখানে যে লোকসাধনার বিকাশ ঘটেছে তাতে সুফিবাদ, ওয়াহাবি আন্দোলন, মাজার-সংস্কৃতি, লৌকিক গীতিকা, বিশেষত ময়মনসিংহ গীতিকার একটা প্রভাব আছে। এখানে যে লৌকিক আবহের বিস্তার হয়েছে তা তো সরাসরি হয়নি, বলা যায়, ময়মনসিংহ গীতিকা, জসিম উদ্‌দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসদের সাহিত্যশৈলী ধরেই বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা সেইভাবে হয়নি, — বরং তাতে বৈদিক আচরণ মাখা সাহিত্যকর্ম, লোকদেবতা, মন্দির, আখড়া প্রভৃতি ধরে তা বিকশিত হয়েছে। এইখানে একজন রামকৃষ্ণকে লোকদেবতা হয়ত বলা যাবে না, তবে তাঁর আচরণের ভেতর লোকআবহ যে আছে তাঁকে সেই জায়গাটি হয়ত দিয়েছে। কমলকুমার রামকৃষ্ণের সেই জায়গাটিই গ্রহণ করেছেন। ভাষাকে বিকশিত করেছেন। গল্পকে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেননি, লোককথার আবহে, হয়ত তা আধুনিক বটে, তবু তা লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা যে আধুনিকতা দেখি তার জন্য কথকের যন্ত্রণা আছে। তিনি একেবারে শেষের দিকে সুঘরাইয়ের ভাবতরঙ্গে বলিয়ে দেন, আ-আধুনিকতা! এখানে আ-এর মতো লোকজ উপসর্গ আর বিস্ময়বোধক চিহ্নই তাঁর সৃজিত আধুনিকতায় লৌকিক আবহ স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা এই স্পষ্টতাকে বাসনা করতেই পারি।

তাঁর ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে বরাবরই একটা তর্ক আছে। কিন্তু তা সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য কার্যকর একটা বিতর্ক, আমরা প্রতিষ্ঠান দিয়ে, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির প্রচলিত মেজাজ দিয়ে তাঁকে বিচার করতে লেগে যাই। বরং বলা যায়, প্রতিষ্ঠান তার পেছনে আছে তাঁকে মানুষ করার জন্য। তাঁকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকেই রীতিমতো কাহিল হয়ে যাচ্ছেন। তবে কথা হচ্ছে, তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ কোন সে বিদ্যালয়ে পাঠ করেছেন? তিনি যে ধর্মসাধনা বা জীবনসাধনা করতেন, তা ধর্মআচরণের কোন শাখায় পড়ে? এমনকি তিনি যে দশাপ্রাপ্ত হতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন-সমাধির ভেতর নিমজ্জিত হতেন, তা কি কোনো প্রথা মেনে করতেন? তিনি যে সকল ধর্মমতের পেছনে ছুটে বেড়াতেন, তার কি বৈদিক রূপ আছে? তা তো নেই। তিনি তো যাবতীয় প্রথাকেই হিসাবে আনতে চান নাই। তাহলে তাঁর সৃজিত মানবসাধনাকে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি তথা পাঠ্যতালিকা দিয়ে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সৃষ্টিশীলতা কি সংসদীয় বিল পাশ করে হয়; প্রচলিত নিয়ম মেনে হয়? সৃষ্টিশীল সাহিত্য তো সেইভাবে হয়ই না। একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক সাহিত্যের আইন সৃষ্টি করবেন, প্রথা ভাঙবেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যাবতীয় গুরুচণ্ডালীকে আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু কমলকুমার গুরুচণ্ডালীতে ছিলেন না, তাঁর সৃষ্টিতে স্বোপার্জিত প্রেম ছিল, নিজের যুক্তিগ্রাহ্যতা ছিল। চিহ্নের ব্যবহার থেকে শুরু করে বিশেষ্য, বিশেষণ ব্যবহার, বাচ্য-প্রয়োগ, অনুসর্গ আর অব্যয়ের পারস্পরিক লেনদেন, ভাষার অন্তর্গত মায়া প্রায়শই নিজের মতোই শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করেছেন।

তার উপন্যাসে শিল্পের স্বরূপ কেমন, কোন নান্দনিক সৌন্দর্যকে ক্রমান্বয়ে বুনে গেছেন? এটি তাঁর মানসচেতনাকে বোঝার জন্য অপরিহার্য একটা বিষয়। এমনই মনে হয় যে, বহুকণ্ঠআশ্রিত শিল্পরূপ এঁকে যাওয়াই তাঁর মৌলচেতনার উৎস। তাঁর গদ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নান্দনিকতার আয়োজনের আভাস খুবই স্পষ্ট। তবে তাঁর বাক্যের জটিলতম বিন্যাস কখনো কখনো সেই আয়োজনকে ঝাপসা করে দেয়। বাক্যের হুলস্থুল প্যাঁচগোছ পাঠ-স্বাদুতায় অন্তরায় বটে। এতেই সহজাত লোকভাবনা ক্রমশ পাঠকের মনোপীড়নের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবনা প্রকাশের ধারায় শুভ আর সৌন্দর্যের ভেতর আলাদা প্রবহমানতা থাকে না। ফলে রামকৃষ্ণের লোকায়ত সমাজনিষ্ঠা যত প্রকাশ পায় শিল্পের স্বাধীন বিকাশ কিছুটা হলেও রুদ্ধ হয়। তবে এতে যে রামকৃষ্ণীয় ভাবনার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় না তা কিন্তু বলা যাবে না। জিতেন্দ্রীয় অনুভব আর উনিশ শতকীয় সনাতন ভাবঘেঁষা লৌকিক ধর্মের সঙ্গে স্বতন্ত্র দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। মানবিক তৃষ্ণার একটা রূপ কখনো কখনো তাঁর সৃষ্ট জীবনচিত্রে দেখা গেলেও ধর্মীয় আভিজাত্যময় লৌকিক ছাপ ক্ষণে-ক্ষণে জাগরূক থাকে।

তাঁর লেখায় উপনিষদও এসেছে, মায়াবাদের আবহ আছে, স্বপ্ন আর বাস্তবতার ঘোর আছে; কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের সাহস নিয়ে তিনি তাতে হয়ত আঘাত করেননি। তাঁকে কখনো মনে হয় তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ের ধর্ম বিস্তারের পদ্ধতিকেই সমর্থন করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও তাঁর আরেক জীবনজিজ্ঞাসা বটে। *শবরীমঙ্গল* আর *সুহাসিনীর পমেটমে* বহুমাত্রিক ধর্ম অনুভূতির মানুষকে জড়ো করলেও সেখানেও কোনো ভিন্ন ধর্মের চরিত্র নেই, যদিও এ উপন্যাসে ভাষাশৈলী থেকে শুরু করে জীবন জিজ্ঞাসারও অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন লক্ষ করা যায়। তবে বর্ণপ্রথার ভয়াল-কর্কশ রূপ তাঁর উপন্যাসে আছে, কখনো তা এসেছে সরাসরি, কখনো তা এসেছে উপমা-রূপক ইত্যাদির মাধ্যমে। এ তাঁর সাহিত্যসাধনার উল্লেখযোগ্য দিক।

কমলকুমারের ভাষার ধরনটি কেমন? নিশ্চয়ই তা নিবিড় পাঠ-প্রত্যাশী এবং স্বনির্মিত ভাংচুরও প্রচুর। তিনি কি বামাচারী গদ্যশৈলীতে বিশ্বাসী? তাঁর সবই কি মেকি? ইচ্ছে করেই তিনি আলাদা ভাষা-ইনস্টিটিউট গড়তে চেয়েছেন? না বোধ হয়, কিংবা তাই হয়ত তাঁর একটি দিকও। তবে বঙ্কিমের প্রতি তাঁর নেশা থাকলেও তিনি নিজের মতো করেই প্রতিটি বর্ণ, বাক্য, বাক্যস্থিত শূন্যতা ব্যবহার করেছেন। রবিঠাকুরের কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষার বিস্তারকে তিনি আলাদা করে দেখার বাসনা রেখেছেন। তা থেকে নিজেকে আলাদা করেছেন, পরম সৌন্দর্যবিলাসী হয়েছেন তিনি। আলাদা এক বাউলিয়ানা, ধূলিধূসরিত জীবনের প্রতি মমতা গড়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষা দীর্ঘজীবী হওয়ার আপাতত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি? তাঁর সৃষ্টিশীলতার ধরনটি কেমন? শ্মশানের তাপে জ্বলে-জ্বলে তাঁর ভাষায় কি মানুষের হাড়গোড় মাংস-নাড়িভুঁড়ির পোড়া গন্ধে ঠাসা? তাঁর বিদ্রোহটা আসলে কোন জায়গায়? আদৌ কি তিনি কোথাও পৌঁছতে পারলেন? তাঁকে পাঠক কেন অত কষ্ট করে পড়বেন? তাঁর ভাষার কি সামাজিক ভিত্তি বা সাহিত্যিক বোধ নেই? তিনি কি এতই স্বেচ্ছাচারী যে তাঁকে আলাদা মর্যাদা দেওয়ার কিচ্ছু নেই? বঙ্কিমের কাছে তাঁর ঋণ কতটুকু? নাকি তাঁর সহযাত্রী কেউ নেই? তিনি কি ব্যাকরণহীন ভাষার স্রষ্টা? তিনি অতই নৈরাজ্যের অধিপতি? গদ্যশৈলীর অচেনা আধিপত্য তাহলে পাঠককে বিরক্তই করবে শুধু? তাঁর ভাষা কি স্বয়ম্ভু? তাঁর কি নিজের ওপর কোনো কন্ট্রোল নেই? সবকিছুই তো এক কথাতেই জানা হবে না। অত বেহিসেবি হয় শিল্পচর্চা? রঙের যে কী অসাধারণ ভাষাজীবিতা থাকতে পারে, তা রবিঠাকুর কিংবা অন্য কারো লেখায় আসেনি। বঙ্কিমও এদিকটাতে তেমন উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এত উপমার শক্ত গাঁথুনি, চিত্রকল্পের নিটোল বর্ণনা হাসান আজিজুল হক ব্যতীত আর তেমন চোখে পড়ে বলে মনে হয় না। কমলকুমারের ভাষা বলে এক কথায় সব কিছুই বোঝানো যাবে না। কারণ *শবরীমঙ্গলের*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনাধর্মী প্রায় শরৎচন্দ্রীয় ভাষার সঙ্গে *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* বা *সুহাসিনীর পমেটম*কে এক করে দেখা যায় না। প্রায় সবদিক থেকেই এসব পৃথক। কাজেই কমলকুমারকে বিচার-বিবেচনায় রাখতে হলে প্রত্যেক রচনাকে আলাদা করে বিবেচনা করা উচিত।

গল্প কি নিজেকেই বুনে যাওয়া নয়? আঠারো শতকের আগে তো সাহিত্যশিল্পী বা কথকরা জানতই না যে মুখের ভাষা দিয়েও সাহিত্য হয়। তাহলে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস পদ্যরীতিরই এক্সটেনশন? সেই ভাষাতে ছন্দের বা তালের আধিপত্য থাকাটা কি অসম্ভব? আর সাহিত্যের ভাষার কি আদপেই কোনো সীমারেখা বা বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন থাকে? বাংলা ভাষার তো নিজস্ব ঘরানার ব্যাকরণই নেই, যা আছে তা সংস্কৃতের দুর্বল ছায়া বৈ কিচ্ছু নয়। এই যখন অবস্থা তখন কী করে নির্ণয় করা যাবে যে এই হচ্ছে বামাচারী বা স্বেচ্ছাচারী বাংলা: যা দিয়ে কমলকুমার ভাষা নামক দরবারটিকে অতিশয় কর্দমাক্ত করে দিলেন — এভাবেই কি রায় দেওয়া যায়? না, তা একেবারেই দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, এও সত্যি, ভাষা দিয়ে যাচ্ছেতাই কিছু করা যায় না, কারণ তার পরিমিতি বোধ আছে, ভাষাশৈলীর আপাত নিয়ম-নীতি আছে। এর বাইরে যাওয়ার একটা যুক্তি নিশ্চয়ই থাকা দরকার। এখন এ বিষয়টা দেখা খুবই জরুরি, তিনি আসলে কদ্দূর কী করতে চাইলেন বা উন্মাদনা করলেন কি না?

তিনি মূলত বিকল্প সত্য সন্ধান করেছেন। এখনও যেন তাই করে যাচ্ছেন। তার ভেতরে আছে চিরন্তন সজীবতা। আমরা যে উপন্যাস চিনি, মানে ইউরোপতা যেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে, তিনি তার থেকে দূরে থেকেছেন। তিনি বাংলা ভাষার একটা উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন, মৌলিকত্ব আনতে চেয়েছেন সেখানে। তিনি কিছু মানুষের কথা বলেছেন, সেই মানুষকে তিনি চেনেন, তাদেরকে সাধনা করার মতো কায়দা ও করণকৌশল তাঁর জানা আছে। যার জন্য যে চরিত্র তাঁর আওতাধীন নয়, যে মানুষকে সাধন-ভজন করা যায় না, যদিও তারা বাংলায় কথা বলেন, তিনি তাদের পছন্দসই মানুষ, পাপ-তাপ-সংস্কারের কাছে রেখে গেছেন। এটা একধরনের সীমাবদ্ধতা বলে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু বায়বীয় সত্য তিনি রচনা করেন না। এখানে তাঁর মৌলিকত্ব, এখানেই তাঁর দৃঢ়তা।

তিনি যে বাংলা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য স্বপ্নপুরুষ তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেউ কেউ তাঁর লেখাকে হেঁয়ালিপূর্ণ আর উদ্ভট গদ্যশৈলী বলেছেন। তবে কথা দিয়ে প্রথার কাছে বন্দি না থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভটত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, নৈরাজ্যের মতো ভাষিক দর্শনে নিজেকে নিমজ্জিত করা তো কম কথা নয়! এও যে শিল্পের সাধনা বটে! কিন্তু এটাও বোধ হয় মনে রাখা দরকার তিনিই সফল লেখক, যিনি শুধু অপরকে নন, নিজেকেও উৎরে যেতে পারেন। কমলকুমারও তাই করেছেন; অনবরত নিজেকে ভেঙেছেন, ফের ভিন্নমাত্রায় গড়েছেন। তিনি নিজেই নিজেকে অনবরত ভেঙেছেন এবং কখনো কখনো নিজের শিল্পসৌকর্যতায় অতিক্রমও করে গেছেন। সম্পূর্ণ যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে সমুদয় সৌন্দর্যকে উপস্থাপনের সম্ভাবনা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা তেমন তৈরি করতে চাননি তিনি। সত্যম-শিবম-সুন্দরমের নান্দনিক স্পৃহার বাইরে বিচরণ করেছেন, তবে তা নিয়েও নানান মত চলতে পারে। তাঁর চৈতন্যে ধর্মীয় চিন্ময়ীরূপ হয়ত বিস্তৃত হয়েছে, তাও একেবারে ফাইনাল সিদ্ধান্তের মতো বলা যায় না। এসবও স্বতঃস্ফূর্ত নান্দনিক চেতনাকে সংকুচিত করেছে কেবল। তিনি অনেকটা দার্শনিক-নন্দনতত্ত্ববিদ হেগেলের সৌন্দর্যবিষয়ক ভাববাদী অধ্যাত্মধরনের ভাবনা সহযোগে যেন পৌরাণিক ধারণার পঞ্চভূতের অপার রূপদর্শনের মৌতাতে মেতেছিলেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা স্বনির্ভর হয়নি। এমনকি তা হয়ত করতে চানওনি। তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব কায়দায় আবেগময়তায় কখনো কখনো প্রচণ্ড দাপট নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর ভাষায় চিত্রশিল্প আঁকতে চেয়েছেন। এ তাঁর নিজস্ব ধারার নান্দনিক আয়োজন। এসবের সঙ্গে কিংবা এসব অন্তর্জগতের ভেতর দিয়ে আমরা বারবার *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*কে দেখি, অনুভব করি, সাহিত্যসাধনার বাসনার সঙ্গে হয়ত যুক্তও করে দিই।

পুনঃলিখন ২৪-৯-২০১৪

ঋণস্বীকার
কমলপুরাণ : রফিক কায়সার
কাব্যবীজ কমলকুমার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত
কমলকুমারের উপন্যাসের করণকৌশল : শোয়াইব জিবরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের কমলকুমার লোকায়ত দ্রোহের মায়াবী বাউলিয়ানা

ছোটগল্পের জগৎকে যে কজন তাঁদের তেজময় স্নায়ুর উত্তাপে নিরন্তর প্রাণবন্ত রেখেছেন, কমলকুমার মজুমদার তাঁদের প্রথম সারির সিদ্ধিজন। তিনি খুব বেশি গল্প লেখেননি; তারপরও যে হিরণ্ময় জ্যোতি ছড়াতে পেরেছেন, তা একেবারেই অভূতপূর্ব। তিনি তাঁর লেখায় নিজস্ব চেতনাপ্রবাহই আনেননি, ভাষায় আলাদা ইমেজ ছড়াননি শুধু, একটা কালের গল্পপ্রবাহে নিজস্ব ঘরানার প্রতিনিধিত্বও ছড়াতে পেরেছেন। বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে আলাদা আসন তাঁকে দিতেই হবে। তবে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁকে নিয়ে তেমন আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে বলে দাবি করা যাবে না। বঙ্কিমের পর ভাষা নিয়ে এত ঘোরবহুল ইমেজ কেউই ছড়াতে পারেননি। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর ভাষাশৈলীর জন্য যদি আলাদা ইনস্টিটিউটের মর্যাদার দাবিদার কেউ হতে পারেন, তা হলে অবশ্যই সেই ব্যক্তিত্ব কমলকুমার মজুমদার। অত্যন্ত যত্নশীল এত বিশাল ঋষির মর্যাদা পেতে পারেন; তিনি শুধুই কমলকুমার মজুমদার। এমনতর একটা হিসাব কোনো কোনো কমলজন করেন যে, কম লেখা দিয়ে লেখাজোখায় সিরিয়াসনেস প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর পাশে হয়ত দাঁড়ানোর মর্যাদা রাখেন সন্দীপন, অমিয়ভূষণ, ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ হক, হাসান বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসই। এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, কথাসাহিত্যের এত বড় প্রতিভা নিয়ে তেমন কোনো বিস্তৃত আলোচনাই হচ্ছে না। এটা হতে পারে যে, ইন্টারনেট আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রাসের এ-কালে তাঁর দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবসরই কারো নেই। কারণ তাঁকে পাঠ করতে গেলে যে অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে তাই আসলে এ যুগের টেন্ডেসি নয়। তা হলে মানুষ ক্রমশ ক্যাবল অ্যান্টিনার এ-কালে গল্প দেখবেই শুধু? কথাক্রমে বলতে হয়, কমলকুমার কি আদৌ দেখার বিষয়? তাঁকে কতটুকু দেখার আর কতটুকু বোধের অন্তস্তলে নেওয়ার বিষয়? এটা একেবারেই সত্যি, কথাসাহিত্য বা অন্য শাখার সঙ্গে দৃশ্যনির্মাণের সহযোগিতা হতে পারে; কিন্তু একজন কমলকুমার বা হাসান-ইলিয়াসকে কখনো ফিল্ম বা নাটকের ফিতায় বন্দি করা যায় না। এ জগতের আলাদা মূর্ত-বিমূর্তের ছায়ানির্মিত ইমেজ থাকতে বাধ্য।

কথাসাহিত্যের চর্চা কি বাংলা ভাষায় হচ্ছে না? তা তো খুবই হচ্ছে। তা হলে কমলকুমার মজুমদার এত উপেক্ষিত কেন? এ বিষয়ে যে অভিযোগটা সবসময় শোনা যায় তা হচ্ছে তাঁর লেখার দুর্বোধ্যতা। এই বিষয়টা এতই প্রতিষ্ঠিত একটা বিষয় যে তার পরে যেন এ নিয়ে আর কোনো কথাই হতে পারে না। অথচ আমরা যদি একটু খেয়াল করি তা হলে দেখব যে, তাঁর ৩০ গল্পের ভেতর বড়জোর ১০টি গল্প পাঠের ব্যাপারে আলাদা তীব্র-তীক্ষ্ণ মনোযোগ দাবি করে। অথচ বাদবাকি ২০টি গল্পও সেই একই অভিযোগের আওতায়ই পড়ে যাচ্ছে। এটা সত্যি, তাঁর কিছু গল্পে দুর্বোধ্যতা প্রকটভাবেই আছে। এ আলোচকও যে সবগুলো গল্প একেবারে নিখুঁতভাবে বোধের ভেতর আনতে পেরেছে এমন নয় মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এর কারণ হতে পারে দুটি — ১. তাঁর গল্প নিয়ে তেমন আলোচনাই হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশে আলোচনাজনিত সমস্যাটা তো আরো প্রকট। কমলকুমার আলোচক রফিক কায়সার তাঁর যত্নশীল বই *কমলপুরাণে* শুধুমাত্র 'রুক্মিণীকুমার' নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর কমলকুমারের ব্যাপারে তিনি তাঁর সার্বিক চরিত্রবিধানে *কমলপুরাণ* নামের প্রবন্ধগ্রন্থটি লিখেছেন। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত নিপুণভাবে বিশ্লেষণপূর্বক লিখলেন *কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার*। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *কমলকুমার, কলকাতা, পিছুটানের ইতিহাস*। কমলকুমারের সময়, দেশভাবনা, বন্ধুবান্ধব, তাঁর সৃজনশীলতা নিয়ে হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন *কমলকুমার মজুমদার মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব*। আবু বকর সিদ্দিক কমলকুমারের উপন্যাস *শবরীমঙ্গলের* ব্যাপারে মুখবন্ধরূপী খানিক আলোচনা করেছিলেন। সেটিই বোধ হয় বইটির ভূমিকা হিসেবে ছাপানো হয়েছে। অশ্রুকুমার শিকদার লিখেছেন *অন্তর্জলী যাত্রা* নিয়ে। আর কমলকুমারের ব্যাপারে যত্নশীল সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রুক্মিণীকুমার' নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই বোধ হয় কমলকুমারের মতো সিরিয়াস স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনার দায়বদ্ধতা। সম্প্রতি শোয়াইব জিবরান তাঁর গ্রন্থ *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল* নামের উপন্যাসভিত্তিক একটা পরিশ্রমলব্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। মোহাম্মদ আজম, আবু হেনা মোস্তফা এনাম, মোসাদ্দেক আহমেদ তাঁর সাহিত্য নিয়ে পর্যবেক্ষণমূলক রচনা লিখেছেন। ২. তাঁর গল্পের সার্বিক রীতি, বলার ঢঙ, চরিত্রের বিকাশ, তাদের আচার-ব্যবহারে এত বেশি হিন্দু লোকাচার আর জীবনযাপন প্রণালি মিশে আছে; যা এ অঞ্চলের পাঠকদের কাছে অনেকটাই অচেনা। যার ফলে বেশির ভাগ পাঠকই তাঁর ব্যাপারে একেবারেই নিরুত্তাপ থাকেন। তাঁর লেখার জটিলতার ব্যাপারে বঙ্কিমের সঙ্গেই তুলনা চলে। তবে এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়, দুজনের একটা মৌলিক পার্থক্যও আছে। সেটা অনেক ব্যাপারে হলেও এখানে শুধু লেখার স্টাইলটা সম্পর্কে বলতে হয়; বঙ্কিম সব সময় তাঁর জটিলতার ব্যাপারে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আমেজ বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু কমলকুমারের ব্যাপারে বলতে হয়, তিনি পাঠকের ব্যাপারে অবিচারই করেছেন। কারণ তাঁর এ জটিলতা মাঝে মাঝে আরোপিত আর কষ্টকল্পিতও মনে হতে পারে। তাঁর জটিলতার ব্যাপারেও এ কথাটা একেবারে মিথ্যে নয় (সুনীল গাঙ্গুলীর কথা); তিনি তাঁর লেখার প্রথমদিকেই বেশি জটিল থাকেন। পাঠক ধৈর্য ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকলে নিশ্চয় তার মনোযোগ অতি মনোযোগ আর অসামান্য প্রাপ্তির দিকেই যাবে। কারণ তাঁর মতো করে জীবনকে এত নিবিড় আর নিখুঁতভাবে আর কোনো কথাশিল্পী দেখেছেন বলে মনে হয় না।

আলোচনার শুরুতেই তাঁর প্রথমদিকের গল্প থেকে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করছি আমরা, তা কেন করলাম, তা-ই শুরুতে বলে নেওয়া যেতে পারে। কথা হচ্ছে, আমরা যে কমলকুমার মজুমদারকে জানি, চিনি, তাঁর গল্পপাঠে উচ্ছ্বসিত হই, এমনকি কখনো কখনো হতবিহ্বলও হই, তা কি এই গল্পসমূহ নিয়ে? না, তা হয়ত নয়। তবে কমলকুমারের কমলকুমারীয় প্রবণতা সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞাত তা মনোচেতনার ভেতর আছে বলে ধারণা রাখা যায়। আমরা তাঁর যেসব গল্প বা গল্পসমূহকে পাঠ-দুঃসাধ্য বলতে চাই, তা কিন্তু এর ভেতর পড়ে না। তবে কথিত সেই কঠিন-জটিল গল্পই হয়ত এই গল্পগুলো পাঠের তাড়না তৈরি করে। কারণ এই গল্পগুলোর মাধ্যমেই তিনি তাঁর গল্পচর্চা শুরু করেছিলেন। গল্পের সোপানশৈলী যথামুখী হতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লাল জুতো' নামের গল্পটির শিরোনাম যদি ছেঁটে ফেলা দেওয়া হয় তাহলে কি এটি নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা সুবোধ ঘোষের গল্প হয়ে যাবে? প্রশ্ন হিসেবেই এতে অস্বচ্ছতা আছে — তবে এমনটি ভাবার কিছু কারণও আছে, আমরা শুধু একবারই এমন এক কমলকুমারকে পেলাম, একবারই তাঁকে পেয়ে হারালাম, যেখানে তিনি দৃশ্যত সাদামাটা ধরনের এমন এক গল্প লিখেছেন। কিন্তু এই ভাবনাও দীর্ঘজীবী হতে পারে না, কারণ গল্পটির ভেতরই এত চমৎকার এক স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক ব্যাপার আমরা অনুভব করতে থাকি, যা শেষ পর্যন্ত কমলকুমারের নিজস্ব সৃষ্টিই হয়ে যায়। খুবই সাধারণ একটা বিষয়ের এক গল্প। নিম্ন মধ্যবিত্তের নীতীশ মাত্র এক টাকার জন্য একটা লাল জুতোজোড়া কিনতে পারে না। লাল জুতোদ্বয় সোয়েড আর পেটেন্ট লেদারের এক কম্বিনেশন। সে বাড়ি চলে আসে। বৌদিকে সেই গল্পই করে। বৌদির ছেলে টুটুলের জন্য সেই জুতোজোড়াটি আনবে বলে। আসলে এটি আনতে চায় গৌরীর জন্য, আরো খোলাসা করে বললে, নীতীশ আর গৌরীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। কিন্তু প্রতিবেশী গৌরীর সঙ্গে তো তার এখনো বিয়েই হয়নি। যার জন্য পরদিন জুতোজোড়াটি আনলেও তাকে তা সরাসরি বলতে পারে না। একসময় বলে। জুতোজোড়া গৌরীর কোলে রাখে। তখন যেন এক মাতৃমূর্তির সৃষ্টি হলো। গল্পটিতে মানুষের বিচিত্র ধরন এবং তার প্রবহমানতা খুবই জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এটি পাঠ করতে আমাদের মানসিক শ্রম তেমন দিতে হয় না। আমরা যে কমলকুমারের জন্য উদগ্রীব বা ভয়ে থাকি তা এখানে নেই। বরং — 'নীতীশ ভদ্রতার খাতিরে বলল, পাওয়া গেল সেই স্বপ্নময় জুতো' ধরনের আপাত-নিরীহ বাক্য/বাক্যাংশও আছে। কিন্তু এতে এ লেখকের স্বকীয়তা যে পাওয়া যায় না, তা তো না। এখানেই তাঁর আলাদা শক্তি বা রূপ আমরা দেখি।

'জল' নামের গল্পটিকে না হয় জলের গল্পই ধরা গেল, কিন্তু এই জল জীবনের অপর নাম নয়, এ নয় জীবনকে ধুয়ে-মুছে সাফ করার গল্প। এখানে আমরা এমনই জলের গন্ধ পাই, সেই গন্ধ ছাড়িয়ে এর এমন দাপট প্রত্যক্ষ করি, যেখানে জীবন জলের নিষ্ঠুর আচরণে একেবারে খণ্ডিত-ম্লান হয়ে যায়। জল জলদস্যুর মতো জীবনকে তছনছ করতে থাকে। গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। বোল্‌দে নামের গ্রামে ফজল আর নন্দরা ছাড়া কেউ থাকে না। থাকে না মানে অভাব ওদেরকে জয়নার বেড়িবাঁধে নেয়, আরো অন্যত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখতে পারে। তার ভেতরই ফজলরা তিন দিন না খেয়ে থাকে। নন্দ খুড়োসহ শরীরে তেল মেখে ডাকাতি করতে বের হয়। তা করেও। ডাকাতির মালসামানা ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগাভাগি করে। সন্দেশ, ধামা, এমনকি কুইনাইন ট্যাবলেটও ভাগ করে। এ গল্পে আছে চমৎকার এক ভাষা। যেন জলের হিংস্রতা দিয়ে তা বয়ে-বয়ে যায়। আর আছে ডায়লগ। অভাবই যেন কথার তুফান ছুটায়। এভাবেই জলজ গন্ধময় হিংস্রতায় পরিপূর্ণ এক জীবন দেখি। শব্দের এত স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যময়তা তাঁর খুব কম গল্পেই আছে। একধরনের সহজিয়া ধরনের কোলাহলও আমরা টের পাই।

'মধু' শিরোনামের গল্পটি সম্পর্কে এক কথায় বলে দেওয়া যায় এটি একটি দুর্দান্ত প্রেমের গল্প। এবং যা বেড়ে উঠেছে মানুষের স্বভাবজাত লোকজ ভঙ্গিকে কেন্দ্র করে। কলাবতী মধু বিক্রি করে। এরা কলকাতার নয়, অন্য জায়গা থেকে এসে মধু বিক্রি করে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। তেমনিভাবে মধু বিক্রির উসিলায় কথকের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক হয়। গল্পকার এখানে নিয়ন্ত্রণকারী, তারই নিজস্ব নেশায় এর ধারাবাহিকতা বহমান হয়। এ গল্পে অনেক কথায় বলে দেওয়া হয়। এ গল্পকার যা করতে পছন্দ করেন না, এখানে তাই করেছেন। সমস্ত মনোযাতনাই এখানে প্রকাশিত। কোনো আড়াল নেই। অথচ বনজ-লোকজ-রূপজ-এর সঙ্গে নাগরিক কথনের যেখানে একটা বোঝাপড়া, মানসিক লেনদেন হয়, সেখানে আড়ালটা শক্তপোক্ত আচরণে রূপ নেয়, যা এমনিতেই চলে আসার কথা। তা হয়নি। প্রথম দিনেই কলাবতীর ঘরে যায় কথক। কলাবতীর স্বামী জীবদয়াল, বোন সুবচনীর সঙ্গে পরিচয় হয়। অনেক কথাবার্তা চলে তার। কথক নাগরিক কায়দায় তাদের ওইখানে যাওয়ার দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকে; ফলে অভিমানও জমা হয়। তা কিছুকাল থাকেও, তবে গল্পের প্রবহমানতায় তা চিরজীবী হয় না। মনোজীবিত্বে নতুন ধারা তৈরি হয়। কলাবতীর আমন্ত্রণেই আবার সেখানে যায় সে, তারও পর সুবচনীকে ওষুধ দিয়ে সে ভালোও করে। এবার আনুষ্ঠানিক দাওয়াত পায় কথক। কলাবতীর সঙ্গে সহজাত মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে তো আর চলে না, কলাবতীরা অন্যত্র চলে যায়। তাও ঘটে কথকের অভিমান বা হিসাব-আশ্রিত কথার রেশ ধরেই। হাওড়া স্টেশনে ওদের বিদায় জানানো হয়। কথক আবার কলাবতীদের খালি ঘরে যায়। দারুণ নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয় সে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে আদিম সহজাত জীবনের পার্থক্য তাকে খুবই কাতর করে ফেলে। সে তখন ঘরের জমি আঁকড়ে রাখে। চমৎকার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। এভাবেই কমলকুমার অনেকটা তাঁর স্বভাবের বাইরে থেকেও হৃদয় তোলপাড় করা এক চমৎকার হার্দিক সম্পর্কের গল্প বলে যান। ভাষার ধরন এখানে আলাদাই। ডায়লগও প্রচুর। তবে এমনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়, বনজ জীবনের আলো-আঁধারি খেলার ভেতর দিয়েই যেন তিনি ভিন্ন এক রোমান্টিক আবেশে পাঠককে জড়াতে পারলেন। গল্প শেষ হলেও মধুময় এক আমেজ আমাদের যেন মোহময় আবেশে জড়াতে থাকে। আমরা কলাবতীর কথা যেমন মনে রাখতে পারি, তেমনি কথকের মনোযাতনাকেও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি।

তবে গল্পটিতে শেষ পর্যায়ে মাতৃভক্তির যে ধরন আমরা লক্ষ করি তা হতে একধরনের 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' বা রামকৃষ্ণ কর্তৃক মা কালীকে মাতৃরূপে বন্দনা করার একটা প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষতাজাত। কথকের সঙ্গে কলাবতীর যে মানসিক সম্পর্ক তা প্রেমজ কামনা-বাসনার দিকে হয়ত যেতে পারত। এবং তাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মায়ের মৃন্ময়ী রূপ একটা গল্পের স্বাভাবিক বহমানতা একটা অপরিচিত ধারণার প্রতি ধাবমান করে রাখল। কারণ আমরা পৌরুষের কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা বুঝতে পারলাম না। আর মাতৃরূপও খুব যে পরিকল্পিত কায়দাই হলো তাও নয়। বলা যেতে পারে পাঠকের পরিচিত রুচিবোধ খুব বেশি ধাক্কাও খেল না!

'তেইশ' গল্পটি নিয়ে কিছু কথা বলতে গেলে এর রচিত হওয়ার কাল নিয়েও কিছু বলা বা জানা দরকার। গল্পটি আজ থেকে প্রায় ৪৯ বছর আগে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে লেখা হয়। তখন ভারত দূরে থাক, তৎকালীন পূর্ববাংলা থেকেও জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের আওয়াজ তখনো কিছুটা রয়ে গেছে। গল্পটিতে জমিদার কর্তৃক জমি হুকুম-দখলের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে পুণ্যাহের কথাও। আলমের মতো অনেক চাষি তখন সামন্তশোষণে নিগৃহীত হচ্ছে। ওদের পিতৃপুরুষ অন্য জায়গা থেকে এই টুলটুলিতে আসে। তখন সমস্ত লাট চরাচর বেহাসিল ছিল। জমি পত্তন নিয়ে চাষাবাদ করে এরা। কিন্তু তাদের জমি হঠাৎই নিলামে ওঠে। এরা পরোয়ানাও পায়নি। অথচ আলম সাবেক প্রজা। নানা কথাবার্তা চলে। জমি ফিরে পাওয়ার নানান বুদ্ধি নেওয়া হয়। তখন কৃষকরা একজোট হয়ে জমি আদায়ের সংগ্রামে নামতে চায়। কিন্তু তা কি সম্ভব? সেই আন্দোলন থেকেও তাদেরকে পিছু হটতে হয়। টুলটুলি থেকে আলম একসময় বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়। এহেন সংগ্রামমুখর শোষিত-নিপীড়িত অন্ত্যজশ্রেণী নিয়ে সরাসরি আন্দোলনের ঝাঁঝালো গল্প তাঁর আর নেই। এখানে সময়কে তিনি নির্ণয়ই করেননি, ধারণও করেছেন। আলমই গল্পের প্রাণ। জমি হারানোর পর তার দিন যে আর কাটে না। তার দুঃসময়ের অন্ত নেই। জমিজিরাত তো কিছুই নেই। এক চোখ নিয়ে সে কী করবে? তাই সে রাখ্ ডামনির কাছে যায়। ওষুধ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডান চোখটিও অন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার আলম পুরোমাত্রায় অন্ধ ভিক্ষুক। সে ভিক্ষা করে। তবু সে তার প্রিয় টুলটুলিকে ভুলতে পারে না। জমি-জিরাত নিয়েও ইতোপূর্বে তিনি গল্প লেখেননি। এখানে অধিকার ফিরে পাওয়ার একটা জান্তব আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে আছে। গল্পকে সহজাত ধরনে টেনে একটা প্রবণতা তৈরি বা জারি করার ইচ্ছা লক্ষ করা যায়।

তাঁর 'মল্লিকা বাহার' গল্পটির কথাই ধরা যাক, মনে হবে এ যেন নগর-সভ্যতায় বয়ে চলা একালের এক ভাসান যাত্রা, যেখানে এ-সময়ের বেহুলারূপী মল্লিকা ঘাটে ঘাটে নাও ভেড়াচ্ছে। যৌনতার বিকল্পকথন এখানে আন্দোলনমুখর আছে! এ গল্প সেই সময়কার কলকাতার, যখন ইন্টারনেট বা সেলফোন দূরে থাক, গ্যাসের চুলাই সবখানে জ্বলত না। তখনকার নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবারের মল্লিকা নিজের জায়গাটি খুঁজে নেওয়ার জন্য কখনো ব্রজ, কখনো আনন্দ, কখনো-বা শিশিরের স্মৃতিতে মশগুল হচ্ছে। তাকে নিয়ে শব্দযোগে একধরনের চলচ্চিত্রায়ন আমরা দেখি। গল্পকারের ভাষা এখানে অনেকটাই কাব্যগন্ধি হয়ে যাচ্ছে, সমাপিকা ক্রিয়া, যতিচিহ্ন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। তবে এখানে গল্পের গীতল ভাবটি ক্রমশই একটা শক্তপোক্ত জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। গল্পটির শুরুর লাইনটি এরকম — 'আয়নায় এখন; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট।' বাক্যটি প্রতি মুহূর্তেই যেন গুঁড়াগুঁড়া হয়ে যাচ্ছে। অসম্পূর্ণ, অনেকটা খাপছাড়া। কিন্তু এর ভেতরে যা আছে এবং যা নেই তাই আমাদের দেখা দরকার। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, কমলকুমার পাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। বাক্যটি এমন দাঁড়ায় — 'আয়নায় নিজেকে দেখার ভেতরই মল্লিকা আঁচলে মুখ মুছছে, এবং তাতেই তার মুখটি স্পষ্ট হচ্ছে।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাঠক গল্পটি তার মানসিক শক্তি বা মেধা দিয়ে হয়ত বাক্যটি কিংবা দৃশ্যটি নির্মাণ করছেন। এখানে লেখক পাঠককেও কিছু দায়িত্ব দেন, কিংবা পাঠকই তার মানসিক প্রবহমানতা অনুযায়ী তা সৃষ্টি করেন। পাঠকও এখানে সৃজনশীল। একজন সৃজনশীল পাঠক কমলকুমারকে বোঝার বা জানার জন্য পথটি তৈরি করতে থাকেন। এ ধরনের আরো কিছু নমুনা হাজির করা যাক — 'সম্মুখ আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াবে এ কথা অসম্ভব মিথ্যা বই অন্য না।' বাক্যটি কি পরিপূর্ণ রূপ পেল বা আমাদের চেনাজানা ব্যাকরণ মেনে চলল? তা কিন্তু নয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতে বাক্যটি হয়ত এভাবে নির্মিত হয় — 'সম্মুখ আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াবে (পেয়েছে/দেখেছে), এ কথা অসম্ভব মিথ্যা বই অন্য না।' এভাবে পড়লে অর্থাৎ একটা সমাপিকা ক্রিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্ত করে এর সঙ্গে কমা যুক্ত করলেই যেন আমরা বাক্যটি বুঝতে পারি। কিন্তু কমলকুমার তা করেননি। তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে, পাঠকের জন্য একধরনের গীতলময় ধাঁধা তৈরি করে রেখেছেন। সেখানেই পাঠক তার বোধশক্তিযোগে বাক্যটি পরিপূর্ণ করবেন এবং গল্পের সহযোগী হবেন। কমলকুমার আসলে ফরাসি/ইংরেজি ভাষার বাক্যশৈলী, যতিচিহ্ন, পাঠ-প্রণালি তাঁর ভাষা-রীতিতে জারিত করেছেন। যার ফলে আমরা অর্থাৎ সনাতন পাঠ-অভ্যস্ত মানুষজন একেবারে টাসকি লেগে যাই। ব্যাকরণ তো ওহি নাজিল হওয়ার কোনো বিষয়ই নয়। এ তো কোরআনের বাণী বা বেদবাক্য নয় যে একে কিছুই করা যাবে না। ভাষা তার সময় বা সমাজচেতনাকে অস্বীকার করতে পারে না। মূল কথা হচ্ছে, যারা ভাষাকে নিজের অধীনে নিয়ে শব্দ, বাক্য, চিহ্নযোগে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন, পাঠকের মনে একধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সেই কাজটিই কমলকুমার তাঁর সহজাত মেধাযোগে ভ্রাম্যমাণ রাখতে পেরেছেন। তাঁর আরো তিনটি বাক্য পাঠ করা যাক — ১. '..., সে জোড়া সেখানেই তেমনই।' ২. '..., চারদিকে চেয়ে একটু কাপড় তুলে সায়া, সায়াতে হাত মুছবে।' ৩. 'বীণা মেয়েটি সে হয় জন্মরুগ্ন।' দৃশ্যত মনে হবে বাক্যগুলো অসম্পূর্ণ, কিন্তু গল্পটি পাঠ করতে থাকলে পূর্বাপর একধরনের রিদম টের পাওয়া যায়, এবং তাই এখানে পরিপূর্ণ মাধুর্য বোধ করায়। আসলে এ হচ্ছে কমলকুমারীয় গদ্যের নতুন যাত্রা।

তবে 'মল্লিকা বাহার' গল্পটি ক্রমাগত ২২-২৩ বছরের একজন যুবতীর সমপ্রেম আর কান্নাময় সারাৎসার হয়ে আছে। আয়নায় খোয়াবের একধরনের বিস্তার আমরা দেখতে দেখতে তার জীবনের জটিলতা ক্রমাগত পাঠ করতে থাকব। সে এমনই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে যুবতী যে, তার ঘরটিও স্যাঁতসেঁতে, ছেঁড়া মাদুর, অকেজো তৈজসপত্র, ছোট্ট আয়নার জীবন তার। সেই আয়নার অন্তরীক্ষে জীবনের গভীরতা দেখে সে। সারাটি গল্পই যেন মল্লিকাসন্ধানের এক কাহন। নিজেকে নিরীক্ষণ করে সে। একটি চিঠি পায়। আবারো নিজের বিগত জীবন মনে করতে থাকে। তার বন্ধু জানিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই ওর বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু তার এমনটি হওয়ার যেন জো-ই নেই। কাউকে সেভাবে ভালোই-বাসা হলো না তার। শিশিরের কথাই ধরা যাক, সে তাকে কীভাবেই না জ্বালাত! শিশিরের বাপ শিশিরকে খুব মারল। সেই শিশির এখন এমএ পাশ করে খারাপ স্বাস্থ্য নিয়েই মাস্টারি করছে। মল্লিকা নতুন চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছে। তাই তার মা সবাইকে জানায়। এসব সে ভাবে, ভাবতে-ভাবতেই সে বের হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক-একটা শব্দ, তার ভেতরের নীরবতা, সরবতা, এমনকি দৃপ্ততাযোগে সে সামনে এগোয়। লেখক সেই শব্দ, ধ্বনি, নীরবতাযোগে তাকে একসময় ব্রজদার বাসার সামনে এনে দাঁড় করায়, ভেতরে ঢুকে। ব্রজ তখন না-পুরুষ, না-মহিলার আবেশে মল্লিকাকে দেখে। ব্রজ বউ দেখে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের যৌথ জীবন হতে পারত ভালোবাসায় পূর্ণ, শীৎকারময়। তা হয়নি। আসলে মেয়েমানুষকে ভালোবাসার স্বাভাবিক ক্ষমতা বা স্বাদ হয়ত ব্রজর নেই। ব্রজর মায়ের কাছে তাদের বর্তমান অবস্থাটা সে জানে। মল্লিকা আরো একা হয়। তার মুখের রক্তিমতা নানান রূপ নেয়। একা হয় আরো। সেই একাকিত্বই তাকে একসময় ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। সে আনন্দর বাসায় যায়, ওরা ব্রজদের চেয়ে আরেকটু অবস্থাপন্ন। তবে তার আকাঙ্ক্ষার সেই আনন্দ এখন খুবই গার্হস্থ্য জীবন যাপন করছে। তার বউকে আনতে যাচ্ছে। খুবই সীমিত ভাবনার মানুষ সে। মল্লিকাকে নিয়ে ভাবনার এতটুকু ফুরসত যেন নেই তার। মল্লিকার সত্তায় ভাংচুর চলে। নিজেকে অসহ্য লাগে, সেখান থেকে বের হয়ে আসে সে। হঠাৎই দেখা হয়ে যায় শোভনাদির সঙ্গে। মল্লিকাকে নিয়ে বাসায় যায়। অন্যধরনের এক যৌনগন্ধ কেবলই বিস্তৃত হয়। জীবনের একেবারে ভিন্ন এক আমেজ আবারো মল্লিকা পায়। শোভনার ভেতর আছে একধরনের পুরুষালী আচরণ। মল্লিকার সত্তায় ভিন্নধরনের এক ভালোলাগার শিহরণ হয়। মনে হয়, প্রকৃত ভালোবাসাই সে পাচ্ছে। শোভনা তাকে মালা পরিয়ে দেয়। সমকামী যৌনতার এক জাগরণ রাখতে পারেন কমলকুমার।

একজন শিল্পী তাই পারেন — চলতি প্রথা, মুখস্থ ভালোলাগা বা জীবনবোধকে নতুনভাবে নাড়া দিতে পারেন। সেই কাজটিই গল্পকার অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে করলেন। ভালোবাসার নবতর, প্রথামুক্ত, স্বাধীন ধারণার গল্প আমরা আমাদের চেতনায় অনুভব করতে পারলাম। মনোজাগতিকতার এমনই আশ্চর্যসুন্দর শিল্পীত্ব আমরা টের পাই।

কমলকুমারের চিন্তাচৈতন্যে আছে রামকৃষ্ণবাসনা, বিশেষত তিনি নৃমুণ্ডমালিনী কালীভক্ত — তিনি যে নির্মিতির ভেতর থাকেন, ভালোবাসার প্রবহমানতা বজায় রাখেন, তা রামকৃষ্ণের দশাপ্রাপ্ত অবস্থারই একধরনের বিস্তার। ভাষার যে আভিজাত্য, একাকিত্ব, একটা প্রাতিষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে থাকার একটা ব্যাপার, নিজস্ব মৃন্ময়ী রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা তাঁর একধরনের সাধনা। সেই সাধনার তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাতে চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক মৃত্তিকায়, জলবায়ুতে, জনপদে একেবারে মিশে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার থাকে, যেখানে তার জাতহীন পাতহীন ঘরছাড়া প্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ করি। তা কিন্তু কমলকুমারের সবদিকে নেই। ধর্মের মৃন্ময়ী রূপ যেভাবে তাঁর লেখনীতে বিস্তৃত হয়েছে তাতে তাকে বৈষ্ণব ঘরানার প্রেমের সঙ্গে মেলানোর কোনো স্কোপও তৈরি হয় না। তিনি আলাদা যেমন হয়েছেন, তেমনি একাও হয়েছেন। এখানেই তাঁর সাধনার সীমাবদ্ধতা। তিনি ক্রমে ক্রমে লাল জুতোর সামাজিক চেনাজানা জগৎ ছেড়ে রাধার প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বিলীন হওয়ার ধারণা পোক্ত করলেন।

তবে তাঁর ভাষা কলোনিয়াল আবহ ছেড়ে একধরনের দ্রোহ তৈরি করেছে। ইংরেজ আসার আগের ভাষাটার চর্চা করেছেন বলে তার সম্পর্কে একধরনের অনির্দিষ্ট ধারণা বা চিন্তাভাবনা তাঁর আছে। আমার ধারণা মতে, ইংরেজ আসার আগে এদেশে বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেন পর্তুগিজ পাদরিগণ। তাঁরা বাংলা শব্দকোষ এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তখন সাধারণের ভেতর বাংলাচর্চা মানে দলিল-দস্তাবেজ, চিঠি লেখা, নথিপত্রের নানান কাজ ইত্যাদিই ছিল। বঙ্কিম একভাবে চর্চা করেছেন; বিদ্যাসাগর, রামমোহন, প্যারিচাঁদ মিত্ররা করেছেন আরেকভাবে। রবিঠাকুর তাঁর চর্চার ভেতর কলকাতার তথা ঠাকুরবাড়ির একটা প্রভাব তাঁর সাহিত্যচর্চায় রাখতে শুরু করেন। এতে কমলকুমারের ভাষাচর্চা করার জায়গাটা বের করা মুশকিল। আসলে তিনি গদ্যের সাধুরূপের ধরনটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের কাছ থেকে নিয়ে নিজস্ব এক ভাষাভিত্তিক জগৎ নির্মাণ করতে থাকেন। ভাষার অলংকারিত্ব তাঁর প্রিয় বিষয়। সাধু ভাষা, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য তাঁর ভাষাকে নতুন লাবণ্য দিয়েছে। কখনো-বা অন্বয়ীঅব্যয়যোগে ভাষাতে মিশনারি রূপটাকেই ব্যবহার করেছেন। তিনি কিছু পদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেন। যেমন, গুণবাচক বিশেষ্য, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, সাপেক্ষ ও আত্মবাচক সর্বনাম, হেতুবোধক অব্যয়, ক্রিয়া বিশেষণ-বাচক অব্যয় ইত্যাদি। তিনি কতিপয় বাক্যকে একটা বাক্যে ঠেসে- চেপে ধরার তাড়না বোধ করলেও সংযোজক অব্যয়কে প্রথাগতভাবে ব্যবহার করেননি। বরং অনন্বয়ী অব্যয়ের দিকে তাঁর নজর সবসময় বেশি ছিল। সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারেও তাঁর নিজস্ব ধরন আছে বলে ধারণা পোক্ত করা যায়।

তবে 'লাল জুতো'তে ভাষাচর্চার পর তিনি *আলালের ঘরের দুলালের* ভাষার যে লৌকিকতার ক্ষেত্র ছিল তা যদি বিস্তৃত বা চর্চা করতেন তিনি, তাহলে তিনি জনমুখীনতার চমৎকার একটা ক্ষেত্র বানাতে পারতেন। তিনি একাকিত্বের স্বাদ থেকে পাঠককে নবতর চেতনার দিশারি হতে পারতেন হয়ত। এমন একটা আচরণগত বিষয় তাঁর প্রথমদিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পগুলোতে ছিল। তবে যা হয়নি তা হয়ইনি — যা হচ্ছে তাতে তিনি বঙ্কিমের কলোনিয়াল ইমেজকে কাজে লাগাননি, একে ভেঙেছেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা। পরবর্তী সময়ে তিনি অনেকভাবেই গল্প লিখেছেন। গল্পে অনুষঙ্গ নিপুণভাবে ব্যবহার করলেন, ডিটেইলের ব্যাপারে দারুণ সিদ্ধহস্ত হতে থাকলেন। তাঁর ভাষার বিষয়ে তো আলাদা করে না বললেই নয়। তিনি নিজেই একটা সুস্পষ্ট ধারা তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই ভাষা ক্ষণে ক্ষণে বদলে গেছে। রঙের অপূর্ব কম্পোজিশন তাঁর গদ্যশৈলীতে দেদীপ্যমান। ধারাবাহিকভাবে এসব তাঁর একটা চলমান প্রক্রিয়াই ছিল। কিন্তু তাই বলে তার প্রথম দিকের লেখা গল্পগুলোকেও কি আলাদা করে চেনা যায় না? নিশ্চয়ই যায়।

কমলকুমার মজুমদারের প্রাথমিক পর্যায়ের ৪-৫টি গল্পকে বিবেচনা করলে, মানে সেটা যদি কমলকুমারের সামগ্রিক গল্পগাথার সঙ্গে তুলনা করে আলোচনা করা যায়, তবে তা নিতান্তই সাদামাটা মনে হয়। বিশেষ করে তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ে লেখা গল্পগুলোর ভেতর 'লাল জুতো', 'জল', 'তেইশ', 'মধু', 'মল্লিকা বাহার' ইত্যাদি পরবর্তী সময়ে তাঁর গল্পগুলোর সঙ্গে ঠিক মেলে না। দিনকে-দিন তাঁর ভাষাই শুধু জটিল থেকে জটিলতর হয়নি; বাক্য বদলে যায়, ডিটেইলের কাজ বহুকৌণিক হয়, সরল বাক্য ক্রমশ যৌগিক রূপ পেরিয়ে বাক্যের বহুস্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাক্য বিশেষণের বহুমাত্রিক ব্যবহার, তৎসম শব্দের বাহুল্য, বা সমন্বয় পদের বিস্তারই শুধু ঘটে না, মৌলিক কিন্তু স্বাধীন বাক্যকে ঘিরে অধীনস্থ বাক্যেরও বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ডিটেইলের কাজ করেন প্রচুর, রঙের এমন চমৎকার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা আর দেখেছেন বলে মনে হয় না। সংস্কৃতঘেঁষা প্রথাগত কাব্যশৈলীর পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি বাক্যরীতির দিকে তিনি ঝুঁকতে থাকেন। এভাবেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের আলাদা এক জগৎ তৈরি করতে পারেন। এমন এক গল্পকারের জটিলতাপূর্ব গল্পের ধরন নিয়ে কিছু কথা বলাই যেতে পারে। সেই মাত্রার কিছু গল্প — 'মতিলাল পাদরী', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'তাহাদের কথা', 'ফৌজ-ই-বন্দুক', 'কয়েদখানা', 'রুক্মিণীকুমার' নিয়ে কিছু আলোচনা করার তাড়না বোধ করছি। এর বড় কারণ কমলকুমারের লেখার ধরনের নানান পরিবর্তন দেখাই শুধু নয়, বরং লেখকের যে সমস্ত গল্প কথাসাহিত্যের চর্চায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, দাপট প্রভাব রাখতে পারছে, মূলত এই ছয়টি গল্পকেই সেই কাতারে রাখা যায়। আমরা ওইসব গল্পপাঠে ক্রমাগত রোমাঞ্চিত, হতচকিত, এমনকি মুগ্ধতার আবেশে জড়াতে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা, সাহিত্যচর্চায় প্রভাববিস্তারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব গল্পের একধরনের পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানানোই এই লেখার মৌলস্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'মতিলাল পাদরী' গল্পটির মতিলাল একজন পাদরি হলেও, কিংবা ব্যক্তিটি দৃশ্যত একক সত্তার অধিকারী হয়েও তার সত্তায় বহু মত, বহু পথ এসে মিশেছে। নানান পদের কাজ একটা চরিত্রেই ঘটে। তবে কমলকুমার তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। এবং তা ততটুকুই বজায় রাখেন যতটুকু রামকৃষ্ণ অনুমোদন করেন। ফলে একটি চরিত্র মূলত অনেক চরিত্র হলেও একটা দর্শনের কাছে মতিলাল নিজের শাসনভার অর্পণ করে যান। গল্পটির পাঠ-অভিজ্ঞতায় জটিলতার বিষয়টি সেইভাবে আসে না। বলা যায়, সাধারণ প্রবহমানতার ভেতর দিয়েই এর ভাষাশৈলী চালু থাকে। তবে এর নানান দিক আছে। লেখক তাঁর দর্শনের জায়গাটি পরবর্তীকালে কীভাবে বজায় রাখবেন তা এখানে অনেকটাই মজবুত হতে থাকে। তিনি যে ক্রমশ রামকৃষ্ণ-সৃজিত মানবতার দিকেই ঝুঁকছেন, তাতে মানবের ভেতর নারী-পুরুষের দ্বৈতভাব জাগ্রত থাকতে পারে, তাও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। তবে এটি মানবতার জয়গান গাওয়া আরো এক অপূর্ব ক্যানভাস বলেও ধারণা রাখা যায়। পাদরির এত বিশালত্ব, কাজের বহুরূপিতা, পাঠকের বোধে একধরনের মুগ্ধতাও ছড়াতে থাকে হয়ত। ঘটনাটি সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, তারই গির্জায় একজন অপরিচিত মহিলা আষাঢ় মাসের ঝড়-জলের ভেতর আশ্রয় নেয়। সে শুধু সন্তানপ্রসবের ব্যথা নিয়েই থাকে। মানুষ নানান বাজে কথা চালাচালি করে। আলোচনার প্রসঙ্গে এটাও চলে আসে, শত কথার ভেতরও একে ছাড়েন না পাদরি। মা-হারা শিশুপুত্রকে একসময় পিতৃস্নেহে দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয়ও দেন। একসময় এমনই তার বোধে আসে তিনি যেন আর খ্রিষ্টান নন।

তবে এ গল্পে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করতে পারেন কেউ কেউ। ফুলেল নামের খ্রিষ্টান ভক্তটি যেভাবে পাদরির সঙ্গে কথা বলে তাতে মনে হতে পারে পাদরি কি নিজেই রামকৃষ্ণের প্রতিভূ? তিনি কি সনাতন ধর্মীয় সাকার মতের পূজারি? নারী-পুরুষের মিলিত সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আবার গির্জায় বাচ্চা প্রসব হলে খ্রিষ্টান সমাজে এত নিন্দার কী থাকতে পারে! যিশুখ্রিষ্ট তো নিজেই গোয়ালঘরে জন্মেছিলেন। তাহলে জন্ম বিষয়ক দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে কী এমন হবে? আবার খ্রিষ্টান সমাজে মাতা মেরির সন্তানধারণের বিষয় নিয়ে তো মতভেদ আছে। তাহলে গল্পকারের ভাবনায় কোন ধরনের বোধ কাজ করেছিল? সবচেয়ে বড় কথা, এটি একটি পরিচ্ছন্ন মানবদরদি গল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফৌজি-ই-বন্দুক'-এর ভাষাভঙ্গি বদলেই শুধুই যায়নি; এখানেই কমলকুমারের শক্তি নতুন ধরন নিয়েছে। এ গল্পে ফৌজের জীবনের নানান অহংকার, সীমাবদ্ধতা, ভাবনার পরাধীনতা ইত্যাদি যেমন প্রকাশ পেয়েছে; একজন সৈনিকের জীবনসৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত পক্ষপাত, জীবনের জাদুময়তা যেন নবতর প্রাণশক্তিতে প্রবহমান হলো। ভাষার জাদুকরী ব্যবহার, ডিটেইলের অসাধারণ ধরন, স্বপ্নময়তার বিস্তারে গল্পসাহিত্যের এক জগৎ নির্মাণ করতে পারলেন তিনি। একটা চরিত্রকে যে এমন শিল্পিতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, অতি সাধারণভাবেই পাঠকের দৃষ্টিতে আনেন তিনি। একটা চিঠি আসে তার হাতে। কিন্তু তাতে গল্পকার তার লেখনীর অপার শক্তিই প্রকাশ করতে থাকেন। 'চাক্কু মারা' শব্দটি পাঠকের মনের জানালা একে একে খুলে দেয়। চিঠির বিষয় আর করতার সিংয়ের পোশাক-আশাকে আলোর হিল্লোল আনে। সে ঘরে ঢুকলে এক মহিলাকে দেখে আর তাতেই গল্পের কাহিনি আর ফৌজের ভাবনার শুদ্ধতা পাঠককে জানান তিনি। তারপর করতার সিংয়ের জীবনের মেয়েজনিত অনেক কথাবার্তা, ভাবনা, জীবনস্পৃহা একে একে জাগ্রত হতে থাকে। এখানে পুরুষের ভাবনাটাও কমলকুমার তাঁর মতো করে স্তিমিত মাত্রায় জাগরূক দেখান। করতার সিং আর দশটা ফৌজের মতো নিজেকে রাখতে চান না। রুক্মিণীকুমারের মতো এখানকার পুরুষকে সেভাবে দেখান না গল্পকার। এখানে রামকৃষ্ণের অনুসৃত সংস্কারময় অস্তিত্ব আসে। তিনি মাকে রাখেন সাকার পূজাময়ীর রূপে। পিতা নিরাকার ভাব-তরঙ্গের মানুষ। এখানে দার্শনিক ইয়ংয়ের লিবিডো পাঠক দেখে না। তিনি আসলে যা দেখাতে চান তা হচ্ছে রামকৃষ্ণের মাতৃমুখর মমতা। ফলে করতার সিং মেয়েটির মানবিক আর শারীরিক আকর্ষণের জগৎটি দেখতেই পায় না। এখানে যেন কমলকুমার তাঁর সেক্সুয়াল ভাবনাটাকে স্পষ্ট করতে চান। তাঁর প্রায় সব কথাশিল্পেই মেয়েরা অতি মাত্রায় সুন্দরী। কিন্তু শারীরিকভাবে খুব বেশি ক্রিয়াশূন্য। গল্পের শেষে দেখি সাহিত্যিক আশাবাদ ও পাঠকের কাছে তা পজেটিভ মনে হবে। নিপুণ মমতায় সবই তাঁর ধ্যানে বুনে যান তিনি। যুদ্ধের দিকসমূহ ভালোবাসার মুখরতায় নিমগ্ন হতে থাকে। এখানে যুদ্ধ নিয়ে যুদ্ধশীল শক্তিসমূহের মতলব হাসিল করার বাণিজ্যিক কাজের হিংস্রতার কোনো প্রভাব পড়ুক আর না-ই পড়ুক, তিনি এক সৌকর্যমণ্ডিত দায়িত্ববোধের ভেতর তাঁর গল্পটির ফিনিশিং দিতে পেরেছেন। তবে এ গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হচ্ছে, একজন ফৌজকে নিয়ে এমন মানবিক গল্প লেখা। ইতোপূর্বে এমন ধরনের গল্প লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। এখানে শব্দ, বাক্যের নবতর চৈতন্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি আলোর বিচিত্র বিকিরণ, নিজস্ব চেতনার অন্তঃপ্রবাহ নিয়ে আলাদা এক ঐশ্বর্যময় ভুবন নির্মাণ করতে পেরেছেন গল্পকার।

'নিম অন্নপূর্ণা' নামের গল্পটি ভাষাশৈলীর দিক থেকে এত শক্তিশালী না হলেও এ গল্পের ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে মানুষ শেষ পর্যন্ত অত-শত প্রতিকূলতার ভেতরও নিজেকে খাড়া করতে সচেষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষের এক তীব্র-কঠিন আয়োজন যেন। মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামও এ গল্পে নতুন মাত্রা নিয়ে পাঠকের মনোজগতে হাজির হয়। গল্পটির শুরুতেই দেখা যায়, যূথী টিয়া পাখির ছোলা চুরি করে খেয়ে নেয়। ওর হাতে পাখিটি জোরসে কামড় বসায়। ঝরঝর করে রক্ত ঝরে। তা নিয়ে মিত্তির বাড়িতে মিত্তিরের বউ এক লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে। তখন দারুণ অভাবের দিন, যুদ্ধের বছর। অসংখ্য জঙ্গি বিমান আকাশে উড়ে বেড়ায়। এর ভেতরই যূথীদের দুঃখ-যন্ত্রণার সংসার চলে। তার ভাবনায় জীবনবোধ বিচিত্র কায়দায় দেখা দেয়; যা সত্যি অপূর্ব। যূথীর চুরি করে টিয়ার খাবার খেয়ে ফেলা; এ নিয়ে খেতুর মার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা, প্রীতিলতার তার পরিবারের লোকজনসহ বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাওয়া, পুরুষত্বহীন ব্রজর রোজগারের চেষ্টা, গল্পের ভিক্ষুকরূপী বৃদ্ধের এ বয়সেও প্রীতিলতার প্রতি কামবোধ, বৃদ্ধকে দেখার প্রথম দিনই তার কেঁপে ওঠা; এভাবেই শব্দবন্ধের আলাদা জগৎ উন্মোচিত করতে থাকে। বৃদ্ধের গীতধ্বনি ঠোঁটস্থ-চোখস্থ করে প্রীতিলতা। এবং তার কাছ থেকে জোর করে চাল নিয়ে নেয়, ভিখারি বৃদ্ধ বাধা দিতে গেলে তাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু তার গলা থেকে দরদর করে ঝরে পড়া রক্ত পাছায় লেগে যায় বলে ধারণা করা যায়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায় সে। ওই রক্তের প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি গল্পটিতে আরেক মাত্রা যোগ করেন। ব্রজ এ রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, ঋতুস্রাবের দিকেই ইঙ্গিত করে প্রীতিলতা। তার স্বামী থ হয়ে যায়। এর সব কিছু বোধে নিয়েই বলা যায়, দুর্ভিক্ষের এমন ভয়াবহ এক চিত্র আঁকেন গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের লড়াইয়ের বাজারের অভাব সুস্থবোধকেও অচেনা করে ফেলে। বৃদ্ধের শরীরের রক্তকে গোপন রক্তের ইঙ্গিত দেওয়া এবং একেবারে শেষে বৃদ্ধের জন্য প্রীতিলতার কপট মন খারাপ করা; সবই চমৎকার শিল্পবোধ নিয়ে এসেছে গল্পে। গল্প যে নিপুণভাবে বুনে যাওয়ার বিষয় তাই আমাদের চৈতন্যে জাগ্রত থাকে।

'কয়েদখানা' গল্পটিতে বর্ণনা করা সেই কয়েদখানার দেখা মেলে অনেক পরে। এর আগে পাঠক প্রত্যক্ষ করবেন শাজাদ নামের রুনুখগাঁ-এর প্রজাকে। যার আছে আলম নামের এক চমৎকার আরবি ঘোড়া। তার জমাজমি থাকলেও ডাকাতি করাও ভিন্ন এক পেশা। দারুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগী সে। স্বাধীনতাপ্রিয়। জমির দাবিতে জমিদারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায়ও যায়। নতুন জমিদার একসময় তার কয়েক সঙ্গীসাথীসহ তাকে তার জমিদারিতে আটকে রাখে। একসময় শাজাদের ঘোড়া আলমকে নিষ্ঠুরভাবে জমিদারের লোক হত্যা করে। কিন্তু তারপরই শুরু হয় আরেক ভয়; ঘোড়া যেন ওর রক্তাক্ত অবয়ব নিয়ে বারবার ঘুরেফিরে আসে। শাজাদও ঘোড়াটির কথা ভুলতে পারে না। তার মনে জাগে প্রতিশোধস্পৃহা। জমিদারকে একসময় হত্যাও করে সে। তবু সেই ঘোড়ার দাপট যেন কমেই না। এমনি চমৎকার কিন্তু রোমাঞ্চকর এক জাদুময়তার ভেতর গল্পটির অবয়ব নির্মিত হয়। এর ভেতরই আছে প্রজাশোষণ, জমিদারির নিয়ম-নীতি, প্রজার মনোজাগতিক জটিলতা, নায়েব মশাইয়ের সীমাহীন প্রজা নিপীড়ন। গল্পটিতে প্রচুর পরিমাণে লোকায়ত উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষার সামাজিক রূপটি এখানে অনেক বেশি স্পষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, গল্প বলে যাওয়ার যে নিবিড় মনোযোগ আমরা দেখি, তাতে ক্ষণে ক্ষণে একজন কথার জাদুকরকেই যেন আমরা প্রত্যক্ষ করে যাই।

'তাহাদের কথা' গল্পটিতে গোটানো পারিবারিক এক গল্প বলার প্রবণতাই শুধু বড় বিষয় নয়, কিংবা এর বড়সড় আয়তনটিও সবচেয়ে উল্লেখের প্রাধান্য পায় না, এতে একটি স্বপ্নের ভেঙেচুরে যাওয়ার বিষয়টিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। জেলফেরত শিবনাথ যে সত্যিকার পাগল নয়, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি যার আছে রক্তলালিত পক্ষপাত, তা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। রাজনীতির সহযাত্রী বিপিন গুপ্তও তার এ পাগলত্ব নিয়ে তেমন শঙ্কিত বলে মনে হয় না। তার এ আপাত পাগলামি স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, ছেলে জ্যোতি আর মেয়ে অন্নপূর্ণাকেই কেবল বুকভাঙা যন্ত্রণায় ফেলে। পাগল বলে রাস্তাঘাটে মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা এমনকি মারপিটও খেতে হয় তাকে। একসময় জ্যোতি বাধ্য হয় তার বেতনের প্রথম মাইনেটা দিয়ে বাবার জন্য শিকল বানিয়ে আনতে। এ সময় শিবনাথের গাওয়া রামপ্রসাদী গান — যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি; যা পাঠকের বোধকে নাড়া দিতে পারে। তাকে বেঁধে রাখার জন্যই শিকল বানানো হয়। এবং তাকে জড়ানোর পদ্ধতি চলতে থাকে। গল্পের শেষদিকে জ্যোতিকে উদ্দেশ করে শিকল পরানো শিবনাথের কথাটি বড়ই হৃদয়স্পর্শী হয় — খুব ঠাণ্ডা রে খুব ঠাণ্ডা। এভাবেই প্রচুর আশাবাদী মানুষ সমাজের আলো-হাওয়া-জল নিয়ে যেন অঝোরে কাঁদতে বসে।

'রুক্মিণীকুমার' বাংলা গল্পভুবনের আরেক চমৎকার সৃষ্টি। কেন? একি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিঠাকুরের সেই নিরীহ কথা — ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার ট্রাডিশন ভাঙার জন্য? কিন্তু ছোটগল্পের এমন অকার্যকর কথাটি তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন। গল্পটিকে আলাদা করে দেখার কারণ হচ্ছে এর নতুন ডাইমেনশন। এর বহুমাত্রিক আচরণও চমৎকার। লোকায়ত ঢঙের নতুন বিহেভিয়ার বেশ উপভোগ্য। কমলকুমার নিজেকে নিজে ভেঙেচুরে অনবরত নব নব কৌশলে সাজিয়েছেন। তবে এটা হতে পারে অদ্ভুত অপ্রচলিত ভাষ্যশৈলীর জন্য অথবা বিষয়-আঙ্গিকেও এপিক ফর্ম আসতে পারে, তাই কমলকুমার বুঝিয়ে দিলেন! এ গল্প থেকেই তিনি বন্দনা ধরে কথামালা শুরু করে তাঁর গল্পের এ ধরনের আয়োজনটাও বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এ এমনই রাজনৈতিক আয়োজন যে একবারে শেষ দিকে অর্থাৎ কথিত বাজে মেয়ে লবঙ্গলতার সঙ্গে রুক্মিণীকুমার নামের চরিত্রটির পরিচয়, নিজেকে তছনছ করে দেওয়ার অঙ্গীকার, অস্পৃশ্য মেয়েকে এভাবে লাইমলাইটে আনা, এত শক্তি দিয়ে বিকশিত করার ক্ষমতাটুকুও যেন নিজে গুছিয়ে তবে তাকে এর ভাগীদার করলেন। গল্পের শুরুতেই আমরা এক রুক্মিণীকুমারকে পাই, যে আসলে অন্ধকারে যাওয়া-আসা করে। দিকসকল যার সুন্দর শরীরে বহুদিন হলো পথ হারিয়েছে। যে ছাদে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্নায়বিক কলকাতা দেখে। ও আসলে তৎকালীন রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে একজন স্বদেশি। সে ইংরেজদের ঘৃণা করে। একদা বিপ্লবী আর এখনকার বিশ্বাসহত্যাকারী উপেনকে হত্যা করবে সে। এ-দিকটি গল্পটিতে খুব সহজাত কায়দায় এসেছে। উপেনের বরাবর একটা চিঠি অনেকটা যেন কমলকুমারীয় অভিজাতমুখর অহংকার ছড়িয়ে পাঠককে একেবারে আমূল চমকে দেয়! তারও পরে তার দেখা হয় রমানন্দবাবুর সঙ্গে; যাকে মনে করা যেতে পারে বঙ্কিমের আনন্দমঠের সত্যানন্দর প্রতিচ্ছবি হিসেবে। যার একান্ত ইচ্ছে হলো সে হবে ধার্মিক-সন্ন্যাসী; যে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে দূরে থাকবে, গীতা পড়বে, বিদ্রোহীদের জীবনী পড়বে এবং যার আদর্শ হবে বিবেকানন্দ। কিন্তু রুক্মিণীকুমার এসবের ভেতর নিজেকে আটকে রাখেনি। পুলিশের ভয়ে একসময় সে পতিতা আর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত লবঙ্গলতার কাছে আশ্রয় নেয়। এবং সে জেনেশুনেই তার প্রেমেও পড়ে। একসময় সে রোগজীবাণু আক্রান্ত রক্ত-মাংসের মানবীর সঙ্গে অদ্ভুত ইনসেসচুয়াসও করে। এখানেই গল্পটিও যেন নতুন মাত্রার অবয়বযুক্ত মানবিক চেনাজগৎকেও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। অবশেষে গল্পলেখক ইচ্ছে করেই যেন তাকে সংকুচিত করে দেন। সে কখনো প্রকৃত বিপ্লবী তো হয়ই না, জৈবপ্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াটাই নিরাপদ মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। রুশ বিপ্লব কিংবা ফরাসি বিপ্লব দূরে থাক, সেই সময়ের সুভাষ বসুর আবহে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার ধরনও তাকে টানে না। কমলকুমার তাকে বন্দে মাতরমঘেঁষা ধর্মীয় জাতীয়তাময় খণ্ডিত বিপ্লবী করে রাখলেন। এতে অতি বিকশিত হওয়ার স্কোপ থেকে একটি চরিত্র যেন ছিটকে পড়ল। তবুও এখানে ব্যক্তিমুক্তির জীবনতৃষ্ণা কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়েছে। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে একে একটা আলাদা মর্যাদার ছোটগল্প হিসেবে স্থান দিতেই হয়। যথাযথ চর্চার অভাবেই হয়ত-বা বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদলে এটি তেমন অবদান পায়নি। এ ধাঁচের চেতনাপ্রবাহ, নিখুঁত ডিটেইলের কাজ, চরিত্র বিন্যাস, শব্দচয়ন, নতুন বাক্য গঠন; সবই ছোটগল্প ভুবনকে একেবারে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার মনে হয়।

'রুক্মিনীকুমার' নামের গল্পটি এখন নানাভাবেই আমার প্রিয় গল্পের তালিকায় আছে। সহজভাবে বললে, এর ভেতরে সহজ সৌন্দর্যের বিকাশ আছে, জৈবিক কথকতার মুক্তি আছে, অন্তর্গত এক বোধের নিপুণ ছায়া আছে, তাই গল্পটির প্রতি আমার আকর্ষণের বড় কারণ। রুক্মিণীকুমার একজন বিপ্লবী বলে গল্পে দ্বিধাময়তার ভেতর জানানো হয়। গল্পকারের এই জানানোর ওপর নিজেরই যেন আস্থা কম। তাই তো অচিরেই দেখি, এ জায়গা থেকে তিনি সরে আসছেন। রুক্মিনীকুমার মানুষের সহজ আকুতির প্রতি দায়বোধ প্রকাশ করেন। তিনি যেভাবে কলকাতাকে দেখেন, মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, লবঙ্গলতা নামের এক কুষ্ঠ রোগীর কাছে নিজেকে একধরনের বন্ধনে আবদ্ধ করার ইঙ্গিত দেন, তাতেই চরিত্রটি আমাদের নিকট একটা সহজ প্রকাশের জৈবিক সত্তা হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু সন্ত্রাসী আন্দোলন তাকে দুনিয়ায় থাকতে দেয় না। কলকাতা শহরেই তিনি গুলি খেয়ে মরেন।

এ গল্প ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটা ধারাকে স্মরণ করায়। অনুশীলন সমিতি আর যুগান্তর নামের যেই সংগঠনসমূহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে ওঠে, এ চরিত্র তারই এক অংশ। কিন্তু তাদের নিজেদের ভেতরই দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। রুক্মিণীকুমার এ থেকে মুক্ত হতে চান। লবঙ্গলতা নামের এক দেহজীবীর কাছে তিনি আশ্রয় নেন। দেহজীবী আর তার ভেতর একধরনের জৈবিক লেনদেন যেন হয়। লবঙ্গলতা সন্তান চায়, ভালোবাসা চায়। রুক্মিনীকুমারের সঙ্গে সহজ-সুন্দর ধরনের সেই সম্পর্কের ইঙ্গিত আমরা দেখি। কিন্তু সদা সন্ত্রস্ত এই সশস্ত্র বিপ্লবী একসময় বন্দুকের গুলিতেই জীবন হারায়।

এ গল্পের ভাষা একধরনের কাব্যময়তার দিকে মোড় নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যশৈলী আর যতিচিহ্নের ব্যবহারও নবতর এক ধারার দিকে মোড় দেয়। একটানে তাঁর গদ্য আর পড়া যায় না। তাঁর গল্পপাঠের মধ্য দিয়েও লেখককে বোঝা যায়, তিনি কত খুঁটে খুঁটে কাজ করতেন তা জানা যায়। শিল্পের মুক্তি কী জিনিস বা তা কেমন হওয়া দরকার, এ তারই এক পাঠশালা এখানে আছে। তাঁর লেখায় লৌকিকতাকে বরাবরই খুব মান্যতার পর্যায়ে রাখা হয়। উত্তর-উপনিবেশকালে উপনিবেশের ভাষাকে তছনছ করার সহজাত তবে পরিশ্রমমুখর চেষ্টা তাঁর আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকৃত ভাষার ভদ্রলোকিত্ব বা জৈবিকত্বের বাইরে আলাদা একটা ভাষার দিকে তিনি ক্রমশ এগুচ্ছেন। শিল্পের মুক্তির এক ইশারা আমরা পাচ্ছি। কথা তো এক ইশারাই বটে!

কমলকুমার যে সামাজিক চৈতন্য, সত্যনিষ্ঠতা, সত্তা নির্মাণ করতে চেয়েছেন তা নির্দিষ্ট কোনো অবয়বে আটকা পড়েনি। একধরনের পরিবর্তনশীলতার ভেতরই তা প্রবাহিত হয়েছে। তিনি যে চিন্তার পর্যায় নির্মাণ করতে থাকলেন, তাও আগেভাগে বলে দেওয়া মুশকিল যে তিনি আসলে ঠিক কী ধরনের পরিবর্তনটা করতে চাচ্ছেন। কারণ হচ্ছে, তাঁর লেখা গল্প 'তেইশ', 'মল্লিকা বাহার' বা 'কয়েদখানা'য় যে ব্যক্তির তেজোদীপ্যতা দেখি, যৌথ-চৈতন্যের চাপ অনুভব করি, তা কিন্তু তাঁর 'মতিলাল পাদরী' কিংবা 'রুক্মিণীকুমার'-এ দেখি না। তিনি চিন্তার প্রবহমানতায়, শব্দের নান্দনিকতা নির্মাণে ঐতিহ্যের অনুগামী হয়েছেন। ভক্তিমার্গকে লালন-পালনের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছেন। বলা যায়, তিনি ভাববাদী আচরণের গ্যাঁড়াকল ডিঙাতে পারেননি বা চাননি। ফলে তাঁর কথাশিল্প ভাষার রূপান্তর অনেক দেখি, একবারে ভেঙেচুরে দেওয়ার স্পৃহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু অবশেষে তা ভক্তির বন্দনে সমর্পণের ব্যাকুলতাকে তিনি বাদ দিতে পারেন না। কমলকুমারের কথাশিল্প আলোচনায় তাঁর ভাষার স্বরূপ নিয়ে কথা বলাটাও খুবই দরকারি একটা কাজ। তাঁর কথাশিল্পচর্চার কালে তিন ধরনের ভাষাবৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি — ১. রবিঠাকুর-শরৎ-তারাশঙ্কর-মানিক-সুবোধ কর্তৃক ব্যবহৃত দেশজ সংস্কৃতি কখনো-বা কলোনিয়ালঘেঁষা প্রথাগত ভাষা। ২. বঙ্কিম কর্তৃক প্রয়োগকৃত তৎসমঘেঁষা কলোনিয়াল ভাবধারার গদ্য। ৩. *আলালের ঘরের দুলালে* ব্যবহৃত দেশজ আবহে নির্মিত ভাষা। কিন্তু কমলকুমার তাঁর ভাষাশৈলীতে উপরোক্ত কোনো ধরনেই স্থিত থাকেননি। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যচর্চার শুরুতে প্রথাগত ভাষার রূপটি গ্রহণ করলেও অচিরেই তিনি নিজস্ব একটা ভাষাকে ক্রমাগত নির্মাণ করতে থাকেন। তিনি নিজেই নিজের সেই রূপটি ভাংচুরও করতে থাকেন। একধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশাপ্রাপ্ত অবস্থার ভেতরই যেন একটা জটিল ভাষারূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষা সমীপে কদাচিৎ দ্বারস্থ হলেও নিজ তাড়নায় ক্রমশ তাও অতিক্রম করতে থাকেন। এভাবেই আমরা কমলকুমারের আলাদা এক প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাগত রূপ দেখি।

এখানে এই কথাটিও দ্বিধামুক্তভাবেই বলা যায়, 'লাল জুতো', 'তেইশ' ইত্যাদিতে যে ভাষাবৈশিষ্ট্য ছিল তাই উল্লিখিত গল্পসমূহে ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। বিশেষ করে 'ফৌজি-ই-বন্দুক', 'কয়েদখানা', 'রুক্মিণীকুমার'-এ কমলকুমারীয় ভাষার দাপট আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'মল্লিকা বাহার', 'লাল জুতো' ইত্যাদি গল্পে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা আপন তৃষ্ণায় বিরাজমান থাকে। কোনো ধরনের দর্শন দ্বারা তা সরাসরি জড়িত হয় না। কিন্তু 'মতিলাল পাদরী', 'রুক্মিণীকুমার' ইত্যাদি গল্পে পাঠক লক্ষ করবেন রামকৃষ্ণ কর্তৃক যেন মূল চরিত্রসমূহ সরাসরি নিজেদের সাজাতে থাকে। স্বাধীন জৈবসত্তা ক্রমশ মানবের রূপান্তরবাদী সত্তায় লীন হয়ে যাচ্ছে। বহুমত বহুপথ তাদের যাত্রাপথে মিশে যাচ্ছে, এমনকি নারী-পুরুষের মিলিত সত্তার বিস্তার লক্ষ করা যায়। বাক্য জটিল হচ্ছে, তৎসম শব্দের আধিক্য, বিশেষণের প্রয়োগ, সমন্বয় পদও বাড়ছে। রঙের সজীব আনাগোনা তাঁর ভাষাকে আলাদা মর্যাদা দিচ্ছে। এ গল্পকার ক্রমশ নিজ-বলয়ের প্রতিষ্ঠান হয়ে যাচ্ছেন।

তিনি শুধু তাঁর ভাষাশৈলীর জন্যই নিজের অবস্থানটি পাকাপোক্ত করতে পারেননি; পরিবার বা সমাজ বা তার অন্তর্গত মানুষ-প্রতিবেশের চালচিত্র কত নিপুণভাবে আঁকা যায় তার প্রচুর প্রমাণাদি পাওয়া যায়। তাঁর 'খেলার বিচার' নামের গল্পটির কথা বা 'তাহাদের কথা'ও বলা যায়; এমন পারিবারিক-সামাজিক বাস্তবতার গল্প খুব বেশি আমাদের চোখে পড়ে না। 'খেলার বিচার'-এর গল্প বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। আর তিনি এখানে কোথাও ট্রাডিশনাল গল্পও বলেননি। ভাষার অন্যধরনের কারুকাজের মতো তাঁর গল্প বিস্তারের ধরনও একেবারে স্বতন্ত্র। এখানে দেখা যায় একটা অতিশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার ব্রাহ্মণদের জন্য আয়োজিত শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যায়। সেখানে যাওয়ার আগেই জ্বরে আক্রান্ত ব্রাহ্মণগিন্নি বারবার বলে দেয় নিজেদের মান-সম্মান বজায় রেখে, দারিদ্র্য এতটুকু প্রকাশ না করে ভদ্রতা বজায় রেখে খাওয়ার কাজটুকু শেষ করার জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ খাওয়ার ব্যাপারে তার হিসাব রাখতে পারে না। অন্ন শুধু নয়, কৈ মাছ, চিংড়ির মালাইকারি আর রুই খায় ইচ্ছামতো; আর তাতেই ব্রাহ্মণ তার পাতের পাশেই অতিভোজনে ভূতলে পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতেই অন্য ব্রাহ্মণগণ আর সেই বাড়ির লোকগুলো কৌশলে বিচিত্র সব মন্তব্য করে। তাতে সবচেয়ে মর্মপীড়ায় ভোগে তারই ছেলেটি। পড়াশোনায় অতি মেধাবী এ ছেলে বাবার এমন ভোজন এক্কেবারেই সহ্য করতে পারে না। এমনকি সে বাড়িতে ফেরার সময়ও একসঙ্গে আসে না; আগে আগে থাকে তার বাবা আর ছোট বোন থেকে। এখানে সামাজিক বিষয়, জমিদারিত্বের কথাবার্তা, ১৯৩০ সালের দিকে স্বাধীনতার বিষয়-আশয়, জীবন-আচার চমৎকার রস-মাধুর্যের ভেতর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে মজার বিষয়টি হয় এ ব্রাহ্মণ-স্ত্রীটি রাতে পরম যত্নে তার স্বামীকে পোঁটলায় করে আনা সন্দেশ খাওয়ায়। এখানে একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের ম্রিয়মাণ আভিজাত্য, টানাপড়েন, বন্ধন, বেঁচে থাকার নিজস্ব স্টাইল অতি সরস ভঙ্গিমায় কমলকুমার ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা তাঁকে শুধুমাত্র ভাষার জাদুকর বা আভিজাত্যময় হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধরনের সাইনবোর্ড সেঁটে দিতে চান, তারা এতসব সরস আর বাস্তবধর্মী লেখার ব্যাপারে কোনো সুবিচার করেন বলে মনে হয় না। বড় আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর দায়িত্ববোধ আর মানবিক চর্চার অদ্ভুত নতুন কৌশল দেখা যায়।

তাঁর সৃজিত বাগান শিরোনামধারী গল্প আছে তিনটি। এখানে তাঁর বিকাশ আর কাজের বিচিত্র রূপে পাঠককে অবাক না করে পারবেই না। গল্পত্রয় হচ্ছে — 'বাগান পরিধি', 'বাগান কেয়ারি' আর 'বাগান দৈববাণী'। তিনটি জায়গায় তিনি তিন রকমে পাঠকের সামনে তাঁর নিজস্ব মতই পাঠককে নিজের মন-বুদ্ধি পথে চালনা করতে থাকবেন, ততই বুঝবেন তাঁর লেখার স্টাইল, কৌশল, বিহ্বলতার নিখুঁত ভঙ্গি কত ঝাঁঝালো, একরোখা আর অচেনা। কত বিচিত্র তাঁর দেখানোর ভঙ্গি! শুধু ভাষার জটিলতার দোষ দিয়ে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বিশালতা যে, কারো কারো হয়ত এ ধরনটিকে পরখ করতেই ভয় লাগবে। প্রথম গল্পে মহিলাটি ছবি দেখেন, পাঠককেও তিনি যেন সেই ছবি দেখার অংশ করে ফেলেন। তারপরই পাঠককে দেখান ঘুমন্ত নাপিতিনি আর ঝিকে। এ যেন চলমান ক্যামেরার অংশ করেন পাঠককে। তারপরও দেখা যায় অনৈসর্গিক পিপাসাকাতর যুবককে। তারপর দেখা যায় রমণীর অনুভববোধ। এ যেন রাধা ভাবেরই আরেক রূপ। রমণীর এমন দেখার ধারা বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। এ নারীকে রাধার ঢঙে একসময় স্বাধীন করেন যেন, থিয়েটার দেখার বিষয় আছে। স্বদেশি জমানা চেনানোর আলাদা কায়দাও পাঠককে দেখান তিনি। শব্দের পর শব্দের এত জাদুকরী বুনন সত্যি অসাধারণ। তবে এ গল্পে তা স্পষ্ট করেন তিনি। কথাসাহিত্যচর্চার একটা জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের নামটি পাঠক পেয়ে থাকবেন। এটা খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে তিনি কেন ভাবনার বাইরে রাখলেন। এটা কি স্বপ্রণোদিত? তিনি কেনই-বা কায়মনোবাক্যে নৃমুণ্ডমালিনী মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেলেন! ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলেই কি রবীন্দ্রনাথ বাদ পড়লেন? দ্বাদশ শতকে চৈতন্য মহাপ্রভু যে কাজটি করলেন তা কি শ্রীরামকৃষ্ণ করতে পেরেছিলেন? অবশ্য দুজনের কাজের ধারার ভেতর বিস্তর ব্যবধান। চৈতন্যদেব শুধু মানবপ্রেমের লোকায়ত নবযৌবনের ধারায় এ অঞ্চলকে সিক্ত করেননি, আর এটিকে অর্থাৎ সহজিয়া বৈষ্ণব রীতিকেই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ বলে ধরা যাবে না। তাঁর বড় কাজটি আসলে জাতপাতের জটিল জালে আটকে থাকা সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা; কারণ তখন এ উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মান্তরের একটা বেগবান জোয়ার আসে; সেটা হতে পারে ইসলামের আপাত সাম্যবাদী আচরণের জন্য অথবা সুফি সাধকদের নির্লোভ মানবিক কাজকামের জন্য কিংবা জাতপাতের শৃঙ্খলবদ্ধ হিন্দুধর্ম থেকে বাঁচার কিংবা মুসলমান শাসকদের আওতায় পড়ে দলে দলে নিম্নবর্গের হিন্দুগণ মুসলমান হওয়া শুরু করে। তখনই চৈতন্যদেবের প্রবল উত্থান। তিনিই প্রথম জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে শুধু কৃষ্ণ সাধনায় মুক্তি বলে তাঁর ধর্মীয় সংস্কারমূলক ধারার বহমানতা আনেন। তাহলে আঠারো শতকে রামকৃষ্ণের কাজের ধারায় কি তেমন কোনো ইঙ্গিত ছিল? এমন কোনো জটিল ব্যাপার (দ্বাদশ শতকের মতো) তখন দেখা না গেলেও খ্রিষ্টীয় শাসনব্যবস্থার ধর্মীয় প্রভাবের চিন্তাভাবনা তো ছিলই। যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় ধারা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাঁর কাছে সব ধারার লোকজন; সনাতন হিন্দু, তান্ত্রিক সাধু, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব, নাগা সন্ন্যাসী, খ্রিষ্টীয় আচারে বিশ্বাসী এমনকি মুসলমানদের কেউ কেউ এলেও ব্রাহ্মসমাজের তেমন কেউ এসেছেন বলে তেমন দেখা যায় না। আমরা আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করি রবিঠাকুরের চিন্ময়রূপী ব্রহ্মের কোনো ছায়া কমলকুমারে দেখা যায় না। শিল্পসাহিত্যের কথা চিন্তা করা যায়। অথচ কমলকুমারের মতো অতি সচেতন লেখকও তাই করেছেন। এর কারণও সেই রামকৃষ্ণের ভক্তদের ভক্তির পরিধিতেই পাওয়া যায়। তাঁর ভক্তবৃন্দ মিলে যে রামকৃষ্ণের রূপটি সামাজিকভাবে দাঁড় করায় তাতে আর যা-ই থাক চিন্ময়রূপী ঈশ্বরহীন কলকাতার বিপরীতে আধিপত্যবাদী শ্রেণিটির সনাতন ধর্মের সাকার চেতনার সম্মিলিত প্রয়াসেরই নাম।

'প্রিন্সেস' তাঁর প্রথমদিকে লেখা গল্পই মনে হয়। তখনো তিনি তাঁর দর্শন ঠিক করেন নাই, ভাষা ঠিক করেন নাই, এমনকি গল্পের ওপর তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্ট্রোলও পাকাপোক্ত হয়নি। তিনি যে বহুঘাটের জল খাওয়া শুরু করেছেন তা মানতে হয়। সময় তখন ব্যক্তিজাগরণের, পুঁজির মুক্তআবহে মধ্যবিত্ত তার মেজাজে উঠে আসছে। কমিউনিস্টরা তাদের পথ খুঁজে নিচ্ছে। ইংরেজরা তখনো জাঁদরেল শাসক হয়ে আমাদের পেষণ করছে। এ গল্প তখনকার। এখানে এক বাঙালি ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে উঠে বসেছে। টিকিটও তার আছে। কিন্তু স্টেটের প্রিন্‌সেসও একই কামরায় বসেছেন বা বসতে বাধ্য হয়েছেন। এ দুজনের কথা হয়, পরিচয় হয়। প্রিন্‌সেস তার সহযাত্রী কমিউনিস্ট শুনেই দূরত্ব তৈরি করতে চান। কিন্তু তা হয় না, কারণ তার ব্যবহার, সেন্স, জ্ঞান প্রিন্‌সেসকে মুগ্ধ করে। তারা কথার ভেতর পড়তে পড়তে মায়ায় পড়ে যায়। তারা পরস্পরকে ভালোবাসতে শুরু করে। একসময় ট্রেন প্রিন্‌সেসের থামার জায়গায় আসে। কিন্তু ট্রেন থামলেও তারা স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিতে পারে না। পুলিশ এসে কমিউনিস্ট দেবকুমারকে টেররিস্ট হিসেবে গ্রেফতার করে ফেলে। প্রিন্‌সেসও চলে যায়, কিন্তু তাদের মন যেন বান্ধা পড়ে যায়। গল্পটির ভাষা বেশ জমজমাট, একেবারে কাব্যের শরীরঘেঁষে চলে যাচ্ছে। দুজনের ভেতর প্রাণের উচ্ছ্বাস আছে। একেবারে জমে থাকার ব্যাপারটি বেশ সাহিত্যপনায় ভরপুর। নতুবা এত কম সময়ে দুজনের অত তাজা প্রেম হয় কী করে? দুজন তো একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ! তবে প্রিন্‌সেস বেশ ক্রিয়েটিভ, বাংলার প্রতি তার টান আছে। কমলকুমার নিজেও যেন তখন কমিউনিজমে খানিক ঝুঁকে ছিলেন।

জাতপাতকে আরেক প্রশস্ততায় দেখার নাম 'বাবু' নামের গল্পটি। এখানে মদ নামের পানীয় বড় ভূমিকা রাখে। নানা বর্ণের হিন্দু, মুসলিম, জমিদার, প্রজা, দেওয়ানহুজুর মিলে আলাদা এক জগৎ তৈরি করেছে। মদের মায়ায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উঁচু-নীচু রীতিমতো এক ঘাটে জল খায়। একসময় রাজা প্রজা হয়, প্রজা রাজা হয়। তবে এখানে সমপ্রেম আছে। পুরুষে পুরুষে প্রাণান্ত ভালোবাসায় দীর্ঘসময় সুখে-দুঃখে এক ছাদে থাকার বিষয় আছে। ভাষার মান্যতা, প্রভাব, অর্ধতদ্ভবের খবরদারি এ গল্পে আছে। গল্পটির পাঠস্বাদুতা অনেক মোহনীয়।

'প্রেম' নামের গল্পটি তাঁর একেবারে প্রথম দিককার গল্প মনে হয়। তখনো তিনি প্যাঁচগোছের কমলকুমার হয়ে ওঠেননি। প্রেমের ভাষা এবং জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে অতি সহজ ধরনে দেখলেন। সীতেশ অনিতাকে ভালোবাসে, তাকে গভীরভাবে পেতে চায়। তখনো আমরা চিঠির যুগেই ছিলাম, সে তাঁর ভালোবাসার কথা চিঠি দিয়েই জানাতে চায়। পড়ানোর ছল করে বারবার তার কাছে যায় সে। সে চিঠি দিতে চায়। তা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয় না। বইয়ের ভাঁজে তা থাকে। সেই চিঠি কী করে যেন অনিতার বাপ-মায়ের হাতে পড়ে যায়। তাতেই ভালোবাসাপ্রত্যাশী অতি নিরীহ মানুষটার ওপর চলে শারীরিক নির্যাতন।

'আমোদ বোষ্টুমি' এমন এক গল্প যা দিয়ে কমলকুমারের নানান স্তরকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। তিনি যে কেবল রামকৃষ্ণতেই মজে ছিলেন তা তো নয়। চৈতন্য মহাদেব, বৈষ্ণব জীবনলীলাও তাঁর ছিল। এ গল্পের আমোদ বৈষ্ণব ঘরানার মানুষ। তার মাও অপরের বাড়িতে খেটেচেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছে। একসময় তার জীবনাবসান হয়। তার মেয়ে আমোদ নিজের বাড়ির মতোই কাজ করে, আব্দার রাখে। গিন্নিমাও তার কাজের স্বার্থে তাকে বাড়ির লোক বলেই দেখাতে চায়। বাড়ির ছেলে গিরিচাঁদের প্রতি আমোদের ভালোবাসার কমতি নেই। যেন তাকে সে নিজের মানুষই মনে করে। তাকে নিয়ে আমোদিনী স্বপ্নের এক জগৎ বানায়। কিন্তু সেই ছেলের বিয়ে ঠিক হওয়ার নানান লক্ষণ দেখা দিলে আমোদের স্বপ্নের জগৎ তছনছ হতে থাকে। গোরাচাঁদের ব্যবহারেও সে চরম আঘাত পায়। এসবের ভেতর দিয়ে বিয়ের কাজ তো এগোয়। আমোদিনী নিজেকে অসহায় দেখে। একধরনের ভিক্ষালীলার দিকে সে ঝুঁকতে থাকে। এ চরিত্র যেন তারাশঙ্করের রাইকমলের এক্সটেনশন। আমোদও একসময় গিন্নিমার বাড়ি ছাড়ে। নিজের রক্তকে ঘোলা করে সে একধরনের নৈতিকতা দেখে। তার জীবন একেবারে ভেতর থেকেই বদলে যায়। ঘরের বার হয় সে, নামসংকীর্তন করে সে ভিক্ষা করবে।

তার কণ্ঠে শোনা যায় —

রাই জাগো রাই জাগো — কত নিদ্রা যাবে
ওগো কালোমানিকের কোলে...

তার গীতে আকাশ যেন লাল হয়ে ওঠে। আমরা এক আমোদকে দেখি। আমরা ক্রমশ বহু রঙের কমলকুমারে মগ্ন হই। এটিকে ভিন্ন ট্র্যাকের গল্প বলা যেতে পারে। রামকৃষ্ণ বা রামপ্রসাদের কোনো ছায়া বা মায়া তাতে নেই। ১৯৮৮ খ্রি. প্রকাশিত হলেও 'আমোদ বোষ্টুমি' তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিককার লেখা। কারণ ভাষাসৌকর্যের যে নমুনা, এর ভাবনার গতিধারা বলে দেয় এটির সৃষ্টিকাল। 'আমোদ বোষ্টুমি'কে সহজেই তারাশঙ্কর বা অমিয়ভূষণের রচনা বলে ধরা যেতে পারে। ঝিয়ের মেয়ে একবারে বাড়ির মেয়ের মতোই গিন্নি-মার আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ ভুল বোঝাবুঝিও হয়। আবার তার এ বাড়িরই গোরাচাঁদের সঙ্গে প্রেম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আবার পড়তে পড়তে অন্ধও হয়। এতে সুবিধাই হলো, নিরাপদে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বোষ্টুমির চেহারায় বেরিয়ে পড়তে সুবিধাই হয়। গল্পের নামকরণ সার্থক করে তবে গল্পের ফিনিশিং দেওয়া হয়।

'বাগান কেয়ারি' প্রকৃতির এক গল্প, বেওয়ারিশ লাশের গল্প, দেশভাগের গল্প, মানুষের বেহুদা হা-হুতাশের গল্প হতে পারে তা। অনেক কিছুই হতে পারে। আবার সব মিলিয়ে যেন কিছুই হতে পারে না। বড়লোক আর ছোটলোকের দ্বন্দ্বের গল্পও বলা যায় একে। অথবা এককথায় রামকৃষ্ণজির প্রকৃতির প্রতি মায়া, তার থেকে আলোবিচ্ছুরণ বা লোকজীবনের একটা ছায়ার গল্প হতে পারে। ঘটনা হচ্ছে, একটা লাশ পড়ে আছে একটা নগরপত্তনের জায়গায়। কন্ট্রাক্টর কাজ করাচ্ছে। সেই জায়গায় লাশ পড়লে অনেক কথা, কে তার মালিক। নানান কর্তৃপক্ষ নানান পক্ষ নেয়। নিজেদের গা বাঁচানোর চেষ্টা করে তারা। মানুষের কথার শেষ নেই। মা-বাপহীন ওই কথা। কোথাও এ লাশের নাম পাওয়া যায় না। দেশ নাই, ঠিকানা নাই, আত্মীয়কুল নাই। কাজেই যুদ্ধের সময়ের এ লাশ তো দুশমনেরই? কোন দুশমন? দেশহীন মানুষ সে, কাজেই যুদ্ধের বাজারে সে তো শত্রুপক্ষেরই লোক? কাজেই তাকে সরানোর কথা চলে। মানুষ থেকে, লাশ থেকে সে বিযুক্ত হয়ে দুশমন হয়ে যায়। কিন্তু এখানেও মানুষ আছে। তারা সাধারণ মানুষ, অতি দীনহীন মানুষ। তারা একে সৎকার করতে চায়। লাশ তারা নেবে। বর্ষার গীতের ভেতর দিয়ে এ লাশ সৎকার হবে, প্রকৃতির সন্তান হবে সে। এ যেন কলির এক দেবদূত এখানে নেমে আসে। সেই দেবদূত আমরা চিনি না; হয়ত চিনি, সে হয়ত প্রকৃতির ভেতর দিয়েই আসে, যার লেখাপড়া নাই। কেবল আলো দিয়ে, প্রেম দিয়ে, লোকসাধনা দিয়ে মানুষকে ভালোবাসে। সেই প্রভুর ইঙ্গিত এখানে আছে। গল্পের আবহ থেকে, ভাবসাধনা থেকে তাকে আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণই বলতে পারি। এ গল্প একালের, এ গল্প অতি দায়িত্বপনার। এ গল্প মানুষকে ভালোবাসার। এর গদ্য এত কাব্যিক যে পড়তে পড়তে আলাদা এক মোহের ভেতর পড়তে হয়।

রূপদর্শনের বিচিত্র কলাকৌশল এ গল্পে বেশ চমৎকারভাবেই ঠাঁই পেয়েছে। তবে এটা তাঁর একধরনের দুর্বলতা বলেও ধরা যায় যে, তাঁর লেখায় পরিবেশ-প্রতিবেশ আঁকতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাচারকে খুব বেশি আত্মস্থ করে ফেলেন এবং পাঠককে তাঁর নিত্যসহচর ভাবেন। এখানে নিজস্ব একান্ত ভাবনাচিন্তা থেকেও কখনো পাঠককে বিযুক্ত করতে পারেননি। এখানেই বোধ হয় তিনি চৈতন্যে খানিকটা সংকুচিত হয়ে পড়েন। পাঠককেও ধাঁধায় ফেলেন অনবরত। এক অসাধারণ প্রতিভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন সতত। এ গল্পের রমণীর মুখদর্শন, তারই অঙ্গে ভেদ সৃষ্টি, কুহকী মায়ার আচ্ছাদনে পাঠকের মায়ার জগতে হতচকিত ভাবটি স্থাপন করেন। একধরনের লোকায়ত ভাবচক্করও পাঠকের বিচলিত ভাবনায় প্রশ্রয় নিতে পারে। এতে লেখকের শক্তি যেমন প্রকাশ পায় তেমনি পাঠকের মুক্তবোধকে ঝামেলায় ফেলে। এভাবেই কমলকুমার তাঁর নিজস্ব তেজোদীপ্ত অবস্থানটিও পাকাপোক্ত করেন। এ আরেক নতুন দিগন্ত, যার একচ্ছত্র আধিপত্য কেবলই তাঁর।

'পিঙ্গলাবৎ' তার সবচেয়ে ছোট আয়তনের গল্প। তবে এতে এক রমণী অর্থাৎ আঙুরীর চিঠির অপেক্ষা অতি রোমান্টিকভাবে এঁকেছেন তিনি। শরীর আর মনে যেন সেই অপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করে। এখানে নারীর অসহায়তা যেন বহু পুরনো, বা আজীবনের হাহাকার হয়ে ধরা দেয়। বিশেষ করে বিরাজী নামের চরিত্রকে নারীর সেই ভাবনাকে আরো জীবন্ত করে। 'দ্বাদশ মৃত্তিকা' নামের গল্পে কল্লোলযুগের কলকাতা আর লোকায়ত ভাবনাকে ধরে রেখেছেন। নতুন অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নগর কলকাতার বাবুয়ানি ঢংকে মিঃ নামের অচিন কায়দার চরিত্র বর্ণনা করেছেন। কলকাতায় প্রকৃতি মরে যাচ্ছে, মানুষের ভেতর সাজানো-মেকি একধরনের সংস্কৃতি দ্রুত তাতে প্রভাব ফেলছে। মৌমাছির রানী, ড্রন, তাদের রক্তাক্ত নৃত্য এসেছে মোহনীয় প্রতীক হিসেবে। কৃষ্ণকান্তের উইলের সীতা দেবীর ভালোবাসায় নয়, প্রমিতবাবু, মণীন্দ্রবাবু, আশালতা সিংহ, বুদ্ধদেব, অচিন্ত আর *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ* বা *বিচিত্রতার* কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন।

'খেলার দৃশ্যাবলী' গল্পও তাঁর অনেক গল্পের মতোই মাধবা আর ব্রহ্মময়ী মা (জয় রামকৃষ্ণ এখানে নেই) দিয়েই শুরু করেছেন। এ জেল থেকে মুক্তির গল্প। এখানেও মুক্তির স্বাদ পঞ্চভূতের শরীরেই মিশে যায় যেন। প্রকৃতির লীলাখেলাও এখানে, এ শরীরে, অপার রূপ নেয়। মাটির গন্ধে যেখানে বেশ্যার শাস্ত্রমতেও পুণ্য থাকে। মানুষের অস্তিত্ববাদী চেতনার মুক্তিই যেন তিনি প্রার্থনা করেন। কমলকুমার নিজস্ব চেতনাপ্রবাহ নিয়ে গল্পের শরীর সাজাতে থাকেন। তিনি তাঁর দেহতাত্ত্বিক বোধে কখনো মরদের রূপ নির্ণয় করেন। তবে এখানে তাঁর লেখনীর স্বকল্পিত স্টাইল একবারে দুর্বোধ্যতায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'কঙ্কাল এলইজি', 'দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'কশ্চিত জীবন চরিত', 'তিনটি খসড়া' ইত্যাদিতে ভাষার দুর্বোধ্যতার চরমে পৌঁছেছেন তিনি। পাঠকের এত ভোগান্তি আর কারো লেখায় চোখে পড়ে না। শব্দের বিচিত্র খেলা আর দেহের অধিক দেহের বিচিত্র প্রকাশ অদ্ভুতভাবে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখার ভেতরে প্রকাশ করেছেন। শরীর নিয়ে আলো-আঁধারির মুগ্ধবিস্ময় তাঁর লেখার পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে। জেলখানার চলমান নোংরা কুৎসিত জীবনযাপনকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলের। মুক্তির দশক, সেই নকশালদ্রোহের সত্তরের দশকের ওপর লেখা গল্প 'অনিত্যের দায়ভাগ'। এ সংগ্রামকে, আন্দোলনের রূপকে তিনি গ্রহণ করেননি। বৃক্ষময় পৌরাণিক জীবনের আবহে তিনি এর ভয়াবহতা দেখাতে চেয়েছেন। বন্দুকের নল শক্তির উৎসকে কোনো অর্থেই গ্রহণ করেননি, সবখানে শুধু দীর্ঘশ্বাস আর স্বেদহীন ত্রাসই এনেছে। তিনি তাঁর শেষ আশ্রয়টাও পৌরাণিক কায়দায় রেখেছেন। এ গল্পের প্রকাশভঙ্গি, বলার ধরন, ভাষার সৌকর্য অসাধারণ। তাঁর দর্শনের সঙ্গে দ্বিমত থাকলেও প্রতীকী রূপায়ণ অসাধারণ। বিশেষ করে বুদ্ধমূর্তির পাশে হরিণকে অনুসরণ করে যা দেখলেই সেই মণি-মানিক্যের বদলে ঘাম — সত্যি অপূর্ব।

'খেলার আরম্ভ' শিরোনামের গল্পটির আরম্ভই বেশ অদ্ভুত ধরনের। গল্পকার যেন অন্ত্যজ শ্রেণির জ্বালা-যন্ত্রণা জোছনার মায়া-মমতায় ধুয়ে দেন। এ গল্পের শুরুর কিছু লাইন এ-ধরনের — 'ঠাকুর আপনি এই করুন, যেন আমার বিবৃতির মধ্যে কোথাও শ্লেষ তামাসা না থাকে; আমি সত্যই, এই প্রসঙ্গে বিশেষ মরণাপন্ন গোঙানি শুনিতে পাইয়াছি; এখানে ভগবান নাই, পতঙ্গ নাই, জলকাদা কিছু নাই, শুধুমাত্র শুষ্কতা; তবে গ্রাহ্য করিবার এই আছে যে, এখনও নিঃশ্বাস বহিতেছে।' কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এরপরের বিষয়গুলি তিনি তাঁর নিজস্ব কায়দায় ব্যাখ্যা করে গল্পের শরীর ভরাট করেছেন। তাঁর গল্পের সময়কাল সত্তরের দশকে, চলছে নকশাল আন্দোলন। একে তিনি এঁকেছেন ভয়ংকর ঘটনা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, খুন-ডাকাতির মতো বীভৎস ব্যাপার বলে। নতজানু মানুষের কোনো আকাঙ্ক্ষা এর ভেতরে ছিল কি না, এসবের ধারেকাছে তিনি যেতে চাননি। আন্দোলনের লোকদের তিনি স্কুল-কলেজের ছোকরা ছেলেপেলের ভেতর সীমাবদ্ধ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। সারা কলকাতার ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, বুদ্ধিজীবী যে এ ব্যাপারে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন এসবের কোনোকিছু আনতে চাননি তিনি। অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ গল্পে নকশাল আন্দোলনকে অ্যাটাক করেছেন। এটা কমিক্সের বিষয় হয় কী করে? গল্পে বোঝা যায় এসবের ভেতর একেবারে সমাজের নিরীহ অবস্থানটি। আসলে তা তো নয়। তখন কলকাতা ছিল এদের দ্বারা মানুষ হত্যার একটা স্বাভাবিক ঘটনা। পথে-ঘাটে, বাসায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি থানা-হাজত থেকে বাম-আন্দোলনের লোকদের এনে সরকারি প্রযোজনায় গায়েব করে দেওয়া হতো। এর একটা বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় প্রখ্যাত বাম তাত্ত্বিক আজিজুর হকের গ্রন্থ *জেলখানায় ১৮ বছর*। এটা ঠিক, এ আন্দোলনের বেশ সীমাবদ্ধতা ছিল। ব্যাপক তাড়াহুড়ো, মধ্যবিত্তের হুজুগে ভাব, চীনের ইন্টারনাল প্রেসক্রিপশন, পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব তো ছিলই। কিন্তু তারপরও এটাই এ উপমহাদেশে অন্ত্যজ শ্রেণি দ্বারা ক্ষমতা দখলের ব্যাপক কার্যকর প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন। এমনকি এর ব্যাপকতা মুসলমান প্রধান এ বাংলাদেশেও এসে লাগে। অনেকেই বিপ্লবের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। কাজেই এ সশস্ত্র আন্দোলনকে কতিপয় ছেলের ভয়ংকর কর্মকাণ্ড বলাটা সঠিক বলে ধরা যায় না। মানুষ মারার যে মহোৎসব তিনি দেখিয়েছেন, তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। একে হাঙ্গামা, নতুন অন্ধকার, রাজনীতিতে বজ্রাঘাত এসব বলার কোনো স্কোপ নেই। তা হলে তাঁর ভাবনা নৈতিকতার দিক থেকে একবারেই সংকুচিত বলতে হবে। রণনীতি আর রণকৌশলে সীমাবদ্ধতা থাকলেও একে এত ছোট করে দেখার কোনো স্কোপই নেই।

মাত্র দেড় পৃষ্ঠার একটা গল্প 'কঙ্কাল এলইজি'। তার ব্যবহৃত ভাষার এমন জাদুময়তা বাংলা সাহিত্যে আর কোনো গল্পে চোখে পড়ে কি না সন্দেহ। রীতিমতো ধাঁধার ভেতরে ফেলে দেয় পাঠককে। গল্পের কাহিনি বলতে তেমন কিছুই নেই। একটি ট্রাঙ্ক রাখা আছে একটা রুমে, যেখানে আসে বহুবর্ণিল মানুষ। আসে অনেক সুন্দরী হাস্যময়ী মৎস্যকুমারী। যাদের কাজে-কামে শারীরবৃত্তীয় তাগিদই মুখ্য বলে ধরা যায়। এখানেই জাদু দেখায় যোগনাথ নামের লোকটি। এখানকার নিয়ন্ত্রণটা তার ওপরে ধরা যেতে পারে। রুমের এ ট্রাঙ্কটির ভেতর আছে কঙ্কাল। সেই কঙ্কালই মানব নামের পঞ্চভূতের শরীরে কত মনোজাগতিক রিঅ্যাকশন দেখাতে পারে তারই একটা অসাধারণ শিল্পচিত্র এটি। ভাষার চমৎকারিত্বে পাঠককে ভয়বিহ্বল দ্বিধায় ফেলে দেন গল্পকার। এলোকেশী শ্মশান আর চৈতন্যবৃক্ষ রাতটাকে কবলে নিয়ে নেয় যেন। এখানে বায়ুদেহী কন্যাগণের নিত্য প্রমোদক্রীড়া ব্যাহত হয়। একসময় ট্রাঙ্ককে ঘিরে যেন আগুনের ধোঁয়া বেরোয়। অন্ধকার তাকে ধরাশায়ী করে। এভাবে একের পর এক জলস্তম্ভের মতো অন্ধকার পাঠককেও গ্রাস করে। এর ভেতরই গল্পকার শিশুর মতো করতালিমুখর আনন্দ যেন গণিকার মধ্যে চালান করে দেন। শুধুমাত্র ভাষার জাদুজালে একটি ভয়কে কত বস্তুনিষ্ঠ আর গ্রহণযোগ্যভাবে আঁকা যায়; তা কমলকুমার না পড়লে যেন পুরোপুরি জানাই যেত না। এ গল্পের সবচেয়ে বড় দিক লেখার পরিমিতিবোধ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠককে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিরও যথাযথ শেয়ার দিতে পারেন। একটা শব্দের পরিচ্ছন্ন ব্যবহার এত স্পেসিফিক, যা একটু মনোযোগী পাঠককেই নাড়া দিতে বাধ্য।

'বাগান দৈববাণী' আর 'বাগান কেয়ারি' যেন একে অপরের বিপ্রতীপ ভাবনার গল্প; যদিও দুটি মৃত্যুকে ঘিরে তাদের গল্প সাজানো। 'বাগান দৈববাণী'তে মৃত্যুর আয়োজন যেন এক অর্থে সাজানো-পড়ানো শোকগাঁথারই আয়োজন। এখানে অবস্থাপন্ন মানুষের এক লাশ নিয়ে শৌখিনতার বিষয়গুলোই যেন মুখ্য করতে চেয়েছেন গল্প-লেখক। লাশটি শুয়ে আছে শৌখিন খাটে। উদাত্ত গীত হয় চারপাশে, সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্য ছড়ায় এখানে। সবাই যেন রহস্যময় বিভ্রান্তিতে পড়ে। মৃত্যুর কষ্ট কাউকে তেমন ছুঁয়ে যায় বলে মনে হয় না। একধরনের দায়িত্বশীল অবহেলা চোখে পড়ে। এখানেও দেহতত্ত্বের পৌরাণিক ছায়া পড়ে। কোনো এক অন্ধ রমণীর কষ্ট ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। অন্যদের থেকে নিজেকে তার যাতনাও আলাদা করে। একসময় শোকসংগীত গাইতে থাকা একজনের চোখে যথার্থ অশ্রু নামে। যেন তিনি তার শরীরে মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন! শুকনা চোখে অঝোর ধারায় জল নামে। এও যেন রামকৃষ্ণ থেকে ধার করা। তবে শিল্পমাধুর্য একেবারেই অন্যরকম — ভয়ংকরও মনে হতে পারে। এখানে শোকবিকারের কোনো চিহ্ন নেই, নতুন গড়ে ওঠা শিল্পনগরীর সামনে লাশটি একবারে চরম অবহেলা নিয়ে পড়ে আছে। ঠিকাদার বড়ই আশ্চর্য হয়ে পড়ে — বুলডোজার, ক্রেন, ইলেকট্রিক ড্রিল, ডিজেল ইঞ্জিন, অসংখ্য ট্রাঙ্ক, কলকব্জার ভেতর লাশটি এলো কী করে? ঠিকাদার অতঃপর মহা লোকসানের বিষয়টা ভাবে। ঠিকানাহীন লোকটি এমন অবহেলা আর রহস্যের ভেতর একসময় দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। তার শরীরে পাপ না থাকলে বেঘোরে মৃত্যু হয় কী করে? এর তো ময়নাতদন্ত দরকার। উপনিষদের মৃত্যুর গল্পও হয় একসময়। এভাবেই অতি চমৎকারভাবে একটা সাধারণ মৃত্যুকে শিল্পবোধের অসাধারণ রূপ দেন কমলকুমার। এমন দেহতাত্ত্বিক ইঙ্গিত আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

'লুপ্ত পূজাবিধি'ও মৃত্যুরই গল্প। শিশুমৃত্যুর হার, প্রসূতিসেবার স্বাস্থ্যসেবা, শিশুদের যত্নাদি স্থান পায় এখানে। এখানে ক্লাস নেওয়া হয় পুতুলকে মডেল করে। টিচারদের নানামাত্রিক অন্তর্চেতনা এখানে প্রকাশ পায়। পুতুলগুলো নিয়ে ছেলেমেয়েরা একসময় নানাবিধ খেলায় মাতে। একটি মেয়েশিশু একটা পুতুলও চুরি করে। এসবই যেন খেলা। তবে খেলার ভেতর লিঙ্গভিত্তিক জাগরণও লক্ষ করা যায়। তবে একসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুলগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জীবনের সজীবতার দিকে আসার আহ্বান নির্দেশ দেন শিক্ষক। এভাবেই কমলকুমার তাঁর স্বমহিমায় জীবনের নানাবিধ অপার সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেন। এখানে ভাষা যথারীতি জটিলতায় আক্রান্ত হলেও ধৈর্যশীল পাঠকদের বোধের যথার্থ অনুরণন নিতে তেমন অসুবিধা হবার কথা নয়।

'আর চোখে জল' গল্পটিতে নগর কলকাতার জীবনযাপনের কিঞ্চিৎ চালচিত্র এসেছে, বিশেষ করে এর অন্তর্গত শহুরে লিমিটেড মাত্রাবোধের অফিসিয়াল মানুষগুলোর স্বপ্নের ধরন নিয়ে এখানকার জীবন ভাবিয়েছে। এখানে '৪৬-এর রায়ট, জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশন, সরাবর্দী (সোহরাওয়ার্দী), খুন-হত্যা, হিন্দুদের কাজে বাধাদান, লুটতরাজ, গুলি করা এবং এখন সেই সব অতীত স্মৃতিচারণে মিঃ-এর চোখে ভাসে। অনেক ঘটনা আর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে নগর-রোশনায় বদলে যাচ্ছে। হংকংয়ের স্বাধীনতা, জীবনে নতুন স্রোত ভিন্নভাষায় এসেছে এ গল্পে।

তাঁর কথাসাহিত্যের ভেতর ছোটগল্প পাঠের সমস্যা আর অন্যান্য অভিযোগসমূহকে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে — ১. তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মতোই চরমপাঠ দুর্বোধ্য। ২. ভাষার উপকরণ অর্থাৎ শব্দ, বাক্য তৈরির জটিলতা ব্যাকরণ মানেনি। ৩. তাঁর লেখা হিন্দু-পৌরাণিক পদ আর জীবন-ভঙ্গিমায় ঠাসা। ৪. তাঁর সৃষ্ট গল্পের কাল প্রায়শ নিরাকার বা অতীতমুখী। ৫. তিনি সংস্কারবাদী কিন্তু প্রগতিশীল নন তেমন।

প্রথমেই দেখা যাক তিনি কেমন দুর্বোধ্য — তাঁর লেখা প্রায় ৩০টি গল্পের ভেতর ৫-৬টা গল্পকে না হয় দুর্বোধ্য বলা যেতে পারে! এগুলো হতে পারে — 'কঙ্কাল এলইজি', 'আর চোখে জল', 'দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'কালই আততায়ী', 'কশ্চিত জীবন চরিত' ইত্যাদি। এসবও তাঁর বিষয়ের আইডেন্টিটির জন্য হয়ে গেছে বলে ধরা যায়। তবে তাঁর গল্পচর্চার শুরুটা নিশ্চয় এমনটি নয়। তার প্রথমদিকের গল্পসমূহ থেকে ধরা যেতে পারত আরেকজন শরৎচন্দ্র বাঙালির কাঁদো কাঁদো তরল মনকে কাঁদিয়ে-ঝাঁকিয়ে-নাড়িয়ে-খোদাই করে ছাড়বে। 'লাল জুতো', 'মধু, 'জল', 'জাসটিস', 'প্রেম', 'আমোদ বোষ্টুমি' ইত্যাদি তেমনই গল্প। এখানে তার নামটির বদলে শরৎবাবুর নামটি লিখে দিলে বাংলা গল্পসাহিত্যের হয়ত তেমন মনোকষ্টের কারণ হতো না। তবে এসবেও তিনি তাঁর লোকায়ত ঢঙটি নিয়ে আসার প্রবণতা কিছুটা হলেও রেখেছেন। তবে 'আমোদ বোষ্টুমি' নামের গল্পটি পাঠে কারো মনে হতে পারে তিনি তাঁর ভাবনার বীজটি অন্যকে সরবরাহ করেছেন। এটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগনির্ভর বিষয়-আশয় থেকে যেন অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাস *রাজনগর* আর *নয়নতারা* লেখার ধাঁচটি(?) পেয়েছেন। তবে এটা স্বীকার করতে হবে, ভাষার জটিলতায় বঙ্কিমের ভাষাকে যত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় মনে হয়, কমলকুমারে তেমনটি নয়। তাঁর ভাষায় পাঠজটিল আরোপিত উপাদান মিলেমিশে আছে। এ ক্ষেত্রে কমলকুমার আলোচক রফিক কায়সার তাঁর গদ্যশৈলীকে বলেছেন উদ্ভট আর বৃহত্তর পাঠক থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার ব্যাপারে উন্নাসিক মনোভাবকে দায়ী করেছেন। এটা ঠিক, পাঠককে তিনি তাঁর দুরূহ লেখার ব্যাপারে তেমন চর্চামুখর হয়ত করেননি। অথবা এমনও হতে পারে, তাঁর ভেতরের নিভৃতে লালন-পালন করা আভিজাত্য তাঁকে পাঠক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্য আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তাঁর জীবনকালের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর রৌদ্রময় মিছিলের উত্তাপ আর সমাজকে বদলে দেওয়ার জীবনতৃষ্ণা ছেড়ে আঠারো শতকের ভেজা স্যাঁতসেঁতে আলো-হাওয়ায় নিজেকে ডুবিয়ে! তখনকার প্রগতিশীল জীবনপ্রবাহ যে তাঁর মনে ধরেনি তা তো বোঝা যায়। কমলকুমারের বড় ব্যর্থতা হচ্ছে, তিনি তাঁর লালিত ধ্যান-ধারণাকে তেমন বিবর্তনমুখী করেননি। এটাও হতে পারে তাঁর সাহিত্যজীবনের বড় সীমাবদ্ধতা। তবে এটাকে চিন্তা-ভাবনায় রাখতেই কেন তাঁর লেখা এমন দুর্বোধ্য হয়ে গেল। কেনই বা এমন ধাঁচের চর্চায় পড়লেন তিনি! এর জন্য বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই কলোনিয়াল দেশগুলি ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হতে শুরু করে। চীনে মহান মাও সে তুঙের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শিল্পসাহিত্যের জগতে ঘটছে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন। প্রকাশবাদীদের পুনরুত্থানে বিজ্ঞানের জয়-জয়কার শুরু হয় সাহিত্য অঙ্গনে। চিরন্তন সত্যের স্থলে মানবিক ভুলসমূহকে ব্যবচ্ছেদ করা শুরু হয়। নতুন সত্যের উন্মেষ ঘটতে থাকে। এ উপমহাদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ঘটতে থাকে বিপ্লবের নতুন সব ক্রিয়াকলাপ। সশস্ত্র বামধারায় প্রচারিত রীতিনীতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ মারাত্মক হুমকির সামনে পড়ে যায়। স্কুল-কলেজের ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনে যোগই দেয় না শুধু, কলকাতার প্রকাশ্য সমাবেশে সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে এস্টাব্লিশমেন্টকে ক্ষয়ময়তার সামনে ফেলে দেয় তারা। সারা কলকাতায় বিশাল বিশাল স্ট্যাচু ভাঙা হয়। এখানেই কালীভক্ত রামকৃষ্ণের ভাবনায় তাড়িত কমলকুমার হয়ত দারুণ আঁতকে ওঠেন। তিনি তাঁর সাহিত্যিক আশাবাদ আর ভাবনাকে অনেক পেছনে নিয়ে যান। এখানেই একজন কমলকুমার তাঁর লেখার ধরনে বেশ পরিবর্তন আনেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভিজাত্যময় কমলকুমার নিত্য সাজে নিজেকে সাজান।

এও ভাবনায় আসে যে তিনি তাঁর ভাষার উপকরণ শব্দ, পদ আর বাক্যের চলমান গড়ন কেন নিলেন না। তখন কী এমন ঘটল যে তাঁকে ভাষার স্টাইলটাকে ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করতে হলো। সমাপিকা ক্রিয়ার ওপরই শুধু তাঁর খড়্গ নেমে আসেনি, বিশেষ্য, বিশেষণ, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন নিজস্ব স্টাইলে। শব্দ সাজিয়েছেন নিজের মতো করে। এতে ফরাসি আর ইংরেজি রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। মূল কথাটার ভেতরে অনবরত ছোটখাটো বাক্যাংশ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি আসলে শব্দ নিয়ে কখনো জলরং, কখনো কাঠ খোদাইয়ের কাজটি যেন করেই চলেছেন। তবে তিনি উপমা-রূপক ইত্যাদি ব্যবহারে এত অদ্বিতীয় যে এ নিয়েই আলাদা একটা শক্ত অবস্থান তাঁর হতে পারে। তিনি তাঁর নিসর্গচেতনা, শব্দের নিগূঢ় বিন্যাস, উপমার অলংকারিত্ব দ্বিতীয়বার কোথাও ব্যবহার করেছেন বলে মনে পড়ে না। শব্দে, শব্দের প্রতীকী মেজাজে রং ব্যবহার যে কত নিখুঁত, সিরিয়াস আর শিল্পসম্মত বিষয় তা যেন হাতে-কলমে পাঠ দিলেন।

তিনি তো *কল্লোল* বা *কালি-কলমের* যুগের কেউ নন যে রবীন্দ্র ধরনটিকে বিভিন্ন পন্থায় পরিহার করে রোমাঞ্চ আর সমাজ প্রগতির ধরনে নবজোয়ার আনতে থাকবেন। তবে এটা ঠিক, তিনি একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যিনি অতি সযতনে রবীন্দ্রনাথকে পরিহার করে গেছেন। এটি ভাষাশৈলী আর আলাদা জগৎ তৈরির জন্য নয়, তার চেয়ে বড় কথা তিনি রবীন্দ্রনাথদের ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মের চিন্ময়ী সাংস্কৃতিক রূপকে বাদ দিতে চিরন্তন চেষ্টা-তদ্বির করেছেন। কারণ তাঁর সাহিত্যচর্চার বহুমুখী প্রচেষ্টার ভেতর একটা ছিল সর্বক্ষেত্রে রামকৃষ্ণকে এস্টাব্লিশ করা। এ-দিক থেকে কলির অবতার শ্রীমান রামকৃষ্ণকে পরম ভাগ্যবান বলতে হবে; তিনি পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মতো সজীব-সচল-বুদ্ধিমান এমন এক ভক্ত আর কমলকুমারের মতো এত শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক আর শিল্পীকে। তবে তিনি তাঁর ভাষায় ইচ্ছেমাফিকই কিছু বাঁকবদল-রূপবদল করতে চেয়েছেন। এটি কোনো দোষের বিষয় নয়; কারণ প্রতিটি কথাসাহিত্যিকই চান তাঁর জায়গাটি আলাদা করতে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। একে কেউ কেউ হয়ত-বা লেখকদের আধিপত্যবাদী মানসিকতাকে দায়ী করতে পারেন। আসলে এটি তাঁর সৃষ্টিশীল মনের সতত প্রবহমান বলা যায়। যার ফলেই এমনটি ঘটে থাকে। কমলকুমার আলোচক রফিক কায়সার একে উদ্ভট ভাষাসৃজন বলে মন্তব্য করেছেন! এটি বোধ হয় ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। এ একজন লেখকের মেজাজ-মর্জিকে যথাযথভাবে মেনে না নেওয়ার ফল বলে ধরা যেতে পারে। সবাই যে অতি সাধারণ মানের পাঠকদের জন্য লিখবেন এমনটি না-ও হতে পারে। কমলকুমার যেভাবে তাঁর ভাবনা দিয়ে, আলোর বিকিরণ দিয়ে, লোকায়ত ঢঙটি তাঁর লেখায় আনতে চেয়েছেন, তা তাঁর আলাদা সৃষ্টিশীল কাজ বলে বিবেচনা করা যায়। এটি ঠিক, তাঁর লেখায় শব্দের ভাঁজে ভাঁজে, বাক্যে, রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটি হতে পারে তিনি ছিলেন সাকার মা কালীর ভক্ত। ফলে তাঁর লেখায় এসব এসেছে। তাঁর টানটি ছিল আভিজাত্যময় সনাতন কালচারের প্রতি। তাঁর সৃষ্ট লোকায়ত ধাঁচটি একটা সীমাবদ্ধতার ঘোরের ভেতর আটকে ছিল। তিনি ১০টি গল্পে মাধবায় নম, তারা ব্রহ্মময়ী আর রামকৃষ্ণের নামে গল্পই শুরু করেছেন। এতে বোঝা যায় একটা ট্রাডিশনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত কত প্রবল ছিল। তবে এটি বলা যাবে না যে, নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এটি একটা স্টাইলের মতোই এসেছে। 'খেলার বিচার' থেকে শুরু করে 'কালই আততায়ী' শিরোনামের গল্পসমূহে নানাবিধ প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের তিনি অবতারণা করেছেন, যার অনেক কিছু ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থত, আলোচনায় বলা যেতে পারে এটি ঠিক, তিনি অতীতমুখী। তাঁর সমকালীন (১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৯) অনেক প্রসঙ্গই তেমন আসেনি। তিনি তাঁর কালের দেশভাগের গল্প সরাসরি না লিখলেও বিপ্লবী-স্বদেশিদের প্রসঙ্গ এসেছে। এটিও দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দুর ভাব-তাড়নাই বেশি। তবে এমনও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে ভিন্নার্থে বা নেতিবাচকতায় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি। কারণ বঙ্কিমের স্বদেশিরা তাদের কাজের ধরনে সাম্প্রদায়িক উপন্যাসকে অতীব প্রয়োজনীয় মনে করলেও স্বদেশি আন্দোলনে জড়িত প্রায় সবাই একসময় কথিত প্রগতিশীল আন্দোলনে চমৎকার অবদান রাখেন। তবে তিনি তাঁর কালের কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ক্ষমতার ভাগাভাগির চরম চেষ্টা, রায়টের মতো জঘন্য ঘটনা, দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি অক্ষরও লেখেননি। সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনকে প্রায়ই অতি নেতিবাচক অর্থেই প্রকাশ করেছেন। এসবকে তাঁর একধরনের সীমাবদ্ধতা বলে ধরা যায়। পঞ্চমত, তিনি প্রগতিশীল কি না, তা এক কথায় রায় দিয়ে দেওয়া খুবই মুশকিল। কারণ তিনি তাঁর লেখা নিয়ে একটা স্পেসিফিক থিমে আটকে ছিলেন বলে ধরা যায় না। 'মতিলাল পাদরী', 'নিম অন্নপূর্ণা'র মতো সাহিত্যিক আশাবাদের মানবিক গল্প লিখেছেন। তিনিই আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহাদের কথা', 'রুক্মিণীকুমার', 'বাগান দৈববাণী', 'ফৌজি-ই-বন্দুক, 'কয়েকখানা'র মতো প্রতিশ্রুতিশীল জীবনমুখী গল্পের পসরা বসিয়েছেন। তিনিই আবার 'অনিত্যের দায়ভাগ' আর 'খেলার আরম্ভ'র মতো জীবনবিমুখ গল্প লিখেছেন। তা হলে এটাই ধরা যায়, তিনি কখনো নিজেকে একটা ভাবনা বা জাগরণে ষোলআনা নিমগ্ন রাখেননি। কিংবা হয়ত শিল্পভুবনের স্বোপার্জিত মুক্তচৈতন্যকে সদাতৎপর রাখতে চেয়েছেন!

তবে এ প্রশ্নটি আসতেই পারে, কমলকুমার এখন কতটুকু প্রয়োজনীয়। নাকি তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে বসেছে। না, — তাঁর ভাষাসৌকর্য শুধুই নয়, দেখার স্টাইল, নিজস্ব চেতনাপ্রবাহে পাঠক বা লেখকদের শুধু মুগ্ধ করছেন না; অতি প্রয়োজনীয় বলে নিজেকে প্রমাণও করতে পারছেন। ভাষার এমন মুক্ত তথা স্বাধীন-শৈলী আর কেউই দেখাতে পারেননি। যে ধাঁচের লোকায়ত ঢংটি তিনি আনতে পেরেছেন; তাতে বরঞ্চ বলা যায় লোককথাকে একধরনের রিলিফ দিয়েছেন, যা এ কথাশিল্পীকে অবিনশ্বর করবে। গল্প আর উপন্যাসে রঙের এমন আচানক ব্যবহার আর কেউ করতে পারেননি। তিনি তাঁর প্রথাবিরোধী যথার্থ পাঠকদেরও কাছে থাকেন সম্রাট হয়ে। তাঁর পাঠে যেমন বিহ্বলতা আছে তেমনি আছে চমৎকারিত্ব। এভাবেই লোকায়ত দ্রোহের নির্জন ঝাণ্ডা উড়াতে থাকেন তিনি।

১০-১০-১২/১২-৮-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসুন, আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করি
এবং এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্জলী যাত্রার সঙ্গ, প্রসঙ্গ, প্রতিসঙ্গ

কমলকুমার যেভাবে শুরু করলেন, *অন্তর্জলী যাত্রার* জীবনগল্প যেভাবে শুরু হলো আর-কি; তাতে মনে হতে পারে আমরা এমন এক লোকজগতে ঢুকছি, সেখানে আছে কথনরাজ্য, যার শুরু ভাগীরথী কিংবা গঙ্গার তীরঘেঁষে, রামকৃষ্ণজি তাঁর আসনে বসে তা দেখে দেখে শিশুর মতোই হাসছেন, মানুষ কত বড় হতে পারে, মানুষ তার নিজের ভেতর কতভাবে ঈশ্বরত্ব জাহির করে থাকে, তাই পরখ করছেন। এ এক কাব্যময় নান্দনিক প্রকাশ — তবে তাতে মুক্ততার স্পর্শ কতটুকু থাকে তা বিচার্যের দাবিও রাখে। কমলকুমার যে ভাষাটি নিয়েছেন তা হেলায় ফেলায় বাড়তে থাকা অতি সাধারণ প্রাকৃত কথন নয়; বরং এ এক আলাদা জগৎ, যেখানে ভাষার নিজস্ব একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। আমরা সেই জগৎকে দেখি, আলো-হাওয়ার পরশ নিই। আমরা আমাদের ভেতর ঈশ্বরত্ব সৃজনে ব্রতী হই। আমরা ক্রমে ক্রমে তবে *অন্তর্জলী যাত্রার* মায়াময় জগতে প্রবেশ করতে থাকি। যখনই কমলকুমারের উপন্যাসে আমরা মগ্ন হই, কিংবা তাঁর ক্রিয়েটিভিটি সম্পর্কে জানতে চাই, তাঁকে নিয়ে ভাবি, পুনর্পাঠ করি, তাঁকে ভাবনার সারথি করি, তখন আমাদের মনমাজারে বিরাজিত আগের ভাবনা অটোমেটিকই নাকচ হয়ে যায়! তার মানে এর দুটি দিক, আমি নির্দিষ্ট ভাবনায় থাকার পাবলিক নহি; কিংবা কমলকুমার ক্রমাগত আমায় বদলে দেন। আমার কাছে দ্বিতীয়টির প্রতিই সমর্থন থাকল। তাঁর উপন্যাসের পুনর্পাঠও নিজেকে পুনঃসৃজনের মতোই একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। আমি এই বিপদে প্রতিক্ষণে আছি। আচ্ছা, কমলকুমার তো উপন্যাস বিষয়টাকেই এক জায়গায় রাখতে চান না। তাঁর সৃজনকর্ম দেখে-চেখে-ঠেকে আমার অন্তত তাই মনে হয়।

আসুন পাঠক, এবার তবে আমরা তাঁর উপন্যাস নামের কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে জানি। অনেকেই ঘটনার লম্বা-চওড়া ঘন সন্নিবেশকেই উপন্যাস বলতে চান। তাতে সময়, সংলাপের লেনদেন ইত্যাদি মিলে এক শৈল্পিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার কেউ কেউ একে কথাশিল্পীর পার্সোনাল স্টেটমেন্টের মাধুকরী প্রকাশকেই বুঝিয়ে থাকেন। আবার কেউ বলেন তাতে আছে মনস্তত্ত্বের বোঝাপড়া — এ এক জার্নাল, এখানে অন্তঃপ্রবাহকেই প্রকাশ করে। আবার কেউ বলেন, এ হচ্ছে শ্রমজীবিতাকে প্রকাশের স্পষ্ট কাহিনিবদ্ধ প্রকাশ। তবে এটা ঠিক, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের যেমন অকথিত রূপ থাকে, নির্জনতার ইতিহাস থাকে, এতে তা নেই। এখানে সবই প্রকাশ্য রূপ নেয়, যেমন, রাষ্ট্র তার সংবিধিবদ্ধ সতর্কপ্রকাশে দৃশ্যত কোনো নির্জনতা পালন করতে পারে না। এখানেও তাই, সবই বলে যেতে হয় — সবই প্রকাশিত সত্য। এ সত্য জীবননির্মাণের সত্য, জীবন প্রকাশেরও সত্য। তবে উপন্যাসে সবই প্রকাশ পায়, হ্যাঁ-জৈবিক, না-জৈবিক, ধর্মজ ইতিহাস, বিবর্তনের রূপ, মনের নানান বাঁক, সবচেয়ে বেশি যা থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তির ভাংচুর, চরিত্রবিকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার এমন প্রকাশ আর কোথাও থাকে না। একটা উপন্যাস নাট্যপ্রবাহের ভেতর থেকেই নানান বাঁকবদলকরত আলাদা এক শৈল্পিক সত্তা প্রকাশ করে। রাষ্ট্র আর সামাজিক চরিত্রই মহাকাব্যকে উপন্যাসের আদলে প্রকাশ করে। সামাজিক জাগরণ এখানে একটা বড় বিষয়। এই যেমন, আমরা কমলকুমারের উপন্যাসে যে জীবন দেখি, তা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের হলেও তিনি তা লিখছেন কিন্তু বিশ শতকে। তখন ব্যক্তির নানান প্রকাশ আমরা দেখি, সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রকে বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলাতে হচ্ছে, ব্যক্তির প্রকাশও তখন জরুরি এক বিষয় হয়ে গেছে। চরিত্র যেন শৈল্পিকতার প্রতীকী মেজাজে সবই প্রকাশ করতে চাইছে। তিনি, কমলকুমার মজুমদার, যখন তাঁর কথাশিল্পের ব্যাপক প্রকাশ করতে থাকেন, তারও আগে তো আমরা বঙ্কিম-প্যারিচাঁদ-রবিঠাকুর-মানিক-সতীনাথদের এক-একটা পাথেয়কে গভীরভাবে জারিত-সৃজিত করতে দেখেছি। আমরা আলাদা এক শৈল্পিক সত্তাকে পাই; যার ভাষা, দেখার ধরন, এমনকি শুরুর ধরন, গল্পকে এগিয়ে নেওয়ার কৌশল একেবারে আলাদা করে চিহ্নিত করছে। আমরা অতঃপর তাঁর *অন্তর্জলী যাত্রা* থ্রোতে সেই পথটিই খেয়াল করব, প্রয়োজনে তাতে অবগাহন করব।

কমলকুমার *অন্তর্জলী যাত্রার* ভূমিকা হিসেবে তাঁর ঋণের কথা বলেছেন, তিনি এর ভাববিগ্রহে রামকৃষ্ণের কাছে এবং কাব্যবিগ্রহের জন্য রামপ্রসাদের দ্বারস্থ হয়েছেন বা ঋণস্বীকার করেছেন। তার মানে উপন্যাস নামের এক সার্বভৌম সৃষ্টিশীলতার ভেতর ঋণের মতো হতচকিত হওয়ার একটা বিষয় তিনি আহ্বান করেছেন! ঋণ বড় বেশি ঝামেলার জিনিস, এর কায়দা বড় গ্যাঞ্জামমুখর; যাকে জড়ায় তাকে জড়িয়েই রাখতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণের ধর্মই হচ্ছে, ঋণ সহযোগে ঋণকে ঋণের জালে প্যাঁচানো। আমরা কমলকুমার পাঠেও তার ইঙ্গিত পাই। তবে এ প্রশ্ন করা যায়, তাঁর এ-ধরনের নিমগ্নতার প্রয়োজন ছিল কি না — এটা একেবারে ভিন্ন কিন্তু প্রয়োজনীয় এক বিতর্ক বটে। আমরা তাহলে শিল্পসংস্কৃতির এই বিতর্কিত অবস্থা নিয়েই বিতর্ক করব, নাকি এর বিশুদ্ধতায় নিমগ্ন হবো তা একটা প্রশ্ন বটে। তিনি যেই সময়ে অর্থাৎ উপন্যাস লেখার কালে, মানে সতীদাহ প্রথার সেই রক্তাক্ত হতচকিত সতীদাহ প্রথার কাছে নরম-কমনীয়, কখনো-বা খানিক শোভনীয় এক প্রথার দৃশ্যকাব্য দ্বারা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছেন। তিনি প্রাকৃতজনের কাছে যেমন মাথা নত করেছেন, পাঠকসকলকে প্রণাম জানিয়েছেন, আবার ঈশ্বরবন্দনাও করেছেন; করেছেন মা কালীর মৃন্ময়সাধনা। তিনি ভাষার সব চলতি গাম্ভীর্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেয়েছেন। আমাদের এমন এক ভাষারাজ্যে নিমজ্জিত করেছেন, যেখানে আমরা তাঁর সাহিত্যপাঠে নতুন মানবরূপে নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে বাধ্য হই। আমরা কতক সংবিধিবদ্ধ সতর্কতার ভেতর নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে থাকি। আমরা তবে কমলকুমারপাঠে আবারো নিমগ্ন হই।

যদি বলি তাঁর কথনে, শিল্পে কিছু হয় তো হয়ই, আর যদি বলে দেওয়া হয় না-হয় না-হয়, তাহলে কি না হয়ই? এই যে শিল্পত্ব নির্মাণের নানান পথ তার আগাপাছতলা কে নির্ধারণ করবে? আসলে কমলকুমারের উপন্যাস পড়া মানেই সময়, সংস্কৃতি, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে একভাবে না একভাবে বোঝাপড়া করে নেওয়া। এতে মনের কোনো এক তলে যেন কাঁপন বয়ে যাবার মতন হয়, কাঁপনের সমাহারে শৈল্পিক লীলা হয়। তাঁর সৃজিত মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির ভেতর আলাদা এক দ্রোহের জন্ম দেয়। এক হিসাবে মনে হতে পারে, কমলপাঠের প্রয়োজন কী? তিনি সাহিত্যের শরিয়ত মারফত হকিকত তরিকত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন না। তাঁর কোনো সাহিত্যিক ধারাও নেই। তাঁকে পাঠ না করেও তো হরহামেশাই কথাশিল্পের নান্দনিক চর্চা হচ্ছে। তাহলে কারো কারো কাছে তাঁকে জানা-শোনা-বোঝা যে অবশ্য-কর্তব্য বলে ধারণা রাখতে চান, তা কেন? এর মূল কারণ লোকায়ত সংস্কৃতিকে জানা, আভিজাত্যময় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরব বোঝাপড়া করে নেওয়ারই শামিল। তিনি শিল্পের জগতে আলাদা এক ঈশ্বরত্ব কায়েম করতে সমর্থ হচ্ছেন। আসুন পাঠকসকল, তাঁর এ স্বোপার্জিত রূপকে জানি, এরই ভেতর দিয়ে আমরা বন্দনা রচনা করি।

তিনি, কমলকুমার মজুমদার, যদি শুধুই হন অন্য এক প্রতিষ্ঠান, জটিলতম বাক্যের ধারক, রামকৃষ্ণীয় ভাবের কাণ্ডারি কিংবা ভাষাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈরাজ্যের চালক, কিংবা লেখকদের লেখক, তবে ধরে নিতে হবে তাতে তাঁকে একঘরে করার চিকন-রাজনীতি আছে। প্রতিষ্ঠান অলওয়েজ প্রতিভাকে কাজে লাগায়, বাণিজ্য বসতিতে তা ওস্তাদ। ওঁর বাক্যের জটিলত্বের আগামাথা কিছুই পাওয়া যায় না। আর ভাষিক নৈরাজ্য বলে তার কাঁধকে মূলত খাটোই করা হয়। নৈরাজ্য এক চলিষ্ণু প্রতিভাময়তার নামও হতে পারে, যা সমাজ-রাষ্ট্রের ইতরামিকে তার প্রতিভাবলে নাকচ করতে পারে, কমল সেটা করেওছেন। অন্য কথা হচ্ছে, লেখকের লেখক বলে কিছু থাকে না। জমিদারের জমিদারি থাকতে পারে, কিন্তু লেখক এক সার্বভৌম সত্তার নাম, সেখানে কাউকে কর দেওয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। যাই হোক, এবার কমলসাহিত্য, বিশেষত তাঁর উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

অন্তর্জলী যাত্রার শুরুটাই অসাধারণ — অন্য এক সৌন্দর্যময় জীবনের হাতছানি দিয়ে যেন সূর্য উঠছে। আকাশ নীলাভ-ফর্সা হয়ে উঠছে ক্রমশ। আলোয় ভরে দিচ্ছে চারদিক। ক্ষণে-ক্ষণে মানুষের লৌকিক, সনাতন চেতনার ভাবতরঙ্গ, স্বাধীনস্পৃহার ব্যক্তিসংকট অত্যন্ত নিজস্ব ঢঙে ক্রমাগত বলে গেছেন। এ গ্রন্থে, *অন্তর্জলী যাত্রায়* যুগপৎ অনেক ক্রিয়া ঘটেছে। এ এমনই এক দৃশ্যকাব্য যেখানে ব্রাহ্মণত্রাসিত সংস্কার যেমন আছে, তেমনি মুক্ত-স্বাধীন জৈবিক ভালোবাসা। কখনো মনে হবে, সংস্কারই জীবন বহন করে, আবার মনে হতে পারে রক্তমাংসের জীবনবাদিতার বাইরে কিছু নেই। এর কাহিনি অতি সামান্য কিছু। এখানে সীতারাম নামের অতি-বৃদ্ধকে সার্বিক সদ্‌গতির স্বার্থেই গঙ্গার তীরে নেওয়া হয়। পবিত্র পাপমুক্তির আধার সেই গঙ্গা। সেখানে শ্মশান আছে, আছে বৈজু চণ্ডাল নামের এক শ্মশানচারী। সে যেন চলমান শব, শিবের শৌর্য, ধ্বংস, উচ্ছ্বাস তার রক্তে নিয়েছে। সীতারাম কতক আয়োজনের ভেতর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে। তার সঙ্গে তার দুই ছেলে হরেরাম-বলরাম আছে। আছে পূজা-অর্চনার লোকজন, গীত-গাওয়ার লোক, জ্যোতিষী অনন্তহরি, কৃষ্ণপ্রাণ। তথায় আছে লক্ষ্মীনারায়ণ — জাতকুল বাঁচানোর জন্য কিশোরী কন্যা যশোবতীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণের মান রক্ষা হয়। অনন্তহরির কথিত দোসরসহ সীতারামের জন্য করা গণনাও সঠিক প্রমাণিত হয়। তবে বৈজুনাথ এমন কথিত কাষ্ঠবিবাহ মানতে পারে না। তার অন্তর পোড়ে। যশোবতীকে মানুষতায় নিয়ে আসতে চায়। তাকে বাঁচাতে চায়। প্রেম চায়। যশোবতী সংস্কারকে একেবারে ছাড়তে পারে না। সমাজ-ধর্ম-মানুষ তার মায়াকে বন্দি করে রাখে। সীতারাম বুঝতে পারে বৈজু চণ্ডালের সঙ্গে যশোবতীর একধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মিক যোগাযোগ হয়ত হয়ে গেছে। তার বউকে গালমন্দ করে। একসময় প্রকৃতিই যেন এর সমাধা করে দেয়। গঙ্গার স্নানে তারা ভেসে যায়, তবু কোথাও না কোথাও মায়া লেগে থাকে। এই হচ্ছে সংস্কারের ভেতর বিরাজ করা চমৎকার এক জৈবিক ভালোবাসার উপাখ্যান। এর মূল চরিত্র কোনটি? লেখকের সবচেয়ে জনপ্রিয় এ উপন্যাসটি নিয়ে প্রশ্নটি নির্দ্বিধায় করা যেতে পারে। কারণ এখানে কোনো একটা ইস্যু আলাদা মর্যাদা নিয়ে আসেনি। সীতারাম চট্টোপাধ্যায় কিংবা তাকে নিয়ে করা ধর্মীয় অনুষ্ঠান গঙ্গাতীরের অন্তর্জলী নয়; যশোবতীর বিয়ে কিংবা সতীদাহের প্রস্তুতি নয় অথবা নয় শ্মশান ডোম বৈজুনাথের মানবিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা কনে-বউয়ের প্রতি অনুরাগই মূল বিষয় নয়। সবকিছুর পরেও আছে সনাতন ধর্মের সংস্কারকে আঘাত করার মানবিক আয়োজন। এ হচ্ছে লেখকের একমাত্র উপন্যাস, যেখানে সনাতন ধর্মীয় সংস্কার নিয়েই বেশি কাজ করেছেন। এটি সবচেয়ে বেশি প্রচারও পেয়েছে; তা ওই লেখা নিয়ে ফিল্ম করার জন্যই হোক কিংবা ভাষাশৈলীর জন্যই হোক, ব্যাপক পাঠকের নজরে আসতে পেরেছে এটি। কমলকুমার মুখবন্ধেই বলেছেন — এর ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের আর কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের। আমরা জানি যে, রামপ্রসাদ সুলতানি আমলের আর রামকৃষ্ণ অষ্টাদশ শতকের। একজন ভক্তিসংগীতে, অন্যজন ভক্তিচর্চায় শিব থেকে উত্থিত মা কালীর ভক্ত। তিনি একেবারে ঘোষণা দিয়ে কেন যে এ দুজনকে বেছে নিলেন তা বোঝা মুশকিল।

এ উপন্যাসে নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। কিশোরী বউকে শুধু নয়; সীতারামের দুই পুত্রের মাঝে চাবি দখল নিয়ে কাইজা-ফ্যাসাদ, বিয়ে পড়ানো নিয়ে ব্রাহ্মণদের অতি-সচেতনতা, সতীদাহের জন্য কিশোরী বউটাকে তৈরি করা; এমন আরো অনেক বিষয় আছে। তবে কিছু-কিছু ব্যাপারে অবাক হতে হয়। যেভাবে যশোবতীকে সাজগোছ করানো হয়, তাতে যে কারো মনে হতে পারে কমলকুমার কি সতীদাহের ভেতরও সৌন্দর্য খোঁজেন! নাকি এ বিষয়টাকে ভিন্ন ঘরানার নান্দনিক সৌকর্য হিসেবে প্রয়োগ করলেন কেবল? সীতারামের সঙ্গে যশোবতী যেমন আচরণ করে তাতে মনে হতে পারে বউটি বৃদ্ধকে স্বামী হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি। আসলে লেখক সনাতন ধর্মের আচারনিষ্ঠ থেকে কখনো পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। এসবের প্রতি একধরনের পক্ষপাত তাঁর থাকেই, হয়ত একধরনের সংস্কারের বশেই তা তিনি করেছেন। যে যশোবতী বৈজু চণ্ডালের কথা শুনে চমকিত; যার হাতটি বেশ সময় নিয়ে ধরে রাখলেও তার খেয়ালই থাকে না; তাকেই আবার হাতে অত জোরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগ করে কামড় বসায় কী করে? যশোবতী সম্পর্কে লেখক বারবার কেন পতিগতপ্রাণ, সতী, পতি-ব্যাকুলা ইত্যাদি বলেন তা বোঝা মুশকিল। আরো একটা বিষয়ে অবাক হতে হয়; তিনি সতীদাহ প্রথার বিষয়টা মুখ্য করতেই এ উপন্যাসের সময়কালটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই নিলেন; কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক প্রবহমানতা কেন মাঝে-মাঝে পৌরাণিক শৃঙ্খলে আটকে থাকে? ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি পৌরাণিক ভাবনাকে তিনি যেন ছাড়তেই চাইলেন না। নাকি এসব করতে গেলে আবার রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, ঠাকুর পরিবার, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিরূপ কথা চলে আসে? কারণ সতীদাহের মতো জঘন্য প্রথা নিয়ে বিদ্যাসাগরই বেশি কাজ করেন, কাজেই তাঁদেরকে বাইপাস করার সহজ পথটি হলো অষ্টাদশ শতাব্দীকে প্লট হিসেবে নেওয়া।

এ উপন্যাসের বৈজু একটা অসাধারণ চরিত্র। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যশোবতীকে কোনো স্বাধীনতাই দেননি কমলকুমার। বড় কঠিন বাঁধনে তাকে বেঁধে রাখা হলো। ভাষাচিত্র কত ব্যাপক হতে পারে তা *অন্তর্জলী যাত্রা* পড়লে বোঝা যায়। যেন জাদু মেশানো সবখানে। ডিটেইলের কাজ, মিথ ব্যবহার, জীবনকে দেখার কলাকৌশল — বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিরল নজির। উপন্যাসের একেবারে শেষদিকে জীবনের মায়ামমতা, বেঁচে থাকার যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় তাও অপূর্ব। তবে এখানে স্পষ্ট হতে থাকে যে, কমলকুমারের সৌন্দর্য, সীমাবদ্ধতা, দেখার কৌশল কারো সঙ্গেই মিলবে না। পাঠক নিজেকে তৈরি না করে তার নিজস্ব তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না। দীর্ঘ প্রস্তুতি তার প্রয়োজন। ভাষার এমন মায়ামমতা, ধার, জটিলতা-কুটিলতা, বৈদিক শ্বাস-দীর্ঘশ্বাসকে চেনা — সবই একধরনের সাধনার বিষয়। তিনি যেন বাংলা কথাসাহিত্যের আরেক চেকপোস্ট; যেখানে অতি সহজে ঢোকা যায় না। নিত্য রিহার্সাল দিয়ে তবে পাঠক নিজেকে তৈরি করতে পারেন। অবশেষে তাঁর লেখার কমা, সেমিকোলন, কোলন, দাঁড়ি, ড্যাস, হাইফেন, প্যারাগ্রাফও তাঁর হয়ে ওঠে। তিনি যেন পণ করেই নেমেছিলেন ভাষার ল্যাবিরিন্থই সাহিত্যের অন্যতম সৌন্দর্য।

উপন্যাসের গল্পকথা কি নিজেকেই বুনে যাওয়া নয়? আঠারো শতকের আগে তো সাহিত্যশিল্পী বা কথকরা জানতেনই না যে মুখের ভাষা দিয়েও সাহিত্য হয়। তাহলে বাংলা লেখ্য-কথাসাহিত্যের ইতিহাস পদ্যরীতিরই এক্সটেনশন। সেই ভাষাতে ছন্দের বা তালের আধিপত্য থাকাটা কি অসম্ভব? আর সাহিত্যের ভাষার কি আদপেই কোনো সীমারেখা বা বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন থাকে? বাংলা ভাষার তো নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরানার ব্যাকরণই নেই, যা আছে তা সংস্কৃতের দুর্বল ছায়া বৈ কিচ্ছু নয়। এই যখন অবস্থা তখন কী করে নির্ণয় করা যাবে যে এই হচ্ছে বামাচারী বা স্বেচ্ছাচারী বাংলা; যা দিয়ে কমলকুমার ভাষা নামক দরবারটিকে অতিশয় কর্দমাক্ত করে দিলেন — এভাবেই কি রায় দেওয়া যায়? না, তা একেবারেই দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, এও সত্যি, ভাষা দিয়ে যাচ্ছেতাই কিছু করা যায় না, কারণ তার পরিমিতি বোধ আছে, ভাষাশৈলীর আপাত নিয়ম-নীতি আছে। এর বাইরে যাওয়ার একটা যুক্তি নিশ্চয়ই থাকা দরকার। এখন এ বিষয়টা দেখা খুবই জরুরি, তিনি আসলে কদ্দূর কী করতে চাইলেন বা উন্মাদনা করলেন কি না। কথাসাহিত্যের জটিল বাক্যবিন্যাসকে শিল্পচৈতন্যের একধরনের মান ধরলে, এর জনক হতে পারেন কমলকুমার মজুমদার। বাংলা কথাসাহিত্যের জটিলতম লেখক হিসেবে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের নামটিই বলতে চাইবেন। এটা সত্যি, তাঁর লেখা পড়তে-পড়তে বোঝার জন্যও মেধাময় অতিরিক্ত পরিচর্চার প্রয়োজন। তিনি যে ৩০টির মতো গল্প আর আটটি উপন্যাস লিখেই কথাসাহিত্যে এমন জটিলতার আয়োজন করলেন; এসব শিল্পের নামে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতার ফসল কি না এমন কথকতাও শোনা যায়। এর জন্য আলাদা কোনো শিল্পসাধনার প্রয়োজন ছিল কি না বা তাঁর সাহিত্য সাধনা কি শতাব্দী প্রাচীনতার গৌরব নিতে পারবে? নাকি এসব হেঁয়ালিতে ভরপুর! তার ভাষাপ্রতিমে আঠারো শতকে ব্যবহৃত পণ্ডিতকুলের সহজাত ভাষাটিই খানিক ঘষেমেজে, খানিক ফারসি-আদল দিয়ে, তৎসম-তদ্ভবের ভারী পদবাচ্য ব্যবহার করে আলাদা এক চেহারা সৃজন করেছেন। তখনকার পণ্ডিতকুল, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, বলাই দেবশর্মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের ভাষার চেহারা কমলকুমারের ভাষায় আছে। তাঁর সৃজনশীলতায় নানান রঙের আশ্রয় তিনি নিয়ে নিয়েছেন। যেন রঙের এক হুলস্থূল মেলা তাঁর কথনশিল্পে দেদীপ্যমান হয়ে আছে। সাদা, কালো, হলুদ ইত্যাদি রং থাকলেও রক্তলাল তাঁর লেখায় আলাদা এক চরিত্ররূপে বিকশিত। যেন রঙের এক প্রকৃতিদশা তাঁর সৃজনে থাকে। তাঁর লাল এমনই রক্তাক্ত যে যেন তার শরীর থেকে নৃমুণ্ডের রক্তপ্রবাহ বেরোয়। এই যেমন তাঁর *অন্তর্জলী যাত্রায়* গল্পের শুরুতেই আছে লালের আধিক্য, পূর্ণিমা লাল, সিঁথির সিঁদুর লাল, সীতারামের রক্তে গঙ্গাও রক্তাক্ত হয়। এ যেন কমলকুমারের এক রক্তজ শুদ্ধি অভিযান!

তাঁর বাক্য, বিশেষত *অন্তর্জলী যাত্রার* বাক্য শেষ হয় নিত্য বা পুরাঘটিত অতীতে। কখনো কখনো সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যস্থিত অন্য পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলোপ বা ক্ষয় হয়। এ ক্ষণেও ওর নেশা থাকে, কোথাও না কোথাও মায়া থাকে। তিনি যে ভাষাটা ব্যবহার করেন, তাতে বঙ্কিম থাকে না, থাকে না প্যারীচাঁদ মিত্রের লৌকিক ঢং, যা থাকে তা আর বাংলা গদ্যে নেই। যা নেই তাই তিনি আয় করেন। এ গদ্যকে লোকগদ্য বলার লোভ হলেও তা কিন্তু তাঁর সৃজিত ভারী শব্দের জ্বালায় এক স্থলে থাকে না। ফলে যা থাকে, যার ভেতর ক্রমশ প্রবেশ করতে করতে তাঁরই নিজস্ব বলয়ের লোকগদ্য মেলে। তাঁর ভাষার যে প্রাণ, মানে যে প্রাণভোমরা তার স্বাদ নেওয়ার সঙ্গে নারিকেলের ভেতরকার সুপেয় জল খাওয়ার মিল হয়ত আছে। সেই রস নিতে গেলে যেমন গাছে আরোহণ করা লাগে, তা অক্ষত অবস্থায় হাতে নেওয়া লাগে, ছাল-বাকলা সরিয়ে জল বের করা লাগে; তাঁর গদ্য অনেকটা সেই রকম।

তাঁর উপন্যাসে শিল্পের স্বরূপ কেমন, কোন নান্দনিক সৌন্দর্যকে ক্রমান্বয়ে বুনে গেছেন? এটি তাঁর মানসচেতনাকে বোঝার জন্য অপরিহার্য একটা বিষয়। এমনই মনে হয় যে, বহুকণ্ঠআশ্রিত শিল্পরূপ এঁকে যাওয়াই তাঁর মৌলচেতনার উৎস। তাঁর গদ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নান্দনিকতার আয়োজনের আভাস খুবই স্পষ্ট। তবে তাঁর বাক্যের জটিলতম বিন্যাস সেই আয়োজনকে ঝাপসা করে দেয়। বাক্যের হুলস্থুল প্যাঁচগোছ পাঠ-স্বাদুতার প্রধান অন্তরায়। এতেই সহজাত লোকভাবনা ক্রমশ পাঠকের মনোপীড়নের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবনা প্রকাশের ধারায় শুভ আর সৌন্দর্যের ভেতর আলাদা প্রবহমানতা থাকে না। যার ফলে রামকৃষ্ণের লোকায়ত সমাজনিষ্ঠা যত প্রকাশ পায় শিল্পের স্বাধীন বিকাশ ততই রুদ্ধ হয়। তবে এতে যে রামকৃষ্ণীয় ভাবনার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় না তা কিন্তু বলা যাবে না। জিতেন্দ্রীয় অনুভব আর উনিশ শতকীয় সনাতন ভাবঘেঁষা লৌকিক ধর্মের সঙ্গে স্বতন্ত্র দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। মানবিক তৃষ্ণার একটা রূপ কখনো কখনো তাঁর সৃষ্ট জীবনচিত্রে দেখা গেলেও ধর্মীয় আভিজাত্যময় লৌকিক ছাপ ক্ষণে-ক্ষণে জাগরূক থাকে। তাঁর লেখায় উপনিষদও এসেছে, কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের সাহস নিয়ে তিনি কখনো তাতে আঘাত করেননি। তাকে কখনো মনে হয় তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ের ধর্ম বিস্তারের পদ্ধতিকেই সমর্থন করেছেন। এটাও তাঁর আরেক সীমাবদ্ধতা। *সুহাসিনীর পমেটমে* বহুমাত্রিক ধর্ম অনুভূতির মানুষকে জড়ো করলেও সেখানেও কোনো মুসলিম চরিত্র নেই, যদিও এ উপন্যাসে ভাষাশৈলী থেকে শুরু করে জীবন জিজ্ঞাসারও অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন লক্ষ করা যায়।

কমলকুমারের ভাষার প্রকরণ-কৌশল নিশ্চয়ই জটিল এবং স্বনির্মিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাংচুরও প্রচুর। তিনি কি বামাচারী গদ্যশৈলীতে বিশ্বাসী? তাঁর সবই মেকি? ইচ্ছে করেই তিনি আলাদা ভাষা-ইনস্টিটিউট গড়তে চেয়েছেন? না বোধ হয়, কিংবা তাই হয়ত তাঁর সাধনা। তবে বঙ্কিমের প্রতি তাঁর নেশা থাকলেও তিনি তাঁর মতো করেই প্রতিটি বর্ণ, বাক্য, বাক্যস্থিত শূন্যতা ব্যবহার করেছেন। রবিঠাকুরের কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষার বিস্তারকে তিনি আলাদা করে দেখার বাসনা রেখেছেন। তা থেকে নিজেকে আলাদা করেছেন, পরম সৌন্দর্যবিলাসী হয়েছেন তিনি। আলাদা এক বাউলিয়ানা, ধূলিধূসরিত জীবনের প্রতি মমতা গড়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষা দীর্ঘজীবী হওয়ার আপাতত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি? তাঁর সৃষ্টিশীলতার ধরনটি কেমন? শ্মশানের তাপে জ্বলে-জ্বলে তাঁর ভাষায় কি মানুষের হাড়গোড় মাংস-নাড়িভুঁড়ির পোড়াগন্ধে ঠাসা? তাঁর বিদ্রোহটা আসলে কোন জায়গায়? আদৌ কি কোথাও পৌঁছতে পারলেন? তাঁকে পাঠক কেন অত কষ্ট করে পড়বে? তাঁর ভাষার কি সামাজিক ভিত্তি বা সাহিত্যিক বোধ নেই? তিনি কি এতই স্বেচ্ছাচারী যে তাঁকে আলাদা মর্যাদা দেওয়ার কিচ্ছু নেই? বঙ্কিমের কাছে তাঁর ঋণ কতটুকু? নাকি তাঁর সহযাত্রী কেউ নেই? তিনি কি ব্যাকরণহীন ভাষার স্রষ্টা? তিনি অতই নৈরাজ্যের অধিপতি? গদ্যশৈলীর অচেনা আধিপত্য তাহলে পাঠককে বিরক্তই করবে শুধু? তাঁর ভাষা কি স্বয়ম্ভু? তাঁর কি নিজের ওপর কোনো কন্ট্রোল নেই? অত বেহিসেবি হয় শিল্পচর্চা? রঙের যে কী অসাধারণ ভাষাজীবিতা থাকতে পারে, তা রবিঠাকুর কিংবা অন্য কারো লেখায় আসেনি। বঙ্কিমও এদিকটাতে তেমন উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এত উপমার শক্ত গাঁথুনি, চিত্রকল্পের নিটোল বর্ণনা হাসান আজিজুল হক ব্যতীত আর তেমন চোখে পড়ে বলে মনে হয় না। কমলকুমারের ভাষা বলে এককথায় কিছুই বোঝানো যাবে না। কারণ *শবরীমঙ্গলের* বর্ণনাধর্মী প্রায় শরৎচন্দ্রীয় ভাষার সঙ্গে *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* বা *সুহাসিনীর পমেটমকে* এক করে দেখা যায় না। প্রায় সবদিক থেকেই এসব পৃথক। কাজেই কমলকুমারকে বিচার-বিবেচনায় রাখতে হলে প্রত্যেক রচনাকে আলাদা করে বিবেচনা করা উচিত।

তিনি যে স্বরূপকে লালন করতে চান, ওই ব্যক্তির উন্মেষ তো হয় অনেকটাই ভূ-রাজনৈতিক। উনিশ শতকের একটা সোজাসাপ্টা প্রবণতাই হচ্ছে, আমিত্ব দিয়ে নিজের মতটি প্রকাশ করা। যেমন বঙ্কিম করেছেন কৃষ্ণযোগে, রবিঠাকুরের ব্রহ্ম, তেমনি কমলকুমারের আরাধ্য হচ্ছেন রামকৃষ্ণ। এ হচ্ছে নিজের মতকে প্রকাশ করার, ধর্ম-রাজনীতিকে লালন করার একটা পাথেয় মাত্র। তবে কমলকুমার প্রাকৃতজনের বন্দনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে যে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছেন এটাই তাঁর শিল্পত্বকে অনেক দৃঢ় করতে পেরেছে। তবে তিনি যে ঈশ্বরদর্শনের ফিলসফি যাপনে ব্যাপকভাবে আস্থাশীল তা মনে করা মুশকিল। তিনি মূল প্রাকৃতজনকেই পূজনীয় বরণীয় করতে সচেষ্ট আছেন। তিনি মূলত নিজ-সৃজিত জগতের ঈশ্বরত্ব চান। তাই তো তিনি তাঁর বলার ভেতর লৌকিকত্বকেই প্রাধান্য দেন। তিনি যে বৈজুকে দেখেন সে আসলে শিশুর মতোই সরল। তাঁর বাক্যের পরতে পরতে জীবনের কান্তি থাকে, সে নিশ্বাস নেয়, নাকি নিশ্বাসই তাকে নেয় এ প্রশ্ন উদিত হয়। যে মায়া আমরা এখানে দেখি, তা এই সময়ের আমাদের চেনাজানা লৌকিকতার মায়ায় পরিপূর্ণ। তিনি একেবারে সাধারণ-জীবনের ব্যাকুলতায় মানুষকে দেখছেন। এ দেখাটাই কমলকুমারকে আলাদা জায়গা করে দিচ্ছে।

তিনি মূলত বিকল্প-সত্য সন্ধান করেছেন। এখনো যেন তাই করে যাচ্ছেন। তার ভেতরে আছে চিরন্তন সজীবতা। আমরা যে উপন্যাস চিনি, মানে ইউরোপতা যেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে, তিনি তার থেকে দূরে থেকেছেন। তিনি বাংলা ভাষার একটা উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন, মৌলিকত্ব আনতে চেয়েছেন সেখানে। তিনি কিছু মানুষের কথা বলেছেন, সেই মানুষকে তিনি চেনেন, তাদেরকে সাধনা করার মতো কায়দা ও করণকৌশল তাঁর জানা আছে। যার জন্য যে চরিত্র তার আওতাধীন নয়, যে মানুষকে সাধন-ভজন করা যায় না, যদিও তারা বাংলায় কথা বলেন, তিনি তাদের পছন্দসই মানুষ, পাপ-তাপ-সংস্কারের কাছে গেছেন। এটা একধরনের সীমাবদ্ধতা বলে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু বায়বীয় সত্য তিনি রচনা করেন না। এখানে তাঁর মৌলিকত্ব, এখানেই তাঁর দৃঢ়তা।

তিনি সাহিত্যে, তাঁর শিল্পে, একটা দর্শনের কথা বলছেন। অন্তত তাঁর *অন্তর্জলী যাত্রায়* সেই মত প্রকাশ করেছেন। বলা যায়, একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণাই তিনি দিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাঁর এ সৃজনে রামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর এ কাণ্ড দেখলে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ যদি হন রামকৃষ্ণের ভূ-রাজনৈতিক শিষ্য তিনি তাহলে রামকৃষ্ণের শৈল্পিক এক্সটেনশন। এটা একটা অতি কৌতূহলের বিষয়, দৃশ্যত অক্ষরহীন রামকৃষ্ণের এমনই এক ভাবশিষ্য পাওয়া যাচ্ছে যিনি তাঁর ভাব প্রকাশের নিমিত্তে আলাদা একটা ভাষাকৌশলকেই রীতিমতো ধ্যান করতে আছেন। তিনি তাঁর কাজে সদা ভ্রাম্যমাণ আছেন। কারণ তিনি মরহুমত্বকে জয় করতে আছেন। তিনি আমাদের মনোমাজারে চলমান সৌন্দর্য, তাঁকে আমরা স্মরণ করি, এমনকি বহন করারও বাসনালিপ্সু হই। তিনি তাঁর জীবনদর্শনকে শেষতক কীভাবে দেখেন তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। একজন সৃজনকর্তা একটা জীবনদর্শনকে বহন করতে পারেন না। এটা তাঁর কর্তৃক সম্ভব কি না তা একটা বিষয় বটে। এই যে তাঁর কথনশিল্প, *অন্তর্জলী যাত্রা* তাতে নানান চরিত্র আছে। জীবনদর্শন যদি তাঁর রামকৃষ্ণআশ্রিতই হয়, তাহলে কোন চরিত্র তা বহন করবে? মরণোন্মুখ সীতারাম, ব্রাহ্মণ-কন্যা যশোবতী, নাকি বৈজু চাঁড়াল? তাঁর অপর চরিত্র, এমনকি বৃদ্ধের দুই পুত্র, হরেরাম, বলরাম, যারা তাদের পিতাকে গঙ্গার তীরে অন্তর্জলী যাত্রার মতো খতমে সাফা করতে আনা পিতার শোকের কষ্টের যাতনার দিকে না তাকিয়ে জাগতিক লোভ-লালসায় মত্ত হয়, তারা কমলের ভাববিগ্রহকে কীভাবে ধারণ করবে? একটা জীবনদর্শন তো সব চরিত্রের জন্যই হয়। কমলের সব চরিত্র তো তা ধারণ করতে পারে না, বা তা সম্ভবও নয়। তাহলে কমলকুমার কেন একটা নির্দিষ্ট ভাব দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ তো করছেনই, তাঁর পাঠককেও একটা নিয়ন্ত্রণবাদী আচরণে আটকে দিচ্ছেন। শিল্প তো পুলিশ-মোক্তারের বিষয় নয়, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে তা চলেও না। তাহলে কেন এ নিয়ন্ত্রণ!

তিনি যেভাবে তাঁর উপন্যাসটি শুরু করলেন, যেভাবে গঙ্গার তীরে মরণোন্মুখ বৃদ্ধকে তার সদ্‌গতির জন্য আনা হলো, সেখানে শুধু গঙ্গা, একটা সময়, সামাজিক-ধর্মীয় ক্রিয়া নয়, মানুষের মুহুর্মুহু আচরণ সেখানে আছে। ধর্মনির্ভর জীবন সেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কমলকুমার নিজেই নিজের প্রতিস্পর্শীও হয়ে উঠছেন। তাহলে একজন পাঠককে একটা ঘোষণা দিয়ে কেন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন তিনি! এই যে নিয়ন্ত্রণবাদী আচরণ তা তো শিল্পের সহায়ক কিছু হয় না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে, শেষতক তিনি প্রাকৃতজনকেই দেবতা মানছেন। এই জন্যই হয়ত রামকৃষ্ণের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাঁর লীলায় পাঠককে অবগাহন করাতে চাইছেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, যেখানে তিনি নিজেই একটা এলাকা, সময়, ব্যবস্থাপনা বা রাজনীতিতেও থাকতে পারেননি, সেখানে কলির দেবতার কাছে বারবার আরাধনার ব্যবস্থাকে একটা লৌকিক আচরণ হিসেবে দেখা যায় কি না। তিনি কি তত্ত্বনির্ভরশীল লেখক? কোনো বাদ প্রচার করছেন? তা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ তিনি রামকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ঘোষণা রেখেছেন। ঈশ্বরদর্শনের কথা বলেছেন। সর্বোপরি প্রাকৃতজনকে স্মরণ করেছেন। আমার মনে হয়, এ দ্বারা একটা জগতে ঢোকার কায়দা রেখেছেন মাত্র। শেষ পর্যন্ত মানবমায়াই তাঁর মূল জায়গা। তাঁকে আমরা সেখানেই খোঁজার ব্যবস্থা রাখতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যে বাংলা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য স্বপ্নপ্রতিম তা স্বীকার করে রাখতে হয়। এ নিয়ে আরো কথা চালিয়ে যাওয়ার বাসনাও চালু রাখা দরকার। কারণ তা না করে আমাদের যেন উপায় নেই। নানাজন নানাভাবে তাঁকে দেখেন। কেউ কেউ তাঁর লেখাকে হেঁয়ালিপূর্ণ আর উদ্ভট গদ্যশৈলী বলেছেন। সেটা যিনি বলছেন তিনিই তার যথার্থ ব্যাখ্যাও দেবেন হয়ত। কেউ তাঁর সৃজন তত্ত্বেও রূপ-রস-গন্ধ চাখেন। কিন্তু এটাও বোধ হয় মনে রাখা দরকার, তিনিই ওই লেখক, যিনি শুধু অপরকে নন, নিজেকেও উৎরে যেতে পারেন। তাই তিনি করেছেন; অনবরত নিজেকে ভেঙেছেন, ফের ভিন্নমাত্রায় গড়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, অমিয়ভূষণ মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, কায়েস আহমেদ, সন্দীপন, শহীদুল জহির এমনসব পরিবর্তনে নিজেদেরকে রূপান্তরের ভেতর রেখেছিলেন। এটি আরো হয়ত অনেকেই করেছেন। তবে এত স্পষ্ট কেউ তা করতে পারেননি। তেমন কোনো লেখকের নাম বোধ হয় নেওয়া যায় না, যারা অনবরত নিজেদেরকে ভেঙেছেন এবং কখনো কখনো নিজেদেরকে শিল্পসৌকর্যতায় অতিক্রমও করে গেছেন। কথিত যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে সমুদয় সৌন্দর্যকে উপস্থাপনের সম্ভাবনা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা তৈরি করতে চাননি তিনি। সত্যম-শিবম-সুন্দরমের নান্দনিক স্পৃহার বাইরে খুব একটা বিচরণও করেননি। তাঁর চৈতন্যে ধর্মীয় চিন্ময়ীরূপ, লোকজ আবহ হয়ত বিস্তৃত হয়েছে। এসবও স্বতঃস্ফূর্ত নান্দনিক চেতনাকেও সংকুচিত করেছে কেবল। তিনি অনেকটা দার্শনিক-নন্দনতত্ত্ববিদ হেগেলের সৌন্দর্যবিষয়ক ভাববাদী অধ্যাত্মধরনের ভাবনা সহযোগে যেন পৌরাণিক ধারণার পঞ্চভূতের অপার রূপদর্শনের মৌতাতে মেতেছিলেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা স্বনির্ভর হয়নি। এমনকি তা হয়ত করতে চানওনি। তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব কায়দার আবেগময়তা প্রচণ্ড দাপটে কখনো কখনো নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর *অন্তর্জলী যাত্রা* বা অন্য কথনশিল্পে ভাষায় চিত্রশিল্প আঁকতে চেয়েছেন। এ তাঁর নিজস্ব বচনের নান্দনিক আয়োজন।

৪-১০-১০/১৩-৩-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শবরীমঙ্গলকথা

কমলকুমার মজুমদারের *শবরীমঙ্গল* একটা গ্রন্থ মাত্র নয়, একধরনের সামাজিক বোঝাপড়া তাতে আছে। একে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে পাঠ করার মজা, আরাম এবং দায়বোধও আছে। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস কি না তা নিয়ে কানাঘুষা আছে। এটি এক স্বল্পোচ্চারিত সৃজনকর্মও বটে! এমন একটা ধারণাও প্রচলিত যে তিনি এ কাজের মানগত দিক থেকে শরৎচন্দ্রকে খুব বেশি দূরে রাখেননি। মাধালী নামের এক চরিত্রকেই সদাজাগ্রত রেখে চলচ্চিত্রিক সাহিত্যবিন্যাসও বেশ কৌতূহলের বিষয়। তবে সবই আপেক্ষিক কথকতা। হয়ত জগতের সব কথাই আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল, বিচ্ছুতিমুখর! *শবরীমঙ্গল*ও তাই। তবে আমরা এখানে একটা চরিত্র মাধালীকে দেখব, তার গমনপথকে নিবিড়ভাবে অবজার্ভ করব, শবরী নামের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভেতর দিয়ে একটা লৌকিক সত্তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করব।

তাঁর উপন্যাসে কাহিনিও গল্পের শরীরঘেঁষেই দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেও কাহিনি তেমন কিছু নয়, জীবনকে খোঁজাখুঁজি করার একটা জার্নি মাত্র। চরিত্র খুব বেশি নেই তাতে — মাধালী, রোমনি, লুহানী, অদ্বৈত মিশ্র, ফাদার ফিলিপ, মাকাড়ী, মাকাড়ী বৌ, তুলসী প্রমুখ। আমরা এর শুরুতেই দেখব মাধালী নামের স্থানীয় খ্রিষ্টান রেবুতি নামের জায়গা থেকে রোমনির কাছে এসেছে। একধরনের হৃদ্যতা তাদের আছে। অদ্বৈত মিশ্র কুষ্ঠরোগী, বাঁকা পা, ছিটকানো আঙুলওয়ালা। সে থাকে রোমনির আশ্রয়েই। তবে তার দেমাগের শেষ নেই। এই দেমাগ জন্মগতভাবেই প্রাপ্ত, সে জাতে ব্রাহ্মণ, তাই মাধালীকে রোমনির ঘরের বারান্দায় বসা দেখে সে খুবই ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু রোমনি তাকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। কুষ্ঠরোগী হিসেবে তার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারকে বরং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। একধরনের জাতিতাত্ত্বিক ভেজাল আমরা এখানে পাই। কিন্তু সমাজ বলে একটা বিষয় আছে। সেই সমাজের তাড়নায় কিংবা নিজের প্রেরণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধালী একসময় রোমনির ঘর থেকে চলে আসে। সে যেন কাকে খুঁজে, জন্মের একটা রহস্য সে আবিষ্কার করতে চায়। ভগবানকে স্বচক্ষে দেখার বাসনা তার হয়। সে চলে যায় লুহানী নামের তার বোনের কাছে। বোনও অভাবী, তার স্বামীটাও কোথায় চলে গেছে। তাই সে ধর্মজাত উদাসীন তার ভাইকে লালন করবে কী করে? কিন্তু ভাইয়ের প্রতি তার চমৎকার মমতা আছে। তাই ভাইয়ের জন্য সে কাজ করতে চায়। প্রয়োজনে যাকে-তাকে বিয়ে করে হলেও ভাইকে সে দেখাশুনা করে নিতে চায়। কিন্তু হঠাৎই সে তার ভাইকে পায় না। কোথায় যেন সে চলে যায়। ভগবানের স্বরূপ সন্ধানে সে নানান দিকে ঘুরে। কিন্তু লুহানী তাকে অনেক জায়গায় খুঁজে, যাকে কাছে পায় তাকেই ভাইয়ের সন্ধান দিতে বলে। গির্জায় যায়, বনে-জঙ্গলে ঘুরে, ফাদার ফিলিপের কাছে তার সন্ধান চায়। কিন্তু তার ভাই মাধালী তো ট্রাডিশনাল কোনো পন্থার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চায় না। আকাশ, প্রকৃতি, সহজাত জীবনের ভেতর দিয়ে ভগবানের একটা রূপ সে দেখতে চায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সে বোনের কাছে আবার আসে। বোন তাকে পেয়ে অনেক খুশি হয়। ভাইয়ের প্রতি বোনের এমন মায়াময় টান আমরা কথাশিল্পে খুব বেশি পাই না। কিন্তু মাধালীর তো সংসারে জীবন বসে না। আবার সে ঘরছাড়া হয়, বা ঘরে সে যায়ই না। একসময় রোমনির ঘরের দিকেই ফিরে আসে। অদ্বৈত মিশ্রের সঙ্গে তার দেখা হয়। একসময় এই কুষ্ঠরোগীকেই সে জড়িয়ে ধরে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন সহজাত প্রীতি দেখে অনেকেই অবাক হয়। একসময় রোমনির সঙ্গেও তার দেখা হয়। তাদের দেখাদেখির এই বিষয়টা যেন আমাদের উপন্যাস জগতের এক নতুন আঙ্গিকের চমৎকার বিষয়। আমরা দেখি যে রোমনি সারা উপন্যাসে প্রথমদিকে একবারই আসে, আর তাকে দেখা যায় একেবারে শেষ দিকে। মাধালী যখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তখন আমরা রোমনির ছায়াও দেখি না। বরং লুহানী বারবার ঘুরঘুর করে। শবরী নামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সহজতাকে আমাদের চোখের সামনে বিলিয়ে দিয়ে রাখে। কিন্তু আমরা একসময় বুঝতে পারি, রোমনি মাধালীর মনে আছে। তা আছে একটা দীর্ঘস্থায়ী রেখার মতো। তাই যেন মাধালীকে তার কাছে নিয়ে আছে। আমরা মহুয়া-মাতাল মাধালীকে দেখি, নিজের সত্তার ভেতর ভগবানের সন্ধান পাওয়া প্রাকৃতিক মানব দেখি, নারী-পুরুষের অগণন গোপনতা দেখি, হিমতীক্ষ্ণ রোমাঞ্চ দেখি, তাদের ইচ্ছার পরিপূর্ণ রূপ দেখি। মানব-মানবীর উষ্ণ রক্তের আমরা ইশারা পাই। নিপুণ সততায় ভালোবাসার স্পষ্ট রূপ দেখে আমরা মোহিত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলকুমার এ উপন্যাসের ভেতর দিয়ে কিছু কাজ করতে চেয়েছেন, কিছু বিহেভিয়ার প্রতিষ্ঠান করতে চেয়েছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আছে, যা আমরা একেবারে প্রথম লাইনেই পাই। রোমনি এমনই এক চরিত্র যে এ গ্রন্থটির একেবারে শুরুতে খানিক আছে, আবার একেবারে শেষ দিকেও আছে। আসলে সে সবখানেই আছে, কারণ মাধালীর প্রেম তাকে জলজ্যান্ত রাখে। বহু জায়গায় ঘুরলেও সে আসলে রোমনির কাছেই যেন থাকে। সেই রোমনি গ্রন্থটির শুরুতেই মাধালীকে বলছে, 'যা বুলবে... একটা মাথা দিয়ে বুলবে ত... বাস...' রোমনি সনাতন ধর্মের হলেও সে আসলে প্রাকৃতিক নারী হয়ে যায়। তার রক্তে হয়ত বোঙ্গা (একটা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দেবতা) ঢুকেছে। আসলে তা নয়, সে সহজাত এক নারীই থাকে। তাতেই হয়ত একধরনের প্রাকৃতিক আয়-ব্যয় দেখি। আমরা তাকে ভুলতে পারি না। কারণ সে রক্তে রক্তে বিচরণ করা নারী হয়ে যায়। সে আপেল নয়, সেমেটিক রমণী নয়, সে নাচে, ঘুরে ঘুরে গান গায়। সে অদ্বৈত মিশ্রের অহেতুক ডাটফাটকে থোড়াই কেয়ার করে। সে গঙ্গার কথা বলে, সে শুদ্ধতা চায়। তবু আমরা নানান ধরনের নিয়মনীতি ঐতিহ্যপ্রেম দেখি, বাহ্যজ্ঞানে হতচকিত হই। আর মাধালী (ঘিংড়ু কিস্কুর ছেলে মাধালী কিস্কু — জাতে শবরী, যারা সাঁওতালের একটা তস্যশাখা হয়ত — ধর্মে যে নাকি দেশজ খ্রিষ্টান), আহা, স্বপ্নের ঘোরে থাকা সহজ-সৌন্দর্যের মানবসত্তা, সে যে থাকে জীবনের প্রকৃত সত্য খোঁজার বাসনায়।

আমরা এখানে পাঠ করি ইংরেজ প্রযোজিত কোম্পানি আমলকে। কিন্তু লেখকের বর্ণনার স্পষ্ট প্রবহমানতা; তাতে ঘটনা, বা রূপবিন্যাস একটা জায়গায় আটকে থাকেনি। তা উত্তর-উপনিবেশেরও যেন সন্ধান দিতে থাকে। তাতে মানুষের জীবনের বিকাশ থাকে। আমরা কতভাবেই না নিজেদেরকেও খানিক দেখে নিতে পারি। আমরা কালপ্রভাবী লেখকের কাছে নত হতে বাধ্য হই। তাঁকে স্মরণ করি। একে আমাদের সহযোগী করে রাখি। তবে কমলকুমার সনাতন ধর্মীয় অনুষঙ্গকে স্মরণে রেখেই তাঁর গল্প আগপিছ করেন। এটা তাঁর শৈলী, পাঠককে সেই ধর্মীয় প্রেমে জব্দ করা তাঁর কাজ নয়। এখানেই কমলকুমার সময়কে জয় করতে থাকেন।

এর ভাষার মোহনীয় দাপটকে আলাদা মর্যাদা দিয়ে বিচার করতে হবে। কত সহজে যে তিনি অল্প কথায় জীবনের একেবারে তীব্র-তীক্ষ্ণ গভীরে চলে যেতে পারেন, তার কোনো হিসাব করা যাবে না। বাক্য তার ক্রমশ লম্বা হচ্ছে এখানে, গল্পের চেহারা বদলে যাচ্ছে, তবে তৎসম শব্দ, ক্রিয়াবিশেষণ, লৌকিক ঘরানার সমাপিকা ক্রিয়া, অন্বয়ী অব্যয়ের দাপট তখনো তত ব্যাপক হয়নি। উপন্যাস তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

এমনকি খুবই অবাক হওয়ার বিষয় যে তিনি সৃজনশীলতার এক ধারাবাহিক বিন্যাসকে নির্মাণ করতে পেরেছেন। এ উপন্যাসটির অনেককিছু *সুহাসিনীর পমেটমের* সহোদর মনে হবে। *সুহাসিনীর পমেটমের* লখাই, রোমনি, যোহন একাদশী, লখাইয়ের মাকে *শবরীমঙ্গলের* মাধালী, রোমনি, অদ্বৈত মিশ্র, লুহানির সঙ্গে যথাক্রমে তুলনা করাই যায়। এখানে বাড়তি সৌন্দর্য হিসেবে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, টোটেম, ট্যাবু, প্রাকৃতিক ধর্মের প্রতি মানুষের সহজাত টানের এক চমৎকার দিক আছে। ভাষার নবতর শৈলী আমরা দেখি। ডায়লগে সমাজবাস্তবতার যে প্রকাশ আমরা দেখি তা ষাটের দশকে অত জোরালোভাবে ছিলই না। তাঁর সৃজনকর্মে চরিত্র তো থাকেই, তার ভেতরকার মনস্তত্ত্ব থাকে আরো বেশি। তিনি তো বর্ণনা করেন না, যেন জীবনের গভীরে ঢুকে এর রূপ-রস-গন্ধ-বিমর্ষতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান।

শবরীমঙ্গলকেই কমলকুমার মজুমদারের প্রথম উপন্যাস বলে ধরা হয়, এটা আমরা নানাভাবে হয়ত বুঝতেও পারব। তাঁর লেখায় *সুহাসিনীর পমেটম* বা *পিঞ্জরে বসিয়া শুকের* ভাষাগত কিংবা মনোজাগতিক জটিলতা অত জোরালোভাবে না থাকলেও; তাঁর লেখার স্টাইলে একটা বাঁক নেওয়ার বিষয়টি ঠিকই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। ভাষার সেই জটিল ফাঁকফোকর থাকলেও কমলকুমার কিন্তু আলাদা সত্তা হয়ে সদাসর্বদা বিরাজমান। এখানে মূল চরিত্র মাধালী; অন্য সবাই তার ছায়া, মাধালীর চারপাশে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। তারা চরিত্র হতে হতে মাধালীর আশপাশ লাটিমের মতোই ঘুরে। লুহানী, মাকড়ি, সুবাই, অদ্বৈত মিশ্র, মাকড়ি, পাদরি ফিলিপ — এমনকি রোমনিকেও মনে হবে যেন মাধালীকে শান দেওয়ার কাজে ব্যবহার করার কিঞ্চিৎ বিষয় আছে। তবে এই ফাঁকে এটাও বলে নেওয়া দরকার, এখানে লৌকিক জীবনের সহজাত প্রকাশ আছে, স্বাধীনতার তুমুল অনুষঙ্গ আছে, আকাশের কাছে নিজের ঠিকানা দেখার সৃষ্টিযজ্ঞ আছে, তা তো মাধালী এখানে একা করেনি; সকলে মিলেই কাজটি করেছে। বরং নিখুঁতভাবে দেখলে এখানে টের পাওয়া যায়, প্রত্যেকে সহজাত ব্যক্তি, — তবে মাধালীই মুখ্য চরিত্র। ধর্মের কাছে একেবারে পাকাপোক্ত করে নিজেকে বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা লেখক রাখেননি। এমনকি অদ্বৈত মিশ্রও একপর্যায়ে অসহায়ের মতোই মাধালীর আলিঙ্গনে নিজেকে উজাড় করে ছেড়ে দেয়। তার নিজের দিকে যেন খেয়াল দেওয়ার জন্য কমলকুমার তাকে সৃষ্টিই করেননি। ফলে আলাদা কোনো চরিত্র দাঁড়াতেই জানল না; অন্যরা মাধালীর চারপাশে কেবলই ঘুরঘুর করেছে। এ উপন্যাসে তিনটি ছায়া-ছায়া ভাগ দেখা যায়। প্রথম ভাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে পারে মাধালীর সঙ্গে রোমনির মানসিক-জৈবিক বিষয়-আশয়, দ্বিতীয় ভাগে পড়বে লুহানির সঙ্গে মাধালীর নিগূঢ় সম্পর্ক, শবরীজীবন, এবং মাধালীর সঙ্গে পাদরি ফিলিপ আশ্রিত চার্চ এবং তৃতীয় ভাগে ফেলা যায় মাধালী আশ্রিত খ্রিষ্টীয় বৈরাগ্য ও অন্যসব চরিত্র, — সর্বোপরি জীবনের সহজ অর্থের সন্ধানে মাধালী আর রোমনির প্রাকৃতিক মিলনের ইশারা। এ খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে মাধালী নামের চরিত্রটিতে পাঠক একেবারে শুরু থেকেই যেন একজন জীবনসন্ধানী মানব হিসেবে পাবে। কখনো সে নিতান্ত ই খেয়ালি, কখনো-বা সামাজিক বৌদ্ধ (অথচ গ্রন্থের কোথাও এমন স্পষ্ট ইশারা নেই); বা মনে হবে রামকৃষ্ণকে খোঁজার বাসনাসম্পন্ন একজন ব্যাকুল মানুষ। জীবনকে অতভাবে দেখানো যায় তাহলে? এই ধরনটা আমাদের কথাসাহিত্যে একেবারে নতুন। জীবনকে অত গভীরভাবে দেখানোর পণ করেই নেমেছেন লেখক। মাধালীর চরিত্রে যে একটা সহজাত বিষয় থাকে, বা ধীরে ধীরে চরিত্রটি অর্জন করে, তাতে তার ভেতর যেন নির্বাণের ইঙ্গিত থাকে। ব্রাহ্মণত্বের বাইরে গিয়ে একজন প্রাকৃতিক মানুষের সমাজের ইশারা দেয়, সে যেন সামাজিক বৌদ্ধত্ব লাভ করে।

উপন্যাসে বর্ণিত সেই কালটিও ধর্মপ্রচারের ভিন্নমুখী ডাইমেনশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামন্তপ্রভুরা তখন রাষ্ট্রীয়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বাঙালি মুৎসুদ্দী শ্রেণিটিও ধীরে-ধীরে পুঁজির বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হচ্ছে। তারাও শিল্প চায়; শিল্পপতি হওয়ার খায়েশ জাগতে শুরু করেছে। জমিদারির বিকাশও চায় এরা। ইউরোপিয়ান কালচার বিস্তারে এরা অনেকেই ভীত। ঠাকুর পরিবার সেই সময়েই কলকাতায় শিল্প-সংস্কৃতির অনেকটাই কন্ট্রোল করতে থাকে। তাদের আচারনিষ্ঠা ছিল প্রজাপতি ব্রহ্মের চিন্ময়রূপের অদ্বৈতবাদী জীবনযাপনে বিশ্বাস। এ নিয়মকানুন কলকাতার উচ্চমার্গীয় ফ্যামিলিসমূহে খুব প্রসার ঘটে। তবে এর বড় বদনামটি ছড়ানো হয় যে, এরা খ্রিষ্টীয় ধর্মের নিরাকার ঈশ্বর প্রেমে আসক্ত। তারই বিপরীতে রামকৃষ্ণ তাঁর যত মত তত পথ নিয়ে আসেন। এ প্রাকৃতজনরা আসলে খুবই কাছাকাছি মনে করে নিজেদের। কারণ এখানে আচারনিষ্ঠা বেদ-উপনিষদের কঠিন শৃঙ্খল ধরে চলাচল করার প্রয়োজন নেই। তবে রামকৃষ্ণ প্রকৃতই মহামায়ার ভক্ত। তাঁর মূল কাজটি ছিল সবাইকে এ জায়গাটিতে এনে জড়ো করা। তবে বরাবরই কমলকুমার উপনিবেশ-উত্তর সময়ে উপনিবেশ-পূর্ব জীবনের একটা ইঙ্গিত যেন রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, সৃষ্টিকর্মে তা আছে।

উপন্যাসটির শেষ দিকে মাধালী যেভাবে অদ্বৈতকে জড়িয়ে ধরল, তাতে যেন সে সনাতন যুগের রমণীকুলেরই আনন্দ শিহরণ নিল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

পুরুষোত্তমে রাধারূপের আরেক ধারা যেন এতে জলজ্যান্ত হয়ে উঠল। পাদরি ফিলিপকেই এখানটায় কেন-বা অত গুরুত্ব দেওয়া হলো; আবার সুবাইকে কেন এত নাস্তানাবুদ করা হলো তা কিন্তু বোঝা গেল না। এ তো ইংরেজ-কোম্পানি যুগের সেই আমলের গল্পকথা, যখন এ উপমহাদেশের অনেকেই গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লবণ বিদ্রোহ করছে। কিন্তু এখানে পাঠক এ ধরনের কোনো আমেজই টের পাবে না; এমনকি পাদরিকেও এতটুকু বিচলিত দেখা যায় না। সুবাইকে না হয় কোম্পানি-মুৎসুদ্দী হিসেবে ট্রিট করছে; কিন্তু পাদরি নিয়ে এ কেমন কোমলতা প্রকাশ পায়! আসলে কমলকুমার ধর্মীয় চেতনাকে কখনো সরাসরি প্রশ্নের মুখোমুখি করতে চাননি। কথ্যভাষা প্রয়োগেও তিনি তখনো তেমন উৎসাহী বলে মনে হয় না। কেনে, লেই, বটে ইত্যাদি শব্দরাশি প্রয়োগ করলেই কথ্যভাষার মূল স্পিরিটটা আসে না। তাঁর ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা হতচকিত হয়ে লাজ-নম্রে চলে। অন্যদিকে খ্রিষ্টীয় সোসাইটির জীবন নিয়ে ডিটেইলের কাজও তেমন ব্যাপক কিছু করতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে তিনি হয়ত প্রাকৃতিকই থাকতে চেয়েছেন। তাঁর সৃজিত শিল্পে বারবারই হিন্দু সনাতনঘেঁষা জীবনের চিন্ময়ের অতল থেকে মৃন্ময়কে খোঁজার প্রবণতা চোখে পড়ে। বাবা, হুজুর, ভগবান — এ শব্দগুলো সাঁওতাল খ্রিষ্টান সোসাইটিতে না থাকলেও লেখকের সৃষ্টিশীলতার স্বাধীনতার কাছে এ থাকা না-থাকার প্রশ্ন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। তবে কি কমলকুমার একেবারেই ধর্মীয় জীবনপ্রবাহে সমর্পিত মানুষ? তা মোটেই নয়। তাঁরও স্বাধীন মানবিকতা পাঠক দেখতে পায় নিশ্চয়। রোমনিকে দেখে মাধালী যেভাবে কম্পমান হলো তাতেই যেন উপন্যাসটির হৃৎপিণ্ডটি একেবারে নতুন করে চেনা হলো; তিনিও তা নবতর প্রয়াসে গড়ে নিলেন। এ উপন্যাসেরই একেবারে শেষদিকে সমাজকে যে ধাঁচের ঝাঁকুনিটা দেন তিনি, তাতেই পাঠক আরো এক কমলকুমারকে দেখতে পাবে। এভাবে এটি সমাপনের জন্যই যেন পাঠককে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। শেষদিকে ভালোবাসামুখর সমাপ্তি না-থাকলে এটা কি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারমুখো উপন্যাস হয়ে যেতে পারত? না, তা একেবারেই নয়। বরং জীবনের নানান স্তর, নানান ধরন দেখেটেখে, পাঠক তার নিজস্ব মতামত গ্রহণ করার বিষয়ে অনেক পাঠসৃজনশীলতা পেত। লৌকিক আর বৈঠকি জীবনকে এইভাবে সহজ-সত্যের দিকে নেওয়ার নিপুণ প্রচেষ্টা খুব কম উপন্যাসেই দেখা গেছে।

পুনঃলিখন ০৩.৮.২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঞ্জরে বসিয়া শুককথা

তিনি, কমলকুমার মজুমদার, সাহিত্য-সাধনাকে প্রকাশ করার এক মায়াময় কারিগর বটেন! তিনি তাঁর সৃজিত কথনশিল্পে লোকায়ত আবহ, আধুনিকতা, জাদুময় আনন্দমুখরতার সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি উপন্যাস লিখেছেন আটটি, তবে অনেকেই তাঁর এ উপন্যাস অর্থাৎ *পিঞ্জরে বসিয়া* শুককে জটিল বা দুরূহতম উপন্যাস বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। একটা উপন্যাসের নিয়তি কেন এইভাবে নির্ণয় করা হবে, বা তা করা উচিত কি না তা ভিন্ন তর্ক, তবে আমরা আপাতত এর সরলপাঠেই মন দেবো। কারণ সব পাঠই পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সহজতার একটা জায়গা থাকা দরকার। আমরা এ উপন্যাসটি নানাভাবে আমাদের চৈতন্যে রাখতে পারি। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। উপন্যাসের সামাজিক শরীরে যে দারুণ কাব্যিক প্রাণ থাকতে পারে তা এটি পড়তে থাকলে মনে হতে পারে। পাঠের প্রচণ্ড নিমগ্নতা এটি দাবি করতেই পারে। এই যে কাব্যিকতা আর পাঠনিমগ্নতা, এ দুটি কর্মযজ্ঞের যথার্থতা আমরা আরো দু-একটি উপন্যাসের নাম করতে পারি, — অমিয়ভূষণের *ফ্রাইডে আইল্যান্ড*, *নরমাংস ভক্ষণ* এবং *তাহার পর*, দেবেশ রায়ের *তিস্তাপুরাণ*, ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো*, সৈয়দ শামসুল হকের *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী*, শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*, মামুন হুসাইনের *হাসপাতাল বঙ্গানুবাদ* ইত্যাদি। প্রথমেই আমরা এর মায়ার জগৎ নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের পরিচিত ব্যাকরণ নিয়ে কথা বলব। কর্তারূপ মায়ার জগতে পড়ে কতভাবে বাঙালিয়ানার রূপ নেয়, কতভাবে সংস্কৃত ছেড়ে, উপনিবেশের মায়া ছেড়ে আমাদের মাটির জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তা দেখব। কারণ রবিঠাকুর আর বঙ্কিমআশ্রিত বাংলা আমাদেরকে কৃত্রিমভাবে হলেও উপনিবেশের ঘেরাওয়ের ভেতর রেখে দিয়েছে, — তা যাচাই করতে চাইব। সরল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল, আর যৌগিক বাক্যের নিজস্ব চেহারা দেখব।

কমলকুমারকে আমাদের কথনশিল্পের এক অতি প্রয়োজনীয় কথাকার বলতে তো কোনো দ্বিধা নেই। যদি বলি তাঁর কথনে কিছু হয়; এমনকি তাঁর সৃজিত শিল্পে কিছু হয় তো তা হয়ই বলে রায় দিতেই হয়। আর যদি বলে দেওয়া না-হয় না-হয়, তাহলে কি না হয়ই? এই যে শিল্পত্ব নির্মাণের নানান পথ — তার আগাপাছতলা কে নির্ধারণ করবে? আসলে কমলকুমারের উপন্যাস পড়া মানেই সময়, সংস্কৃতি, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে একভাবে না একভাবে বোঝাপড়া করে নেওয়া। তবে আমরা স্মরণ করব, তিনি সমকালকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ঔপনিবেশিক মনোকামনা নিয়ে তিনি উত্তর-উপনিবেশকে গোছাতে চেয়েছেন। এটা একটা প্রশ্ন বটে, তাঁকে চিহ্নিতকরণের একটা আবহ এর ভেতর দিয়ে পাওয়া যেতেই পারে। বা, আমরা বিষয়টিকে আলাদা করে দেখে নিতে চাইব। এতে মনের কোনো এক তলে যেন কাঁপন বয়ে যাবার মতন হয়, সেই কাঁপনের সমাহারে শৈল্পিক লীলা হয়। মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির ভেতর আলাদা এক দ্রোহের জন্ম দেয়। এক হিসাবে মনে হতে পারে, কমল পাঠের প্রয়োজন কী? তিনি সাহিত্যের শরিয়ত মারফত হকিকত তরিকত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন না। তাঁর কোনো সাহিত্যিক ধারাও নেই। তাঁকে পাঠ না করেও তো হরহামেশাই নান্দনিক চর্চা হচ্ছে। তাহলে কারো কারো কাছে তাঁকে জানা-শোনা-বোঝা যে অবশ্য-কর্তব্য বলে ধারণা রাখতে চান, তা কেন? এর মূল কারণ লোকায়ত সংস্কৃতিকে জানা, আভিজাত্যমুখর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরব বোঝাপড়া করে নেওয়ারই শামিল তা। তিনি শিল্পের জগতে আলাদা এক ঈশ্বরত্ব কায়েম করতে সমর্থ হচ্ছেন। আসুন পাঠকসকল, তার এ স্বোপার্জিত রূপকে জানি, এরই ভেতর দিয়ে আমরা একধরনের বন্দনা রচনা করি।

তিনি, কমলকুমার মজুমদার, যদি শুধুই হন অন্য এক প্রতিষ্ঠান, জটিলতম বাক্যের ধারক, রামকৃষ্ণীয় ভাবের কাণ্ডারি কিংবা ভাষাগত নৈরাজ্যের চালক, কিংবা লেখকদের লেখক, তবে ধরে নিতে হবে তাঁকে একঘরে করার চিকন-রাজনীতি আছে তাতে। প্রতিষ্ঠান অলওয়েজ প্রতিভাকে কাজে লাগায়, বাণিজ্য বসতিতে তাই ওস্তাদ। বাক্যের জটিলত্বের আগামাথা কিছুই নাকি তার পাওয়া যায় না। আর ভাষিক নৈরাজ্য বলে তার কাঁধকে মূলত খাটোই করা হয়। নৈরাজ্য এক চলিষ্ণু প্রতিভাময়তার নামও হতে পারে, যা সমাজ-রাষ্ট্রের ইতরামিকে তার প্রতিভাবলে নাকচ করতে পারে, কমল সেটা করেওছেন। অন্যকথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে, লেখকের লেখক বলে কিছু থাকে না। জমিদারের জমিদার থাকতে পারে, কিন্তু লেখক এক সার্বভৌম সত্তার নাম, সেখানে কাউকে কর দেওয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। যাই হোক, এবার কমলসাহিত্য, বিশেষত তাঁর এ উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

কথাসাহিত্যের জটিল বাক্যবিন্যাসকে শিল্পচৈতন্যের একধরনের মান ধরলে, এর জনক হতে পারেন কমলকুমার মজুমদার। বাংলা কথাসাহিত্যের জটিলতম লেখক হিসেবে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের নামটিই বলতে চাইবেন। এটা সত্যি, তাঁর লেখা পড়তে-পড়তে বোঝার জন্যও মেধাময় অতিরিক্ত পরিচর্চার প্রয়োজন। তিনি যে ৩০টির মতো গল্প আর আটটি উপন্যাস লিখেই কথাসাহিত্যে এমন জটিলতার আয়োজন করলেন; এসব শিল্পের নামে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতার ফসল কি না এমন কথাবার্তাও শোনা যায়। এর জন্য আলাদা কোনো শিল্পসাধনার প্রয়োজন ছিল কি না বা তাঁর সাহিত্য সাধনা কি শতাব্দী প্রাচীনতার গৌরব নিতে পারবে? নাকি এসব হেঁয়ালিতে ভরপুর!

পিঞ্জরে বসিয়া শুকের আরম্ভটি খুবই চমৎকার। আমরা উপন্যাসটির নামকরণ থেকেই একধরনের ল্যাবিরিন্থ লক্ষ করি, যেন কর্তা, বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে এখানে ঘটক-কর্তা বা কর্তাবাচ্যই মুখ্য নয়, লুপ্ত ক্রিয়াই যেন উপন্যাসটির অন্তর্জগতে বিরাজ করছে। আমরা জানতে চাই, পিঞ্জরে বসিয়া শুক কী করে? একটা কিছু তো করে? কিছু না করে তো কর্ম হয় না। সে কি কাঁদে, হাহাকার করে, হাসে, নাকি রক্তাক্ত হতে হতে কিছু খোঁজে? একটা প্রশ্ন, ভাবমূলক একটা ক্রিয়া আমাদের মনোজগতে ঘুরপাক খায়। আমরা স্থির হতে পারি না। কারণ এর নামকরণই অত প্রভাববিস্তারী যে আমরা এর একটা হেস্ত না করে ছাড়তে পারি না। আমরা ক্রমশ দেহের জগৎ ছেড়ে, কায়ার জগৎ ত্যাগ করে মায়ার জগৎ খুঁজতে চাই। আমরা অদ্ভুত এক রহস্যের ভেতর পড়ি। আমরা তা থেকে উদ্ধারও পেতে চাই। তাই তো এমনই এক কাব্যমুখর ব্যবস্থার মুখোমুখি হই। শুক এক পাখি, আমাদের কল্পজগতের, রহস্যের, আরো নির্দিষ্ট করে বললে রূপকথার এক চরিত্র, যে চরিত্র এখানে মানবিক কর্তানির্ভর হয়ে তার মায়া ছড়ায়। আমরা সেই মায়ার কাঙাল হওয়ার কথা ভাবি। কারণ আমরা তো এর বাইরে থাকতে পারি না। তা আমরা পারি না, কারণ আমরা অবশেষে মায়ার জগতে ফিরে আসি, সেই মায়া আসলে সৃজন করেন একজন কমলকুমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম বাক্যটি আমরা পাঠ করি, — 'তখনই যে সময়ে সুঘরাই হারাইয়া যায় এই দিব্যমাল্য সাজানো, ভাস্বর, হীরক-শোভাতে বিনিদ্র শহরে — ইহা শিবপুরী, ভক্ত ও মুক্তি প্রদায়িনী যাহা, সৌন্দর্য যাহা, যে শহর, তখনই সে আপনকার সীমা বুঝিয়া তীব্র আতান্তরে পড়িয়াছিল; যে তাহার শেষ অঙ্গলিশীর্ষতেই ও অন্য প্রত্যাঙ্গাদিতে যে ইহার পর হইতেই এবং বনস্থলী চমকপ্রদ হইয়া রয়ে, যে ইহার পর হইতেই দীপের জ্যোতির্ময়ী ঘটনার প্রবাহ। যে ইহার পর হইতেই আমি, হায়! আমি নারসিসস্-রে পথিক করিয়াছি।'

এ জটিল বাক্যটি নিয়ে নানাভাবে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। কিংবা তা না-ও করতে পারি। আমরা একাডেমিক বিশ্লেষণে নামতে পারি। এইসব পারা/না-পারা আমাদের মানবিক সচলতার অংশ। আমরা ধরে নেব, এখানে একটা সময়কে তিনি চিহ্নিত করতে চাইছেন, সেই চাওয়াটাকে প্রথমত তিনি মহিমান্বিত বা উদযাপন করতে চান। আমি বরং উদযাপন শব্দটিকেই বেছে নিলাম। অতি সরলভাবে তিনি সেই সময় দিয়ে বাক্যটি শুরু করতে পারতেন। কিন্তু এ গ্রন্থের কোথাও বেকুবমার্কা সহজতা নাই। তিনি এমন সহজতাকে পরিহার করেছেন, যেখানে কাব্যিক এক জটিল মায়া প্রকাশ পায়। এই চিহ্ন ব্যবহার অথবা পরিহার করা, তাও বাক্যের নিগূঢ় কাব্যিকতা সহায়ক হয়। এত এত বিরামচিহ্নের ভিড়ে আমাদের চেনাজানা চিহ্ন পরিহারও করেছেন। যেমন, বাক্যের শুরুর 'যায়' এর পর একটা কমা তার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তা তিনি করেননি! তাতে বাক্যটির ভেতর, পদবন্ধের ভেতর, এমনকি শব্দের ভেতর একধরনের ব্যাকুলতা সৃজিত হয়েছে। তিনি চিত্রকল্পের ভেতর একধরনের মিশ্রিত আবহ তৈরি করতে চেয়েছেন। আমরা ছবির ইমেজ বা চলচ্চিত্র একই সঙ্গে দেখতে পারি। কিন্তু ব্যবহৃত ভাষা তো তা পারে না। শব্দের পর শব্দ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ইমেজ বানাতে হয়। ফলত, কমলকুমারের মনোজগতে একধরনের হাহাকার তৈরি হয়ে ছিল বলে ধারণা করা যায়। এই যে এই বাক্যে 'যে' শব্দটি ছয়বার ব্যবহার করা হলো, তাতে যে এর ব্যবহার খুবই মায়াময় হয়েছে, তার জোরটা বোঝা যাচ্ছে। একধরনের নিরালম্ব 'যে' নামের অব্যয় যে কত রূপে প্রকাশ পেতে পারে, তারই এক প্রকাশ আমরা দেখি। কখনো বিশেষণ, কখনো অনুসর্গ, কখনো অব্যয় রূপে তার মেজাজ প্রকাশ করেছে। উপন্যাসটির সর্বত্র 'যে'-এর আছে বিপুল সমাহার! বিরামচিহ্নের ব্যবহার প্রথাগত নয় এখানে। এমনকি বালক সুঘরাই যে হারিয়ে যায়, শিবমেলার চতুর্দশীতে নিজেকে অসহায় বালকে পরিণত করে, সেখানে জীবনের এক প্রকাশ দেখি, শিব যে প্রাকৃতজনের আপনজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারই স্পষ্ট আবহ তৈরি হতে দেখি। এখানেও প্রথাগত ধর্মের সঙ্গে প্রাকৃতজনের সহজ-বিচরণের একটা দ্বন্দ্ব আছে। তিনি, কমলকুমার, অসহায়তার পক্ষে, সহজ-বস্তুর স্থলে মায়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আলাদা এক সত্য স্থাপন করেছেন। সেই সত্যে শিবই শুধু থাকেননি. কমলকুমারের আরাধ্য রামকৃষ্ণের উপস্থিতি যেন আমরা টের পাই। রামকৃষ্ণ উপন্যাসের এক চরিত্র মনিবের বর্ণনার ভেতর দিয়ে হলেও বালক সুঘরাইয়ের মনোবাসনার আরাধ্য তার সহজ বিচরণ থেকে আন্দাজ করা যায়। এমনকি এখানে সাধুভাষায় বাক্য থাকলেও এর প্রবণতা তো লোকায়ত জীবনের দিকে বাঁক নেওয়া!

আমরা বৈদ্যনাথধাম আর রিখিয়কে আলাদা করতে পারি। শহর আর গ্রামের আবহের পরিবর্তন দেখি। শিবমন্দিরের পাশাপাশি অনেক ঘটনা, অনেক উপঘটনা আসে, জীবনের অনেক রূপ আসে, চরিত্র আসে, — অনেক জৌলুস হয়, শিবযাত্রা হয়, সুঘরাই (সে জাতে হাড়িয়াল ডোম, সে অভাবী, যার স্বভাবে জংলি বৈচিত্র্য আছে) হয়ত বেমানান হয়। পণ্ডিত, পুরোহিত, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, আমরা উনিশ শতকের ভেতর এক বৈদিক ভ্রাম্যমাণতা দেখি। সেই একই ধর্মাচার, রূপভেদ শ্রেণিভেদ প্রত্যক্ষ করি, ধর্মসাধনা দেখি। তাতে আসে সার্কাস পার্টি, মন্দির আরাধনা, শিবগঙ্গার স্নানব্যাকুল পূজারি, দোকানদার, শবযাত্রীদল, ভিখারি, জুয়াড়ি, হিজড়া, যোগী ইত্যাদি মিলে শিবমেলার এক চেহারা, লোক-চরিত্র আমরা দেখি। তাকে আমরা রিখিয়া নামের সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় দেখি, মনিব আর মনিবপত্নী দেখি। তারচেয়ে বড় কথা শুকপাখি দেখি। মায়ার সন্ধান পাই। এটি এমনই এক প্রতীক, মায়া খোঁজার এমনই এক স্বপ্নবাস্তবতা, বা বৈদিক আকাঙ্ক্ষা, যা ক্ষণে ক্ষণে কমলসাহিত্যে পাই। সেখানেই মোহিলী আর বিসরিয়ার বাপের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে। প্রকৃতি আছে। হয়ত প্রকৃতিই তার সাহিত্যপ্রেমের মৌলিক স্থল। আমরা সেই স্থলে গমন করি, ভালোবাসায় নত হই। পাখির সঙ্গে সুঘরাইয়ের নিষ্ঠুর আচরণ দেখি। সুঘরাইকে আমরা তবু ভুলতে পারি না। কারণ সেই এখানকার আসল লোক। একসময় আমাদের এও মনে হতে পারে, সুঘরাই আসলে এমন এক চরিত্র, যার ভেতর সবারই এক মিলন ঘটেছে। রামকৃষ্ণ যেমন হৃদমন্দিরে মানুষের হাট বসাতেন, বা তাঁর লৌকিক ইতিবৃত্তের ভেতর দিয়ে তা করেছেন, এখানেও একজন সুঘরাই দেখি, যে আসলে রামকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব, যে আসলে মেকি কিছুই চায় না, তা তার সহ্য হয় না, মানুষের লৌকিক আবহ চায়, এমন এক জীবন চায় যেখানে তার চলাচল, মানুষের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়াই যার মূল সাধনা। রামকৃষ্ণ দশায় যেতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মতো করে ধর্মসাধনা বা জীবনসাধনা করতেন, আনন্দ করতেন, মায়ের রূপের ভেতর যাবতীয় মণিকাঞ্চন দেখতে পছন্দ করতেন, তিনি এমনই প্রণয়ের কথা বলতেন বা দেখাতেন যেখানে মাতৃরূপও তাঁর কাছে অপরিহার্য বিষয় ছিল। আমরা *অন্তর্জলী যাত্রার* বৈজুনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করব না, বা তা হয়ত একেবারে করা যায় না। তবে সুঘরাই তার যৌবনকালে শিবের চণ্ডাল রূপকে ধারণ করে, সংহার মূর্তি ধারণকরত শ্মশানের অতি নিষ্ঠুরতাঘেঁষা মায়া রূপ যে নিবেই না তা কে বলতে পারে? সুঘরাইয়ের ভেতর তো অনেক অনেক বৈজু চাঁড়াল ঘুরঘুর করতে আছে বলে মনে হয়। পাখি আর তার জীবন যেন সমার্থক হয়ে যায় এখানে। তার প্রাণপাখি যেন শুকপাখিতেই বিচরণ করে!

ভক্তি, মুক্তি, জ্যোতির্ময় শিবপুরীর বর্ণনা বেশ কাব্যমুখর, তৃষ্ণামুখর এখানে। মুক্তির আনন্দের ভেতর আধুনিকতার সীমাবদ্ধতাও এখানে লক্ষ করা যায়। যে কারো মনে হতে পারে কমলকুমার সনাতন ধর্মীয় আবেশের প্রতি খুবই সহনশীল। কিন্তু পাঠকের এমনতর মোহ ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বৈরাগ্যসুন্দর সাধক কত হিংস্রভাবে মন্দির নিজেদের দখলে রাখে তাই তিনি দেখান। বর্ণবাদকে তিনি স্পষ্ট করেছেন, সেই মেসেজ পায় পাঠক। এই সাধকদের ধানাই-পানাই তাদের নেশার সময়ও দূরে থাকে না। এ হিংস্রতা বালক সুঘরাইকে হতবাক করতে থাকে। ভারতীয় সনাতন ধর্মের বর্ণ দেখে পাঠক আঁতকে উঠতে পারে।

এ উপন্যাসের কাহিনিও খুব বেশি জটিল বা প্যাঁচালো নয়। যেন কোনো কাহিনির কাছে তিনি দায়বদ্ধ নন, আলাদা এক শিল্পসৌন্দর্য দর্শন করানোতেই তাঁর একান্ত ভাবনা বিস্তৃত করছেন তিনি। শিবমেলায় হারিয়ে যাওয়া বালক সুঘরাই খেয়াল-খুশিমতো মানুষজন, তীর্থযাত্রী, মেলা দেখে। মনিব আর মনিবপত্নী তাকে নিয়ে উদ্বিগ্নও হয়। তারাও খোঁজেন তাকে। অবশেষে একসময় সে বিসরিয়ার বাপের সঙ্গে মনিবের বাড়ি ফিরে আসে। শুকপাখিটাকে মেলায় না নেওয়ার দুঃখও থাকে। একসময় পাখিটার বিশ্রী ঘা হয় এবং মরেও যায়। রাগে-দুঃখে পাখিটাকে সে দূরে নিক্ষেপ করে। এর ভেতরে তিনি মিথাশ্রিত মহাকাব্যিক ঢঙের জাদু বিস্তার করেন। খাঁচায় আটকে থাকা পাখি যেন শোষণ-পীড়নে আটকে থাকা স্বাধীন মানুষের বাঁচার প্রতীক। প্রাকৃতজনের শিবকে তিনি তাঁর ভাষাশৈলীর গুণে পাঠকের একেবারে সামনে হাজির করেন। ভণ্ডধার্মিকের রোষে পড়ে সুঘরাইও। নিজেকে এসব থেকে আড়ালে রাখার জন্য ঠাকুরদের ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিবপত্নীর চরিত্রটি তিনি চমৎকার দক্ষতায় এঁকেছেন। যে-কোনো পাঠকেরই মনে হতে পারে, সুঘরাই নামের হড়িয়াল ডোমের প্রতি তার মায়ামমতা বোধ হয় অপরিসীম; তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আসলে তো তাকে মানুষের কাতারেই গণ্য করেন না তিনি। মানুষজাতিতে ৯৪ লক্ষ মনুষ্য অণুজাতি আছে বলে বাউলিয়ানা ধাঁচের ভেদতত্ত্ব তাই বলে। এর ভেতর ৯০ লক্ষ জাতি আছে প্রকৃত মানবজাতির; বাদবাকিরা নীচকুলের। তারা পাপ-যোনিজাত। যারা প্রকৃতপক্ষে পশুকুলের। সুঘরাই এমনই একজন। শুকপাখিটাও এমনই কিছু।

তিনি যেন পাঠককে সেই মানুষ আর পক্ষীকুলের ভেতর একটা মনোজাগতিক সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টাতেও নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। এ সম্পর্ক যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানবজাতির ভেতর কেবলই ঘুরপাক খায়। সুঘরাই পাখিটাকে নিজের জীবনের অংশ করেই ভালোবাসে। কিন্তু তার আঙুল কেটে রক্ত বের হলে পাখিটার কোনো প্রতিক্রিয়া তো দেখাই যায় না; বরঞ্চ পাখিটি চেটে-চেটে তার সেই রক্ত খেতে থাকে। রাগটা তখনই সুঘরাইয়ের খুব হয়; পাখিটাকে আছাড় মারে। কিন্তু পাখি কি আর মনের স্নেহ বোঝে? পাঠক হয়ত রীতিমতো অবাক হয়। মানুষ কি তাই — অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রায়ত্ত পশু? তা না হলে পাখির কাছে বালকের এ কোন ধরনের আব্দার? নাকি স্নেহ-মমতার কাঙাল সুঘরাই তার জীবনের ভালোবাসার একটু ছোঁয়া পাখিটার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল? তার খাঁচাটা দেখে ডাক্তার পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। সে ফণিমনসার পাতায় ড়াড়ু পোকা খাওয়ায় পাখিটাকে। মরণ-উন্মুখ পাখিটাকে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। সেই নিত্য সঙ্গে রাখা পাখিটার জন্য; একে চিরতরে হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে যায়। এটার মরণদশাও তার সহ্য হয়নি। তার রূপান্তর ঘটে, মনিবের কণ্ঠ তার কণ্ঠে ওঠে আসে। মনিবপত্নীর সাক্ষাৎ পায় নিজের ভাবনায়। এভাবেই কমলকুমার ভিন্নধাঁচের এক জাদুময়তা সৃষ্টি করেন।

পুনঃসৃজন ৪.১.২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গোলাপ সুন্দরী : কথাই যখন গোলাপের সৌন্দর্য

আমরা তাহলে এখন গোলাপের সৌন্দর্যে যাব, গোলাপ সুন্দরীসনে আমাদের ভাবের লেনদেন করব, — আমরা কমলকুমারের *গোলাপ সুন্দরী* পাঠ করব। এ তো আসলে প্রাকৃতিক লীলার সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া করে নেওয়া, যা হয়ত একধরনের ল্যাবিরিন্থ, জাদুময়তা বা মায়ার সঙ্গে নিত্য বসবাস। আমাদের গীতিআখ্যানের কথা, আমরা স্মরণ করব, যা দিয়ে লিটারারি ব্যালাডকে পরখ করাও হতে পারে। তাই *গোলাপ সুন্দরী* নামের উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে বড় দুটি সীমানা আমাদের ক্রস করা লাগে, একটি ফ্ল্যাপের লেখা, অন্যটি এর ভূমিকা। জগতের যাবতীয় গ্রন্থের কথা তো একমাপে বলা যায় না, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ সম্পর্কেও বলা মুশকিল, কারণ তারা প্রকাশনা, প্রচার, প্রসার ইত্যাদির দিক থেকে আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্ন আবহের বলা যায়। প্রায়শই একটা কথা শোনা যায়, ফ্ল্যাপের ওপর আস্থা রাখতে নাই। তা কদ্দূর সত্য-মিথ্যা তা বলা মুশকিল, তবে এই গ্রন্থের ফ্ল্যাপ, *আনন্দবাজার* থেকে প্রকাশিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক লেখা ভূমিকা আর দয়াময়ী মজুমদারের তত্ত্বাবধানও পাঠককে সহজ-সত্য প্রকাশের পথ দেখায়নি। বরং পাঠক তাতে বিভ্রান্তই হবেন। কারণ গোলাপ ফোটানোর সহজ প্রায় স্বর্গীয় প্রেম এখানে নেই। যা আছে তা জীবন, প্রেম, এমনকি বেঁচে থাকার প্রবহমানতা সম্পর্কে বিকল্প এক জীবন-দর্শন। এ যেন মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা, আস্থা, পরম্পরা বজায় রেখে বিকল্প-সত্য নির্মাণের এক কাব্যকথন!

তাহলে আসুন আমরা দেখি, বিলাস নামের এক যুবাপুরুষ, সৌন্দর্যের এক আধার সম্পর্কে যেটুকু বলেছেন, অর্থাৎ ও টিবি স্যানিটারিয়াম থেকে রিলিজ পেয়ে নিরালা জায়গায় যাবার পর বিশেষ গোলাপ ফোটায় — যাতে নির্দিষ্ট নারী এলে পর তাকে ভালোবাসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা মুখ ফুটে বলতে হয় না, তা বলা হয়ে যায়। এমনই এক সরল ভালোবাসার কথা আছে তাতে। কিন্তু জীবনের নিগূঢ় সত্য প্রকাশের কথা না হয় নাই বললাম, মূল কাহিনিও এমনটি নয়। বরং সুনীলবাবু তার সরলবোধে যা বুঝেছেন তা দিয়ে পাঠককে একটা ঘোরের ভেতর হয়ত রাখতে চেয়েছেন। তাতে গ্রন্থটির ওপর একধরনের অনাচারই করা হয়েছে। এটা আলাদা করে বলে নিতে হচ্ছে, কারণ এমন সরল হিসাব *গোলাপ সুন্দরী* নামের অদ্ভুত গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠকের অতি সহজিয়া বাণিজ্যিক ধারণা চালু আছে।

আমরা এ উপন্যাসের অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে কথা বলতে পারি। কারণ তিনি, কমলকুমার মজুমদার, উপন্যাসটির অঙ্গ সাজিয়েছেন গোলাপের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতরকার ক্রন্দন দিয়ে। এটিই হয়ত এর নিয়তি। আমরা ক্রমে ক্রমে কিছু চরিত্র দেখি, তাদের চলাচল বুঝি, টিবি স্যানিটারিয়ামের জীবন দেখি, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দিশাও দেখি। সবই ক্রমে ক্রমে নিজের মতো করে ঘটমান বর্তমান হতে পারত, কিন্তু উপন্যাসের নানান পরত, আধুনিকতার নবতর বিকাশ, স্বদেশি যুগের নীরব তবে স্পষ্ট জীবন দেখতে পাই। তবে তা এমনই সাংকেতিকতামুখর যে আমরা নিজেরাই তা নির্ণয় করতে গিয়েও হতচকিত হই। পাঠকের সৃজনশীলতা দিয়ে নানান জগতে বিচরণ করি। আমরা সকালের আলোকদীপ্ত বুদ্বুদসকলের ভ্রাম্যমাণতার বিষয় দেখি। কারণ তা থেকে আমরা মুক্তজীবনের স্পর্শ পাই যেন। নতুবা সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদের এমন বিচরণ কেন দেখব। আমরা এক বালক দেখি, যে আসলে গাড়ির ফুটবোর্ডের ওপর বসে অ্যানামেলের বাটির সাবান-জল দিয়ে বুদ্বুদ নির্মাণ করেই চলছে। তার ক্রিয়াতে সকালের রং বদলায়, টিবি স্যানিটারিয়াম থেকে বিলাসের রিলিজ নেওয়ার বিষয়টি আমরা দেখি। এখানে ডাক্তার রঙ্গস্বামী আছেন, আছেন বিলাসের ভগ্নিপতি মোহিত, তাদের কথার ভেতর দিয়ে ওমি অর্থাৎ বিলাসের দিদির কথা আমরা শুনি। বিলাস এই গাড়িতে করেই এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবে। আমরা সেই সময়কার টিবি রোগীর চিকিৎসার বিষয়টা পরখ করি, ইংরেজ-প্রশাসন কর্তৃক একটা শৃঙ্খলার বিষয়সমূহ বুঝতে পারি। তাদের প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত কীভাবে বদলে যাচ্ছে, নিজেদের ভেতর সাহেব-সাহেব ভাবটি নিয়ে আসতে চাইছে তা বুঝতে পারি। তাদের ভাষা বদলে যাচ্ছে, আচরণে পরিবর্তন ঘটছে।

বিলাসের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি পরিবর্তনকামী, তাতে টিবি রোগীর রুগ্‌ণ বরফচাপা রং যেমন আছে, সম-প্রেমের ছোঁয়ায় তাতে রক্তের ছিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে দেখি, ডাক্তার রঙ্গস্বামীর আচরণের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের মোহময়তা লক্ষ করি, তার দিদির জন্য ব্যাকুলতা বুঝি। এমনকি চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করার প্রবণতা আমরা বুঝতে পারি। ডাক্তার রঙ্গস্বামী বিলাসকে নানাবিধ উপদেশ দেয়, তার চিকিৎসার ব্যাপারে ওমির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে তা জানান। তিনি দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ বলে আমরা জানতে পারি। আমরা এও জেনে নিই যে মোহিত দারুণ স্টাইলিশ। আমরা এমনই এক মেকি পরিস্থিতিতে একজন কমলকুমারকে নিজস্ব ধারায় হাজির হতে দেখি, আমরা এমন এক বিলাসকে দেখি, যেন সে অসহায় মানুষ, যেন সে সাঁওতাল রমণীরা যেমন নিজেদের বিক্রি করার জন্য ঠেকায় পড়ে হাটে বসে থাকে, বিলাসও তেমন অসহায় ভাব নিয়ে তাদের সঙ্গে সময় পার করে। আমরা এমন এক চরিত্র পাই, যার সঙ্গে *অন্তর্জলী যাত্রার* বৈজু, *পিঞ্জরে বসিয়া* শুকের সুঘরাই, কিংবা *সুহাসিনীর পমেটমের* লখাইয়ের সহযাত্রী মনে করতে পারি। তবে বিলাস তার শ্রেণিচৈতন্যে বা অবস্থানগত কারণে অচিরেই তার বাবুচরিত্র ফিরে পায়, স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়ার জন্য শলা-পরামর্শ করে। এখানকার চেট্টির কথা মনে পড়তে থাকে; একধরনের জৈবিক তাড়নার বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি। অতি দক্ষতায় লেখক তাদের মনোপীড়নের কথা জানাতে থাকেন। কথনশিল্পের চমৎকারসনে আমরা নিজেদের জারিত করতে বাধ্য হই। নাপিত, ড্রাইভার, বিভিন্ন রোগীর বিষয়সমূহ আমরা দেখি। একটা টোটাল পরিবেশ অতি স্বল্পবচনে লেখক আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমরা গল্পের সাংকেতিকতায় একটা উপন্যাসের মহান জগতে নিজেদের নিমজ্জন করতে থাকি। আমরা এমন এক জগতের নাগাল পাই, যা কমলকুমারবিনে আর কেউ দিতে পারেন না। আমরা একজন স্বোপার্জিত ঈশ্বরের কাছে আমাদের চেতনার নানান রূপ শান দিতে পারি। আমরা হতবাকই হই। আমরা তার সারথি হওয়ার বাসনা করতেই পারি। তাতে একটা গোলাপের কথা আছে, তার ক্রন্দন আছে, সেই ক্রন্দনের ভেতর ভালোবাসার মহান জগৎ আছে। আমরা এখানে মানে বিলাসের আবাসস্থলে ভূষণকে দেখি, তার কর্তৃক বিলাসকে সেবার কথা শুনি। আমরা অচিরেই একটা মৃত্যুর কথা জানি। তার বউ মারা যায়। এ যেন জীবন্মৃত। তাকে জলকাদার ভেতর দিয়ে, রাতের অন্ধকারে শ্মশানে নেওয়া হয়। মৃত্যুর সঘন স্পর্শের ভেতর দিয়ে, বৃষ্টির ফোঁটার ভেতর একটা মানুষ দাহ হতে দেখি। আমরা ক্রমশ মৃত্যুর গন্ধের ভেতর ঢুকি। আবারো গোলাপের ক্রন্দনের ভেতর দিয়ে জীবনের সৌন্দর্যও দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপ চাষ হয় তথায়। একজন মনিক চ্যাটার্জীর আগমন দেখি, তার মা ছিল পাগল, তাকে এখানকার প্রায় সবাই চেনে। কাজেই তাকে আমরা কোনো ল্যাবিরিন্থ বা গল্পের চরিত্র, স্বপ্নবাস্তবতার কিছু মনে করতে পারি না। সে চলে গেলেও আবার আসে। সে আসে অপার সৌন্দর্য নিয়ে। গোলাপের সৌন্দর্যের কাছে সে আসে। এ গোলাপ ফুটেছে, কাজেই তাকে হাতে নিলেই গোলাপ সুন্দরী তার মনের কথা বলতে পারবে। তাকে আর নতুন করে ভাবতে হবে না। তার মনের কথা এমনিতেই বের হবে। আমরা গোলাপের কথা জানি, যেন তা স্বল্পায়ু জীবনের অনন্ত সুপ্তি। বিলাস গোলাপ সুন্দরীকে অভ্যর্থনা জানায়। তারা পরস্পর চিনে নেয়। কথা হয়, দেহের কথাও হয়, — তারা কথাদেহ সৃজন করে। যৌনতার মুক্তির এক অবারিত পরশ আমরা হয়ত অনুভব করি। আমরা এই জৈবিকতাকে স্মরণ করি। তারা অতঃপর পরস্পর অপার্থিব কণ্ঠস্বর শোনে যেন, সূক্ষ্ম দেহে তারা দিব্য কম্পন অনুভব করে। ভালোবাসার চমৎকার সব বিন্যাস আমরা দেখি, মানুষ কর্তৃক মানুষের রূপ-রস-গন্ধ তথা জীবনের সার্বিক আবিষ্কারের বিষয় আমরা বুঝতে পারি। একে অন্যের সুমধুর আনন্দধারা নিঃশেষ করার কথা জানতে পারি। যেন তারা পরস্পর শুষে নেওয়ার লীলায় থাকে। তখনো আমরা জগজ্জননী মার কথা বিস্মৃত হই না। তারা বজ্রাহতের মতো একসময় আলাদাও হয়। কিন্তু তারা কি আসলেই আলাদা হয়? তা হয় না।

আমরা পরবর্তী সময়ে দেখি, বিলাস আবারো টিভি স্যানিটারিয়ামে যায়। সেখানে দেখি তার জীবন ক্ষয়ে যেতে। সে সেখানেই গোলাপ সুন্দরীর পত্র পায়। আমরা তার মৃত-সংবাদ শুনি, একটা বাচ্চা রেখে যাওয়ার কথা জানতে পারি। বিলাসও মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু জীবন তো থেকেই গেল। তাতে হয়ত গোলাপের সৌন্দর্য আছে, আছে ক্রন্দনও। আমরা এইভাবেই নিগূঢ় লাল আর কালোর, সৌন্দর্যপিপাসা আর ক্রন্দনের নানান রূপ দেখি। আমরা ক্রমে আলাদা এক প্রাকৃতিক জগতে প্রবেশ করি। আমরা সৌন্দর্যপানে যাই। কারণ কমলকুমার আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থাই রেখেছেন।

এ তো ছোট্ট আয়তনে জীবনবিন্যাসের অপরূপ জাদুকরী খেলা যেন। ভাষার জাদু আছে, ভাষাশৈলীতে তত জটিল তখনো তিনি হন নাই। সাধারণ বর্তমানের ভেতরই নিত্যবৃত্ত অতীত, পুরাঘটিত বর্তমানের ক্রিয়ারূপ বারবার মিশেছে। জীবনের বহুমাত্রিক গদ্যছন্দ যেন বারবার চমকিত করে আমাদের। *অন্তর্জলী যাত্রার* পূর্বে যে বড়গল্প ঘরানায় লেখা উপন্যাসখানা বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে, জনপ্রিয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতে পারে, তা হচ্ছে তাঁর লেখা *গোলাপ সুন্দরী*। এর ভাষাই শুধু জটিলতার দিকে অগ্রসরমান নয়, অন্তর্গত সৌন্দর্য অতি চমৎকার। কমলকুমারের সৌন্দর্যব্যাকুলতা এখানে অসাধারণরূপে পাঠককে রীতিমতো চমকে দেয়। তার আগে কেউ খেয়ালও করতে চাননি তাঁর লেখাও পাঠকনন্দিত হতে পারে। এও যেন আরেক কমলকুমার। এভাবেই তিনি অনবরত নিজেকে ভাঙেন, ফের নিজেকে সাজানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পুরো উপন্যাসটাতেই কাব্যময়তার অনাবিল স্রোত পাঠককে প্রত্যক্ষ করতে হয়; যদিও এ উপন্যাসের শেষদিকে কোনো সচেতন পাঠক রবীন্দ্রকাব্যময়তার গন্ধ পেতে পারেন। বিলাসের টিবি স্যানিটারিয়ামে থাকা, একসময় ডিসচার্জ নেওয়া, নির্জন ফুলবাগে ফিরে আসা, ভীষণ অবাক হওয়ার মতো গোলাপ ফোটানো, সেই নারীর জন্য অপেক্ষা এবং সেই নারীরও বিভিন্ন সময়ে আগমন, সবই যেন অচিন কোনো মোহের তীব্রতায় ঘটতে থাকে। ঘটনার স্বপ্নময়তায় আটকে পড়ে পাঠক বারবার আচানক কায়দায় নিজেকে যেন ঝালাই করে নেন। এর শুরুতেই যে দৃশ্যময়তা তিনি আঁকতে থাকেন তাতেই ধরে নিতে হয় এটি আর দশটা লেখার মতো হতে পারে না। এভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য বুনে যাওয়ার অপূর্ব সিনসিয়ারিটি আর মেধা আর কোথাও চোখে পড়ে না। তাঁর লেখার থিম নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি-তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রতীক প্রয়োগ, চিত্রকল্পের বুনন, ডিটেইলের কাজ; এককথায় এসবের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পেরেছেন বলে মনেই হবে না। কমলকুমার এখানে পাঠককে রামকৃষ্ণঘেঁষা সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছেন। গোলাপ ফোটানোর পরিকল্পনা, চরিত্রসমূহের মনোজাগতিক চেতনাপ্রবাহ নিস্তেজ বাংলাপাঠককে রীতিমতো চমকে দেয়। এমনটি আর কোথাও কেউ দেখেছে বলে খুব একটা মনে পড়ে না। এ যেন আরেক মাইলফলক। এ উপন্যাসটির সময়কাল স্বদেশি আন্দোলনেরই সময়; কিন্তু রাজনীতির সেই ধারা তেমন করে কোথাও আসেনি। তিনি যেন খুঁড়ে-খুঁড়ে প্রেমময় এক সৌন্দর্যে অবগাহন করার জন্য আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন। মনিক চ্যাটার্জী একসময় আসে সেই অতি আশ্চর্য গোলাপের জন্য; সে হয় জলরং তারও পর ভাস্কর্য। বিলাসের মৃত্যুকেও এভাবেই পাঠককে পৃথক দ্যোতনা দিতে পারে। এখানে হিন্দুপূজকের মানসিকতা কাজ করার তেমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিতেও তেমন জোরালোভাবে কারো মনে পড়ার কোনো কারণ নেই। সবচেয়ে বড় বিষয় এ লেখাটিতে আছে হীরার ঝলক, ক্ষণে-ক্ষণে ঘর্ষণে এর জ্যোতি বাড়ে। এভাবে এটি একটি অপূর্ব লেখা হয়ে বাংলা উপন্যাস ভুবনে তার জায়গাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরস্থায়ী করে ফেলে।

গোলাপের স্বোপার্জিত মুহূর্ত এখানে উদ্ভাসিত হয়। এমন এক এলাকা, যা কমলকুমার বলেন, এখানে নিজেকে পরিষ্কার দেখা যায়। গল্প আর উপন্যাস আয়তনে ভাগ করে দিতে চাইলেও এ উপন্যাসই। উপমার চমৎকারিত্ব আছে, নিঃসঙ্গতা এখানে এক সত্য। এ গল্প কার্যত জীবনসৌন্দর্যের প্রতীক। তিনি ভাষার উদ্ভট বা নৈরাজ্যিক অবস্থায় এখানে নেই। তবে এ বলতে হয়, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে একজন কমলকুমারের কাইজা-ফ্যাসাদ থাকবেই। তিনি জটিল-কঠিন অবস্থার ভেতর ভাষাকে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর ভাবের জায়গাটা তো আমরা ভুলতে পারি না। তিনি বঙ্কিমে থাকেননি, রবিঠাকুরে তো নয়ই, মানিকের মতো মানুষের সহজাত যন্ত্রণা দেখেন, কিন্তু তাঁর ভাষা বা ভাবের কাছে থাকেননি। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে কলোনিয়াল ভাবধারাকে কদ্দূর বহন করেছেন বা তাতে অবগাহন করেছেন তা দেখার বিষয়। তবে তাঁর আসল জায়গাটা ছিল রামকৃষ্ণের সহজাত ভাবের জায়গা। তিনি ক্রমশ ভাষিক জটিলতায় ডুবেছেন, কিন্তু তাঁর ভাবের আসল স্পিরিট মাটিঘেঁষা। অতি সহজাতকে জীবনের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। এখানে তিনি গোলাপের সৌন্দর্যের কাছে, বিলাসের সহজাত ভাবনার কাছে, গোলাপ সুন্দরীর হাহাকারের কাছে গিয়েছেন; তাও প্রাকৃতিক সহজ-জীবনকে ছুঁয়ে থাকার মানসিকতা থেকেই। তাঁকে আমরা সেইভাবে দেখব। এবং তা চলতে থাকবে। কারণ আমরা তাঁর অপার সৌন্দর্যপানে বারবার ছুটে যাব।

৯.১.২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ারও যে জন্মান্তর হয়!

কমলকুমার মজুমদারের লেখায় মায়া যেমন আছে, আছে জন্মান্তরের এক অতিকথন। আছে সৌন্দর্য আর জীবনের নানান রূপ-অরূপের কথা। নিজস্ব ভাষা আছে আর আছে থিম। তাঁর *শ্যাম-নৌকা* নামের উপন্যাসটি যখন আমরা পাঠ করতে শুরু করি, তখনই এর আয়তন দ্বারা আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। কারণ আমরা একেবারে এক কথায় বলে দিতে পারি না, একে আমরা উপন্যাস বলব কি না। এমন এক হাড় জিরজিরে রচনাকে কেন উপন্যাস বলব, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করি। আমরা দ্বিধায় থাকি, আমরা হতচকিত হই। এরই ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের পাঠক্রিয়া চালিয়ে যাই। তবে এ তো সত্য যে মাত্র ২০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির ভেতর আমরা ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের মালমশল্লা পেতে থাকি। বরং বলা যায়, এত স্বল্পায়তনে যা পাওয়া গেল, তা এক ঘটনা বটে। দীনবন্ধু শব্দটি উপন্যাসের শুরুতেই আছে, যা এখানে বন্দনার মতোই এসেছে। তুমি দীনবন্ধু নামে গল্পের এক আবহ আমরা পাই। এ প্রার্থনা যেন জন্মান্তরের এক ইশারা বটে। কথা এখানে ইশারা, জীবন এক ইশারা, পেয়ে পেয়ে অনেককিছুই হারানোও যেন ইশারা। এক হিসেবে এখানে ইশারার ভেতর দিয়ে একধরনের রোদনমুখরতা আমরা পাই। আমরা জীবনের গন্ধের ভেতর থাকতে থাকি।

এখানে চরিত্র বেশি নেই, বড়জোর ৪-৫টা চরিত্র, সবাই একজন মৃত্যুমুখী মানুষকে বাঁচানোর তাগিদ থেকে ক্রমাগত নিজেদের ভেতর ঘুরপাক খায়। কালাচাঁদের বাবাকে বাঁচানোর জন্য দুকড়ি আর রসকে-মা ওরফে রসিকের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দেখি। এ যে জীবনের প্রতি এক পরম লীলার নাম। কালাচাঁদের নামটাও এখানে প্রতীকী আবেদন হয়ে আছে। এ বালক যেন জীবনের নিগূঢ় প্রার্থনার ভেতর দিয়ে বারবার ঘুরেঘুরে আসছে। কালাচাঁদের মা আরেকটা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে ঘনঘোর বর্ষণের রাতে ডাক্তারবিহীন অবস্থায় ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা যায়। মাতৃহীন কালাচাঁদের বাবার চরম অসুখ, কাশির সঙ্গে রক্ত যায়। অনেক অনেক দুর্বল সে। তাকে বাঁচানোর জন্য কালাচাঁদের বন্ধু দুকড়ি আর রসকে-মা একটা মহিষ অপহরণ করে। রসকে-মা ওরফে রসিকের ভেতর মেয়েলী ভাব আছে। ওর মা চণ্ডী শাস্ত্রীয় যাত্রাপালায় নাচে, অভিনয় করে, মেয়েলী রূপের ভেতর থাকে। তার মা তাদের ছেড়ে চলে গেছে। সে এখন আনপুরুষ করে। সে যে কোথায় কোথায় থাকে তা হয়ত ভগবানই জানেন। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, দেহ দেয়। কোনো রকমে জীবন চালায়। নেশায় থাকে, হাতে সিগ্রেট, পুরুষ নিয়ে তার কারবার। আড়ালে আড়ালে রসিককে অনেকেই রসকে-মা বলে। সে দারুণ মোহিনীমায়া রাখে। গোলাপ সুন্দরীসম তার মুখমণ্ডল। সে জিভে সেনসেন রাখে। মুখ সে রাঙায়। সে ভাসানের গানও গায় — মানুষকে রাঙাতে জানে। দুকড়ি ব্রাহ্মণজাত হলেও শীতল মুখুজ্জে তাকে সম্মান করে না। সেও নানান লীলার ভেতর দিয়ে, কখনো অভিনয় করে জীবন চালায়। মহিষ অপহরণ করে অনেকদূর আসার পর সে কালাচাঁদ আর রসকে-মার সঙ্গে দেখা করে। রসিকই কালাচাঁদের বাবাকে দেখানোর জন্য মফস্বলের এক ডাক্তারের ঠিকানা দেয়। এ জন্যই মহিষের পিঠে চড়িয়ে কালাচাঁদ তার বাবাকে ডাক্তারখানার দিকে নিতে থাকে। একসময় মহিষকে বেঁধে নৌকাযোগে বাবাকে হাসপাতালের দিকে নিতে থাকে। অবারিত গঙ্গার দিকে তারা একসময় চলে। এত বড় গঙ্গা পাড়ি দেবে, কিন্তু মাঝির নাগাল তারা পায় না। কালাচাঁদই তাকে নৌকা সহযোগে ডাক্তারের খোঁজে যায়। একসময় ডাক্তারের নাগাল পায় কালাচাঁদ। ডাক্তার এসে রোগীকে দেখে, চেক করে। যত্ন সহকারেই ডাক্তার রোগীকে দেখে। তখন ডাক্তার জানান যে রোগীর মৃত্যু অবধারিত, কাজেই তাকে হাসপাতালে রাখা যাবে না। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তার। কিন্তু কালাচাঁদের মন তো মানে না। সে বাবাকে কলকাতায় চিকিৎসা করানোর কথা ভাবে। পথে আবার সে জুয়াড়ির খপ্পরে পড়ে। এক পর্যায়ে জুয়া খেলতে খেলতে ৪০ টাকা আসার মতো অবস্থা হয়। কিন্তু জুয়ার লোকটা হঠাৎই সব টাকা লোপাট করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কালাচাঁদ তাদেরকে দৌড়ে ধরতে গিয়ে সাঁকো থেকে গাঙের জলে পড়ে যায়; কয়েকজন মিলে তাকে উদ্ধার করে। একসময় কালাচাঁদ তার বাবার কাছে আসে। বাবা তখন দারুণ ক্ষুধার কথা বলে। তারা ঝগড়া করে। বাবা ছেলেকে বেদম লাথি মারে। তাতে বাবা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবা নিজেকে কলকাতায় নিতে নিষেধ করে। বড় নৌকার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে বেঁধে দিতে বলে। একপর্যায়ে বাবা মারাই যায়। কালাচাঁদ তাকে নৌকায় ভাসিয়ে দেয়। এ যেন জীবনের এক রূপান্তর দেখি আমরা।

উপন্যাসটির বর্ণনার ধরন দারুণ চমৎকার। বর্ণনা তো নয়, যেন লোকায়ত জীবনের নানান চিহ্ন দিয়ে এক জগৎ তৈরি হতে দেখি। আমরা যে জীবন পাই, শব্দের যে গাঁথুনি আমরা দেখি, তাতে কমলকুমারের নিজস্ব চরিত্র যেন দেদীপ্যমান হয়। তিনি যে বর্ণনা দেন, তাতে অন্য উপন্যাসের সঙ্গে এর মেলবন্ধনও আমরা দেখি। বাংলা সাহিত্যে বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসার চিত্র আমরা খুব বেশি দেখি না। মাতৃবন্দনা বাংলাসাহিত্যে বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কমলকুমার এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। *অনিলা স্মরণে* নামের উপন্যাসে কন্যা কর্তৃক বাবার প্রতি প্রেম একেবারে চমৎকার আবহ সহযোগে আছে। এ উপন্যাসেও দরিদ্র কালাচাঁদ কর্তৃক বাবার প্রতি যে মমতা, যে মোহ আমরা প্রকাশ পেতে দেখি, তা এক অনন্য ব্যাপার। আবার সৌন্দর্যপ্রকাশের বিষয়টাও এখানে দারুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে, রসকে-মার চরিত্র এক চমৎকার রমণীয় আবহ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সামান্য পরিমাণে হলেও *সুহাসিনীর পমেটমের* সৌন্দর্য যেন তাতে দেখি। এখানে মা গঙ্গার যে রূপ আমরা দেখি তাতে *অন্তর্জলী যাত্রার* শ্মশান আর গঙ্গাতীর আমাদের মনোজগতে আসা-যাওয়া করে। মায়ার এক বাঁধন আমরা কালাচাঁদের বাবাকে বিসর্জনের ভেতর দেখি, এখানেও *অন্তর্জলী যাত্রার* বৃদ্ধ সীতারামের জীবনপাতের ইশারা পাই। অন্যদিকে, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* নামের উপন্যাসে শিবমেলার যে আবহ আছে, সনাতন ধর্মীয় মায়ার বন্দন আছে, এই উপন্যাসেও ধর্মের আবহ আছে। শিশুরূপের প্রতি মমতা আছে। সব মিলিয়ে এক-একটা রূপ যেন একটা উপন্যাসের ভেতর দিয়ে মিলিত রূপের এক-একটা ছায়া-মায়া রেখে যাচ্ছে। জগৎ সৌন্দর্যমুখর, মায়ায় ভরপুর, হাহাকারেরও প্রতিরূপ যেন। এভাবেই রূপের, মায়ার, বন্ধনের অনেক অনেক রূপ আমরা পাই।

আমরা স্বল্পায়নের উপন্যাসও একেবারে কম পড়িনি। *শ্যাম-নৌকাকে* আমরা গল্প বলতে চেয়েও পারি না, কারণ তাতে উপন্যাসের আয়োজন আছে, আছে হৃদয়-মন। এমনকি কথিত উপন্যাসের কথিত চরিত্রবিন্যাসও আছে। জীবনের অনেক তল যে আছে তাতে কোনো ওজর-আপত্তি নেই। তাই ২০ পৃষ্ঠার এ আখ্যানকে উপন্যাসই বলব। আয়তনের দিক থেকে *শ্যাম-নৌকা গোলাপ সুন্দরীর* সহযাত্রী। আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যশৈলীর দিক থেকে একে *সুহাসিনীর পমেটমের* সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। এর বাক্যসমূহই শুধু নিজস্ব ঢঙে দীর্ঘ করা হয়নি, বাক্যের গঠন, যতিচিহ্নের ব্যবহার ভিন্ন রকমের। আহা, আমাদের ভিন্নতা চিররূপী হোক। আমরা সেই ভিন্নতার কাছে নতমুখী হই। কত যে সত্য তিনি নির্মাণ করেছেন! এও সত্যি যে, কমলকুমার তাঁর উপন্যাসসমূহের জন্য আলাদা-আলাদা জায়গা-জমিন আর কাঠামোগত বিস্তৃতি রাখেন। তবে তাদের ভেতর আবার প্রীতিও আছে। নিজেদের ভেতর একধরনের যোগাযোগ রাখে। আমাদের কারো কারো এখানে মনে হতে পারে তিনি কালাচাঁদ, দুকড়ি, রসিক ওরফে রসকে আর কালাচাঁদের বাবাটাকে ঘিরে একটা লোকায়ত জাদুর মোহিনী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা তাতে নিমজ্জিত হচ্ছি। এমনকি হতচকিতও হচ্ছি হয়ত-বা। তাঁর সৃজিত সব সত্য তো আমরা চিনি না। আবার এমনও মনে হতে পারে তাঁর কাজটা হচ্ছে সনাতন ধর্মের ধারণাকে আবারো পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসার প্রকাশও এতে তীব্রভাবেই আছে। বাবারা বাংলা সাহিত্যে অনেক বেশি অবহেলিত, দ্বিধান্বিত। তিনি তাদেরকে একপেশে ভালোবাসা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। বেচারা বাবাদের জন্য খানিক খানিক মায়া তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। মহিষ চুরিকরত কালাচাঁদ তার বাবাকে তাতে চড়িয়ে চিকিৎসার জন্য যাত্রা করে। এবং এইসবকে ঘিরেই *শ্যাম-নৌকার* গল্পও চালু থাকে। ভাববিগ্রহের এক জাদুকরী নেশা শ্যামরূপী ছায়ায় ছায়ায় তাতে বাড়ে। আমরা ক্রমশ তাতে রূপান্বিত হই। আমাদের কত যে দায়, আমরা নিজেরাও কতভাবে যে চিহ্নিত হই। আমরা ক্রমশ লৌকিক সত্তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি। এখানে প্রথমদিকে রসিক আর দুকড়িকে ঘিরে কালাচাঁদের মতো কুলীন ব্রাহ্মণ যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাতে শেষের দিকের কালাচাঁদের বাবার মৃত্যুর যন্ত্রণাময় সৌন্দর্য একেবারেই আলাদা। একটার সঙ্গে অন্যটার যেন কোনো মিলই নেই। আসলে এটুকুর সঙ্গে মিলমিশটি পাঠক দেখবে *শ্যাম-নৌকার* সঙ্গে কঠিন শৃঙ্খলিত মৃত্যুর লোকায়ত ধাঁচ থেকেই।

এ উপন্যাসের অন্যতম দিক, মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর-অবিনাশী প্রচেষ্টা। পাঠককে সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে ক্রমাগত পরিচিতি করান লেখক। পরাজিত না হওয়ার চমৎকার মানবিক চেতনার ভেতর কাজ করেই আমরা নিজেদেরকে শান দিই। কমলকুমার অত্যন্ত কাব্যময়তায়, অত্যন্ত নিজের ভঙ্গিমায় সেসব আঁকতে থাকেন। অতি কম আয়তনের এ উপন্যাসটির প্রধান নান্দনিকতা হচ্ছে এর ভাষাসৌকর্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য ভাষার যে স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে দেখা যায় তাতে কারো কারো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন কিংবা কারো বা বঙ্কিমের ভাষামাধুর্যের কথা মনে স্মরণ হতে পারে। তবে এখানে ফরাসির ঢঙে, কখনো-বা ইংরেজি আদলে তিনি তাঁর ভাষাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছেন। কমলকুমারের ভাষার যে জটিলতা এখানে আছে তাকে কষ্টার্জিত বলা যাবে না নিশ্চয়ই। তাঁর এ নিপুণতা তিনি পুরো উপন্যাসটিতে দেখাতে পেরেছেন।

চরিত্রের নামকরণেও আমরা বিশেষত্ব দেখি। এই যেমন, কালাচাঁদের কথাই ধরা যাক। আমরা এখানে একজন কেষ্টকে দেখি। যার ভেতর এ সময়ের একজন কেষ্ঠঠাকুর যেন প্রতিভাত হচ্ছে। আমরা একজন লৌকিক কৃষ্ণকেই প্রত্যক্ষ করি, যার স্রষ্টা কমলকুমার। কৃষ্ণের প্রতি দরদ বা মমতা বঙ্কিমেরও ছিল। তবে সেই কৃষ্ণ যত না রক্তমাংসের মানুষ, তারচেয়ে বেশি সনাতন ধর্মীয় এক আবহের নাম। এখানকার কৃষ্ণ ননি চুরি করে না, তার কোনো কংসবধ পালা নাই, সে সখিসনে লীলা করে না। বরং সে বাবাকে বাঁচানোর জন্য মহিষ অপহরণ করে, জুয়া খেলে, ডাক্তারসনে কাকুতিমিনতি করে। রসিক আর দুকড়িসনে লৌকিক জীবনের কথনে মত্ত হয়। তার জীবন এ সমাজ থেকে নেওয়া এক সত্তা যেন। তার ভেতর খানিক রামকৃষ্ণের সর্বসত্তাপ্রেম আছে, কেশব সেনের নবপ্রাণ আন্দোলনের সর্বপ্রাণীর প্রতি তেষ্টা আছে। জীবনের সহজ-সত্যসনে বেঁচে থাকার আকুল নিবেদন আছে। একজন কমলকুমারের জীবন কথন অধিক মর্মগুণে গুণান্বিত হয়ে আছে। দুকড়ি আর রসকে-মাও অতি জীবনমুখর তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ দুই চরিত্র। জীবনকে চেখে-চেখে দেখার, নিবিড়ভাবে ভালোবাসার এক তুখোড় প্রেরণা লালন করে কালাচাঁদের বাবা। আবারো বলতে হয়, ডাক্তার যখন বাবারূপী রোগীটাকে গঙ্গাতীরে নৌকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়ে দেন মৃত্যু অবধারিত এবং হাসপাতালেও ভর্তি করাতে চান না; কারণ মৃত্যু যেখানে অচিরেই আসছে এবং ডেডবডি ডোম বা নীচুজাতের মানুষজন স্পর্শ করবে। একজন ব্রাহ্মণের এমন আচার-নিষ্ঠার ধরনে ডাক্তারের আপত্তি আছে। এখানে খুব কৌশলেই জীবনের বহুবিধ ইতিবাচক দিকও প্রচণ্ড সাংকেতিকতায় নিয়ে আসেন তিনি। কমলকুমারের ভাবনা বারবার দোলায়িত হতে হতে হয়ত নানান রূপে বিচরণ করেছে; এ উপন্যাসটি পাঠান্তে অন্তত কারো কারো এমন মনে হতেও পারে। একটা নির্দিষ্ট ধারণায় তিনি স্থির হয়ে থাকেননি; কারণ সব চরিত্রকে তিনি নিজের মতো করে ঈশ্বরত্ব দিতে চেয়েছেন। যে গঙ্গায় তিনি শূন্যতা দেখছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল, সেখানেই কালাচাঁদের বাবাকে পরম আত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় নির্দ্বিধায় একাকী ত্যাগ করছে কালাচাঁদ। আসলে কমলকুমারের ভেতর লোকায়ত জীবনের প্রতি স্বাধীন ভাবনা যেমন আছে, রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদী মৃন্ময় ঘরানার পৌরাণিক জীবনবিন্যাস তার যাবতীয় সৃজনশীল মেধাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

শ্যাম-নৌকা যেন জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি এক সেতুবন্ধন। এর একটা প্রাণভোমরা আছে, সেই ভোমরার সাথিও আছে। সেই সাথির নাম করতে গেলে *অন্তর্জলী যাত্রার* কথাও বলতে হয়। আত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মার নানান বিচরণ এখানে আছে। আমরা এই লেখায় লক্ষ করব যে কাঁলাচাদের বাবার আত্মা যেন পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ব্যাকুলতাই শেষতক লালন করছে। তাই তো জীবনতরী *শ্যাম-নৌকার* আশ্রয়প্রার্থী হয়। বৈরাগ্য-জীবনতৃষ্ণায় সাগরের উদ্দেশে তার নৌকা চলতে শুরু করে। এক স্বপ্নবাস্তবতার মুখোমুখি হই আমরা। এসবের মিলিত স্রোতের ভেতর এক কুহক যেন নিশিপক্ষীর মতোই বয়ে বেড়ায়। এতে আছে ভাব, ভাবের শরীর ঘেঁষে বেড়ে ওঠা ভাববিগ্রহ।

কালাচাঁদের বাপটা বিনা চিকিৎসায় নাকে-মুখে রক্ত ওঠে, কাশিতে, শ্বাসকষ্টে, দুর্বলতায় একসময় মরেই যায়। তাকেই ভাসিয়ে দেয় *শ্যাম-নৌকা*, এ নৌকা শেষতক সাগরে গিয়ে মিশবে। এখানে কমলকুমারের সংস্কারপিপাসু মনের সন্ধান পাওয়া যায়! এমন এক চেহারা বা চৈতন্য তিনি লালন করেন, যার মূলে আছে মানবলীলা। নিজের একটা সত্যের কাছে নিজেকে যেমন রেখেছেন, তাঁর পাঠককেও সেই কূলে নিতে চেয়েছেন। আমরা হয়ত বুঝতে চাইব বা দেখব যে আত্মাই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা প্রক্রিয়া পাঠক অনুভব করবে। জীবন যেন এভাবেই ক্ষণে-ক্ষণে রূপান্তরিত হচ্ছে, প্রিয়জনকে নৌকারূপী ভিন্নযাত্রায় পার করে দিয়ে আরেক জীবনবদলের অপেক্ষা। ছোট্ট এ উপন্যাসটি যেন লোকায়ত ভাবনাতরঙ্গের এক মাধুর্যমণ্ডিত জীবনের তৃষ্ণার্তবিন্যাস।

মৃত্যুর আলাদা রূপ বা ধরন এখানে নির্দিষ্ট হয়েছে। বরং বলা যায়, মৃত্যুর দিকে মানবের যাত্রায় এর মূল ভাবচেতনা। আমরা ক্রমশ এমন চরিত্রের মায়ায় পড়ি। কাঁলাচাদ, তার বৃদ্ধ পিতা, নৌকা, হাসপাতালের দিকে যাত্রার যে অদ্ভুত বর্ণনা, তাই আলাদা এক মুগ্ধ আবেশ রেখে যেতে পারছে। স্ট্রিম অব কনসাসনেসের এক চমৎকার আবহ এতে সৃজিত হয়েছে। এ গল্পে একটা দিন আর দুটি রাত আছে। পাপবোধ, পাপমুক্তি, জীবনমুক্তির নানান দোলাচল চলে এখানে। শেষতক তারা গঞ্জের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালে পৌঁছলেও ডাক্তার জানায় অবধারিত মৃত্যুর কথা। ক্ষুব্ধ কাঁলাচাদ আরো ক্ষুব্ধ হতে হতে নৌকার দিকে ফিরে আসে। বৃদ্ধ বাপটাও ফিরে আসতে চায়। নৌকায় তার মৃত্যু ঘটে। নৌকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় যেন সাগররূপী কোনো এক পরম জীবনের সঙ্গে মিলন হবে। এভাবেই কমলকুমারের সৃজনশীলতায় বারবার মৃত্যু আসে, আর আশার কুহকে কোনো এক অজানা মায়ার দিকে যাত্রা করে।

প্রতিটি নৈতিক লেখকের মতোই তিনিও কোনো না কোনো নৈতিকতার কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। সত্যের চেহারা উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি তো স্থির হয়ে শুধু শুধু লিখে যাওয়ার বান্দা ছিলেন না, কোনো না কোনো নৈতিকতার কাছে, সত্যের কাছে, এমনকি তৎপরতার কাছে তো তাকে যেতেই হবে। কারণ তাঁর লেখায় জীবনের বহু রূপ এত ঠাসাঠাসি করে থাকে যে সত্যের নাগাল তাঁকে পেতেই হবে। এমনই আমার মনে হয়, তাই আমরাও এ সত্যের সন্ধানে নামি, অন্তত তার সত্যটাকে চিহ্নিত করতে চাই। নিজেদের সত্যের সঙ্গে তার পরম্পরা আছে কি না তাও জানতে চাই। তিনি সনাতন ধর্মীয় নানান অনুষঙ্গ দেদারসে ব্যবহার করেছেন। সেসবকে তাঁর নিজের সত্য বলে না-ধরলেও একটা ধারণার ভেতর চরিত্রকে তিনি রাখতে চেয়েছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে, সেই সনাতন ধর্মীয় আবহ সম্পর্কে একটা মোহ থাকতে হবে বলে আমাদের কারো কারো ধারণা। এই উপন্যাসে রামকৃষ্ণের লৌকিকতার কাছে তিনি ঋণী হয়েছেন। তাঁর কাছে নতজানু না হলেও ঋণ তাঁর রামকৃষ্ণের কাছেই। এটা কি দোষের কিছু? এর উত্তর খুব সহজ নয়। এ কাহিনির মাধুর্য আনার জন্য, জীবনের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করার জন্য এর হয়ত দরকার ছিল। কারণ লৌকিক সত্য অত সরল নয়। কমলকুমারের লৌকিকতা তো নয়ই। আমাদের এটা দেখতে হবে, তার আল্টিমেট গোল বা চূড়ান্ত লক্ষ কী! সেখানে তিনি মানুষের সহজ-সত্যকে পূজা করেছেন বলেই আমাদের ধারণা হয়েছে। তা-ছাড়া সনাতন ধর্মকে তিনি জাতীয়তাবাদী চরিত্রে বন্দি করে রাখেননি, একধরনের জৈবিকতা দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক উদারতা দিতে চেয়েছেন। এখানেই কমলের নৈতিকতা প্রকাশের সার্থকতা। শুধু সনাতন ধর্মীয় নয়, এখানে আমরা সেমেটিক ধর্মের নানান আবহ দেখি, বনবিবি, সত্যপীর, মুসলমান গোত্রীয় চরিত্রও দেখি। ফলে, কমলকুমারকে একটা স্থির ধারায় রাখার বিষয়টা পাকাপাকি হিসেবে আমরা নিই না। তাঁকে প্রিজমের মতো নানান কোণ থেকে দেখে নিতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ উপন্যাসেও বিকল্প বাস্তবতা, কল্পবাস্তবতা তৈরি হয়েছে। হয়ত তাতে প্যারালাল বাস্তবতাও আছে। পাঠক অনেক ধরনের সত্য চিনতে চাইতে পারেন। যে কাহিনি, চরিত্র, মানুষের নড়াচড়া দেখলে আমরা তাকে উপন্যাসের সত্য বলি, এখানে তা নেই। এখানেও উপন্যাসের দেশজ রূপ আছে, ইউরোপতা তেমন নেই। এখানেও জনমণ্ডলীর এক রূপ আছে, আলাদা ভাষা আছে, ভাষার কারুকাজ আছে। খানিক স্তব্ধতা, খানিক সচলতা সহযোগে আলাদা এক গদ্য-আখ্যায়িকা আছে, যা আসলে দেশজ রূপ নিয়েছে। এখানেই এ কাহিনির মজাদার দিক। এখানেই শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষার বিস্তারে আমরা নিজস্ব সৌন্দর্যে অবগাহন করতে পারি।

কালাচাঁদ, কালাচাঁদের বাবা, তার মা, রসকে-মা, দুকড়ি ছাড়াও আর কিছু চরিত্র এখানে আছে, যা অনেক বড় জায়গাজুড়ে নেই, কিন্তু উপন্যাসের কাঠামোকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য তারা অপরিহার্য চরিত্র। তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডাক্তার, জুয়াড়ি, শীতল মুখুজ্জে প্রমুখ। তারা উপন্যাসটির মেজাজটি পরিপূর্ণ আদল দেওয়ার কাজে দরকারি চরিত্র বটে।

এ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ পায় *এক্ষণ* নামের সাহিত্য পত্রিকায়। আনন্দবাজার সাহিত্য প্রকাশনী থেকে *উপন্যাস সমগ্র* সঙ্গে এটিও আমরা উপন্যাস হিসেবেই প্রকাশ পেতে দেখি। কার্যত এটি উপন্যাসই।

১২-৮-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়ানো উপন্যাস

অনিলা স্মরণে নামের উপন্যাসে যেন চলমান এক দীর্ঘশ্বাস আছে, যা কখনো ট্রেনের সঙ্গে, কখনো লাবণ্য দেবীর সঙ্গে, আবার কখনো কখনো-বা সারাক্ষণই অনিলাকে ঘিরে থাকে। বাবার প্রতি এত প্রেমও খুব কম উপন্যাসেই আছে। হায়, দীর্ঘশ্বাসময় জীবনের মায়ার খেলা! আমরা এমনই খেলার বাঁধনে আটকা পড়তে পড়তে এটি পাঠ করতে থাকি। আমরা প্রথমেই দেখি লাবণ্য দেবীর নির্ভরতার এক আবহ তাতে আছে। তবে এও হয়ত সত্য যে আমরা শেষ পর্যন্ত তার নির্ভরতার জায়গাটি চিহ্নিত করতে পারি না, কারণ মানুষ স্বয়ং যে কনফিউজিং প্রাণী; যেন সে নিজেকেই নিজে বারবার অতিক্রম করতে চায়। এক ভ্রান্তি, বা বিলাসের জায়গা বারবার পরিবর্তন করে। আমরা লাবণ্য দেবীকে কখনো কন্যার দায়বোধের কাছে, কখনো মৃত স্বামীর স্মৃতির কাছে, কখনো-বা রঞ্জিত চ্যাটার্জীর প্রেমের কাছে সঁপে দিতে দেখি। আমরা শেষ পর্যন্ত অনিলার স্মরণে প্রাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের কাছে যেন নিজেদের আশ্রয় খুঁজি। পাঠকের সৃজনশীলতাকে আমরা স্মরণে রাখতে বাধ্য হই। এমনি নানান স্তর এখানে উন্মোচিত হয়। আবার নতুন পাঠস্মৃতি এসে হয়ত পুরনো স্মৃতিকে ডুবিয়ে দেয়। কমলকুমারের বহুবিধ মায়ায় আমরা হয়ত জারিত হই।

এই উপন্যাসটিতে নির্ভরতা আর অপেক্ষা, প্রেম আর মৃত্যুকে, একেবারে জড়াজড়ি করে রেখেছে। আমরা প্রথমে দেখি লাবণ্য দেবী, যিনি সম্পর্কে অনিলার মা হন, তিনি কিছু প্রক্রিয়ার কাছে নির্ভরশীল হয়ে আছেন। তিনি কেবল অপেক্ষাই করে গেলেন। তার মেয়ে আসছে, যৌবনের কাছাকাছি বয়সের মেয়ে স্কুল থেকে তার কাছে আসছে। তার আছে পিতৃপ্রেম। সেই প্রেম জান্তব আকারে মেয়ের বুকের গহিনে লেগে আছে। মা লাবণ্য দেবী সেখানেও নির্ভরতা খোঁজেন। মেয়েকে তার মানসিকতা থেকে পরিবর্তন করে বর্তমানকে মেনে নেওয়ার অপেক্ষা তার আছে। কিন্তু মেয়ে তার বাবাকে রীতিমতো প্রেম করে। বাবাবিনে যেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে না। বাবা মারা গেছে, অথবা মানসিক যাতনায় তাকে হয়ত হত্যাই করা হয়েছে। কিন্তু মেয়ের কাছে বাবার স্মৃতি একেবারে জ্যান্ত। সে তার বাবার মৃত্যুর জায়গা, শ্মশানের জায়গা দেখতে চায়। তার ভেতরে সেইসব স্মৃতি একেবারে জীবন্ত করে রাখতে চায়। কিন্তু মায়ের আছে প্রেম, অপরে প্রেম। তিনি রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীকে ভালোবাসেন। তাকে এক পর্যায়ে বিয়েও করেন তিনি। কিন্তু মেয়ে তা মেনে নেয় না। বাবার স্থলে মায়ের স্বামী হিসেবে অন্য কাউকে মেনে নিতে সে রাজি নয়। তাই তো একধরনের মোহ তার জাগে। এক পর্যায়ে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীর ভেতর তার বাবার ছায়া যেন সে আবিষ্কার করে। হয়ত তা ভূতের ছায়া হয়ে আসে। কিন্তু তা অবলম্বন করে তো সে বাঁচতে পারে না। অনিলা একপর্যায়ে আত্মহত্যা করে। পৃথিবীর প্রতিও একধরনের অবজ্ঞা দেখায় সে। আসলে সে যেন নিজেকেই নিজের হর্তাকর্তা হিসেবে আবিষ্কার করতে চায়।

এ উপন্যাসেও কাহিনি আছে, কাহিনির সূত্র আছে, তাদের ভেতর আবার পরম্পরাও আছে। এর চরিত্রসমূহ আলাদা করে, কখনো-বা একত্র হয়ে কিছু মেসেজ রাখে, সৌন্দর্য প্রকাশে তৎপর হয়, তারা এমনকি হতচকিত অবস্থায় নানান অবস্থান প্রকাশ করে। তারা সময়ের চেয়ে পেছনের কথা বলে। পুঁজির বিকাশ তাতে দেখি — মধ্যবিত্ত উত্থানের সময় আছে তাতে; আছে উপনিবেশী আবহ। একজন লাবণ্য দেবী হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। তিনি মূলত অপেক্ষা করছেন তার মেয়ের জন্য। সে আসবে। সে একা তো আসবে না, তার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস আছে, জীবনের অনেক কথা আছে, বৈদিক সৌন্দর্যকে প্রকাশের বিষয় আছে। কমলকুমার জীবন তো আঁকেন না যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনবৈচিত্রকে জোড়া লাগান। এমন এক জীবন আমরা দেখি, যা আমাদের কাছে থেকেও কোনো একসময় পর্যন্ত অচেনা ছিল হয়ত, কিন্তু তিনি, কমলকুমার তাঁর তীব্র চাহনিতে এর সবকিছু পরিষ্কার করতে থাকেন। অনেক জীবনের কথকতা নিয়ে একসময় অনিলা আসে। তারা অ্যামিলওয়ার্থ হোটেলে গেলেও, তাদের আদি বাসস্থান শাহানপুর যাওয়ার কথা ভাবলেও, তাদের ভেতর রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জী থাকলেও, এর সবকিছুর ভেতর একজন পিতা, ভালোবাসার এক মানুষ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেন। তিনি গঙ্গাকিশোর। আমরা স্মরণ করতে পারি, কমলকুমার যে জীবন দেখান তাতে গঙ্গা, রামকৃষ্ণ, সমন্বিত চৈতন্য থাকেই। এখানেও নানান কিছুর ভেতর দিয়ে যৌথ-যন্ত্রণা যেন প্রকাশিত হচ্ছেই। তাই তো লাবণ্য দেবীর সঙ্গে একজন রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জী যুক্ত হলেও অনেক বিচিত্র অনুষঙ্গ তাতে যুক্ত হয়। তারা বিয়ে করলেও, তাদের বিষয়ে আরো যেন জীবনের কথা আমরা স্মরণ করতে বাধ্য হই। কাহিনিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন পিতার মৃত্যু, কন্যার আহাজারি, মায়ের অন্য পুরুষে আসক্তি, বিয়ে, স্মৃতিজাগরণ মিলে এক-একটা ঘটনার জন্ম দেয়। এক ঘটনা অন্য ঘটনাকে টেনে আনে। অনিলার বাবার মৃত্যু নিয়েও হয়ত রহস্য থাকে। লাঞ্চ খেতে খেতে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন, একটা রাত পেরোয়, পরদিন সকালে তার মৃত্যু হয়। একটা রহস্য থাকে, সেই রহস্য লাবণ্য দেবী আর রঞ্জিত চ্যাটার্জীর বিয়ের ভেতর দিয়ে নতুন রহস্যের জন্ম দেয়। অনিলা এসব চাপ যেন সইতে পারে না। তার মনোজগতে একটা হাহাকার জন্ম দেয়। সে কেন প্রতিশোধ নিতে চায়, তা আমরা ভাবতে বাধ্য হই। সে তো মাকে খুনিও বলে! এইসব মিলেই হয়ত তার ভেতরে পাগলামিরও জন্ম দেয়। সে আত্মহত্যা করে। অনিলা আর তার জীবনের মধ্যে যেন অনন্ত মরুভূমি দেখা দেয়। এভাবেই একটা চরম রহস্যের ভেতর উপন্যাসটি শেষ হয় না। কিংবা তা শেষ হয় না, আমাদের মনোজগতে নানান অনুষঙ্গ ঘুরে ঘুরে আসে। এইভাবেই স্বল্পায়নের একটা উপন্যাসের ভেতর অনেক ভাবমুখর জীবন ছায়া ফেলে যায়।

এ উপন্যাসেও কমন কিছু বিষয় দেখা যায়। বাবার প্রতি প্রেম, বালিকার ভেতর হঠাৎ সৌন্দর্যের প্রকাশ, মৃত্যুজনিত শোকপ্রণালি যেন কমলকুমারের একটা ধারা হিসেবে এসেছে। একটার সঙ্গে আরেকটার যোগ আছে। *অনিলা স্মরণের* অনিলা আর *শ্যাম-নৌকার* কাঁলাচাদ যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল — তারা পিতৃপ্রেমের এক-এক হাহাকার লালন করে। অনিলার কিশোর-বয়সের সৌন্দর্য যেন *সুহাসিনীর পমেটমের* সুহাসিনীর আরেক মায়া। তাঁর লেখায় মৃত্যুও বারবার আসে। কমলকুমার মৃত্যু আর সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে যেন জীবনের নানান মায়া নির্মাণ করেন। খেলার প্রতিভার ভেতর দিয়ে মৃত্যুর যে সর্বশেষ মায়াময় ছায়া দেখি, তাই তো *অনিলা স্মরণের* গঙ্গাকিশোর, অনিলার ভেতর, *শ্যাম-নৌকার* কালাচাঁদের বাবার ভেতর, *অন্তর্জলী যাত্রার* সীতারাম বা যশোবতীর জীবনপাতের ভেতর বারবার ঘুরেফিরে আসতে দেখি। গঙ্গা তো তাঁর গল্পের, উপন্যাসের, এমনকি ভাবনার বড় জায়গা দখল করে আছে। এ যেন সনাতন জীবনপাতের অতি বৃহৎ এক ছায়ার সাধনা করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণচেতনা তো আছেই। রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ আর গঙ্গা মিলে তাঁর ভাবনার জগতে লৌকিকতার একটা বিশাল মায়া তৈরি করে। তিনি যে সৌন্দর্যের সাধক, তাই যেন এই মেটাফরের মাধ্যমে বারবার আমাদের জানিয়ে দেন।

উপন্যাসটিতে নানান স্তর আমরা লক্ষ করি, — ১. অনিলার ভেতর ভাংচুরের নানান আবহ আছে, ২. আছে লাবণ্য দেবীর ভেতর নিজেকে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় স্থাপনের চেষ্টা, ৩. প্রেমের আলাদা মাত্রা আবিষ্কারের প্রতি লেখকের নবতর ভাবনা আছে, ৪. আছে মানবপ্রেমের সহজাত জৈবিকতা খোঁজার ডেসপারেটনেস। অনিলা তার জগৎ নির্মাণের ব্যাপারে একেবারে আপসহীন। এ কথাটা তার টিচার থেকে শুরু করে, বান্ধবী, এমনকি লাবণ্য দেবীর কথিত বান্ধবীরাও জানেন। তাই তো তাকে পাগল বানানোর প্রচেষ্টাও চালায় করে। কিন্তু অনিলা তার জায়গায় স্থির থাকে। যেন একটা মায়াময় স্পিরিচুয়াল জগতের ভেতর দিয়ে সে তার জগতের চিত্র নির্মাণ করে যায়। রক্তের প্রবহমানতাকে সে অনেক বড় করে দেখে। তাই হয়ত কমলকুমারও দেখেন। রক্তের ধারা ও এর সুফল নিয়ে অনেক কথা বলার পক্ষেই তিনি আছেন। তিনি বংশীয় প্রবহমানতা আর রামকৃষ্ণের বহু চরিত্রের মিলিত রূপের কাছে বারবার ধর্না দেন। অন্যদিকে লাবণ্য দেবী তার স্বামীর স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকার অতিলৌকিক জগতে থাকতে রাজি নন। তিনি যেন বিকাশমান মধ্যচিত্তের লোভকে চেতনায় লালন করতে চান। আধুনিক মধ্যবিত্ত তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তাই তো রঞ্জিত চ্যাটার্জীর প্রেম তার রক্তে খেলা করে। তারা জীবনকে একেবারে মিশিয়ে ফেলে। তারা জীবন আবিষ্কার করে, একে বহন করতে চায়। এটিই জীবন, এটিই হয়ত আধুনিক জৈবিকতার মৌলিক চেহারা।

শাহানপুর আর অ্যামিলওয়ার্থ হোস্টেল এ উপন্যাসের আরেক জীবন যেন। অনিলার স্কুলও এখানে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। অনিলাকে চেনার জন্য এসবের খুবই দরকার আছে। এ হচ্ছে চমৎকার অনুষঙ্গ। এত আধুনিকতা কমলের আর কোনো উপন্যাসে দেখা যায় না। এখানকার বর্ণনাশৈলীও অনেক স্মার্ট, লৌকিকতার বিষয়টা এখানে বৈঠকি আমেজে এসেছে। তাকে আমরা ভিন্ন রূপে পাই। চিহ্নও এখানে আলাদা। অনেক লম্বা বাক্য আছে, ক্রিয়াবিশেষণ, অন্বয়ী ভাব নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে। সমাপিকা ক্রিয়ার প্রতিও এখানে অনেক যত্নবান তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, উপন্যাসের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে ভাষার মেজাজটা বিকশিত হয়েছে।

উপন্যাসটি যেন দীর্ঘশ্বাসের এক নিপুণ আয়োজনের নাম, — তা হতে পারে ভয়, শঙ্কা, প্রেম, হতচকিত অবস্থারও নাম। তবে এর ভাষা, মিথের ব্যবহার, বর্ণনায় বৈঠকি আমেজ, তাঁর অন্য সব উপন্যাস থেকে ডিফরেন্টই বলতে হয়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *দর্পণের* শারদীয় সংখ্যায়। এর চরিত্র অন্যগুলির মতো হলেও এর অন্তর্গত স্বরে আলাদা মেজাজ আছে। এটিতে মৃত্যুভয়, পিতৃপ্রেম, ভালোবাসার প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি আছে মধ্যবিত্তের আগমনী বার্তা। নানাধরনের সত্য তাতে উদ্‌যাপন হতে শুরু করে। নানান দ্বন্দ্বও এর শরীরে লেগে আছে। অনিলার সঙ্গে তার মা লাবণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবীর দ্বন্দ্বই এখানে মুখ্য, তবে সেই মুখ্যতার প্রাণ হচ্ছে অনিলার ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা তার বাবার প্রতি। এখানে কলিকালের মাতৃরূপী দেবীর প্রতিমাও যেন আমরা অবলোকন করি। সেই দেবীত্বে মা মহামায়া যেন ভর করে। তার রক্তপান, ছুটে চলার ছন্দ তাই নির্দেশ করে। লাবণ্য দেবীর সঙ্গে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীর ভালোবাসাও এ উপন্যাসে আরেক প্রাণময়তার দিক। এখানে লাবণী দেবীর ভালোবাসা, তার জীবনের প্রতি মুগ্ধচৈতন্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নির্ভরতার প্রতীক থাকেননি — বরং নিজের জীবনের অদ্ভুত স্বাদে জারিত হয়েছেন। এ গল্প লাবণ্য দেবীকে আবিষ্কারের গল্পও বলা যায়। এমনকি বর্তমানতার সঙ্গে বৈদিক সৌন্দর্যও লেখক যুক্ত করার সাহস দেখিয়েছেন। আমরা এখানে নিমগ্নতার সাংস্কৃতিক ইতিহাস দেখি। শেষ পর্যন্ত অনিলার যে এমন করুণ পরিণতি হবে তা মোটেই যেন আন্দাজ করা যায়নি। স্কুল-পড়ুয়া-মেয়ে অনিলার জন্য হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করে তার মা লাবণ্য দেবী। এরপরই ধীরে-ধীরে ছোট আয়তনের এ উপন্যাসটির প্যাঁচ খুলতে থাকে। গরিবি আয়তনের এ উপন্যাসটি ক্রমে-ক্রমে মানবিক জটিলতার এক চমৎকার আখ্যান হয়ে ওঠে। এটি তাঁর একেবারে প্রথম দিককার রচনা। একে ঠিক উপন্যাস না বলে বড়গল্প বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা কমলকুমারের আরেক উপন্যাস *গোলাপ সুন্দরীর* মতোই হালকা-পাতলাও। এর ভাষাসৌকর্যও তাঁর অন্য যে কোনো উপন্যাসের চেয়ে কিছুটা সহজিয়া ধাঁচের। পাঠককে তাতে পাঠ-ক্রিয়ায় নিমগ্ন রাখে। আমরা ক্রমে ক্রমে জানতে পারি, অনিলার পিতৃবিয়োগ ঘটাতে লাবণ্য দেবী অন্যত্র, রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীকে বিয়ে করেন। এটি যেন লাবণ্য দেবী নিজেকে আবিষ্কারের, সত্য খোঁজার এক প্রচেষ্টা। তার মেয়ে অনিলা যাতে এটি মেনে নেয়, তার জন্য কৌশলও তিনি কম করেন না। এটি আধুনিকতার ফল বলেও জানাতে চান অনিলাকে। তবে এ বিষয়টারও জট খুলে ধীরে-ধীরে। লাবণ্য দেবী যে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জীর গাড়িতে করে তার স্বামীর শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দিকে যায় তখন কারো মনে হতে পারে ইংরেজ আমলের এ কাহিনিতে যেন প্রতীকায়িত সহমরণকেই সাপোর্ট করা হচ্ছে। তবে কিছুক্ষণ পরই রঞ্জিত আর লাবণ্য পরস্পরকে নতুন করে চেনে এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তা নিতান্তই ছেলেখেলা মনে হয়। তবে আমরা এখানে যৌনতার কথা মনে করব, — এ দুজনের শারীরিক সম্পর্কের কথা জানব। আমরা মোহিত হবো। লেখকের জীবনপিপাসার ধরন দেখব। এই উপন্যাস থ্রোতে লেখক নানাবিধ সত্য মোকাবেলা করছেন। সংসারব্যাকুল দ্বন্দ্ব এখানে ম্যালা ডালপালা মেলেছে। আমরা অন্তত তিন ধরনের রিলেশন এবং রিলেশনজনিত ঝামেলা এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করতে থাকি। অনিলার সঙ্গে তার বাবার স্নেহময় প্রেম বা নির্ভরতাই এ গল্পের মৌলস্বর। অনিলা তার ওপর এত নির্ভরশীল যে অন্যসব সম্পর্ক যেন তার পরশে ধুলোয় মিশে যাবে! কিন্তু তা কি হয়। অনিলা তার বাবার ভেতর ঈশ্বরত্ব দেখে, তাতে সে লীন হতে চায়। এমনকি তা প্রতিষ্ঠাকল্পে তার দেহ-মনে নানান লীলার সঞ্চার হয়। যেন দেবী মহামায়া তাকে ভর করে, আলাদা সত্তা রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, রক্তবীজের উন্মাদনা প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তার অকালমৃত্যুই ঘটে। যেন একধরনের শহীদত্ব বরণ করল সে। লাবণ্য দেবীর সঙ্গে রঞ্জিত চ্যাটার্জীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে স্বল্পায়তনের এ উপন্যাসটি আলাদা রূপময়তা পেয়েছে। তাতে চরিত্রেরও বিকাশ ঘটেছে। পাঠক আরেক আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। অনিলার সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কটি হয়ে উঠেছে কখনো কখনো স্পর্শকাতর, কখনো প্রাণকাতর। কথাক্রমে আবারো বলতে হয়, জীবনকে সময়োপযোগী, প্র্যাক্টিক্যাল করার নানাবিধ চেষ্টা লাবণ্য দেবীর ছিল। এমনকি তাতে যে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে, জীবনের আরেক প্রবহমানতা সৃজন হয় তাও বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কলির দেবত্ব যেখানে ভাবে, লীলায়, কামে ভর করেছে সেখানে পাঠক তো লেখকের কাছে বন্দিত্ব বরণ করা ব্যতীত উপায় নেই। এভাবেই কমলকুমার তাঁর একরোখামির কাছে, স্বোপার্জিত আধুনিকতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছেন।

এখানে রামকৃষ্ণকৃত পরমা সুন্দরীকে আবিষ্কারের নেশা আছে। চরিত্রের বিকাশের বিষয়টা এখানে খুবই স্পষ্ট, এর ধারাক্রমও বেশ কৌতূহলের। দীর্ঘবাক্যের নেশা এখানে আছে। এভাবেই অপার্থিব সাধনা আর জীবনবৈরাগ্যের এক মিলন আমরা দেখি। এখানে শরীরবদলের মতো বৈদিক সাহিত্যঘেঁষা অতি চমকও যেন আমরা মুহুর্মুহু প্রত্যক্ষ করি। এমনকি এখানে লাবণ্য দেবীর দেহও নির্মিত হয়েছে। তার একচরিত্র বহুচরিত্রের ব্যবহারের আলাদা রূপ দেখি আমরা। যেন রবিঠাকুরের কবিতার জীবনদেবতা আলাদা এক সংস্করণ হয়ে তিনি জান্তব আর মানবিক আকারে আমাদের হৃদকমলে হাজিরা দেন। তাঁর ভাষার জাদুকরিতা এখানে বড়ই মনোহর। অনিলার বাবা গঙ্গাকিশোরের অতিলৌকিক ক্ষীণছায়াও এখানে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি। এভাবেই তিনি, কমলকুমার, কাব্যময়তার ভেতর অতি চমৎকার নান্দনিকতার স্বাদ দেন, ভাষা দেন, প্রাণপ্রবাহ আবিষ্কার করেন। আমরা ক্ষণে ক্ষণে তার মোহিনী মায়ায়, জীবনের অনেক রূপে, এমনকি জাদুময়তায় নিমগ্ন হই।

২৪-৫-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্য, স্বাধীনতা কিংবা পমেটমকথা

কমলকুমার মজুমদারের লেখায় সৌন্দর্য, লোককথা আর স্বাধীনতা যেন ঝাঁপাঝাঁপি করে থাকে। নিজস্ব ভাষা আর থিমের বিস্তার সেখানে আছে। সৌন্দর্যমুখর, স্বাধীনতাপিপাসু, মায়ার বচনে ভরপুর তাঁর এক উপন্যাসের নাম *সুহাসিনীর পমেটম*। আমরা উক্ত উপন্যাসের সৌন্দর্যসনে যাব, এর অন্তর্জগতের স্বাধীনতা দেখব। তা করতে গিয়ে আমরা একা হয়ে যাব হয়ত। কারণ আমরা স্মরণ করতে পারব না, নিরেট সৌন্দর্যসনে আর কোনো উপন্যাস রচিত হয়েছে কি না! তবে আমরা এও ভুলতে চাই না যে উপন্যাসের সঙ্গে সৌন্দর্যের বা শিল্পসৌকর্যের একটা গা ঘেঁষাঘেঁষি সম্পর্ক থাকেই। মায়া বিনে, ভালোবাসা বিনে, এর অন্তর্গত যন্ত্রণা বিনে তো সাহিত্য হয় না। কারণ সাহিত্য মানেই তো যা মানবের সহিত অবস্থান করে। আর সহিত বা সঙ্গে যা থাকে, তাতে সৌন্দর্য থাকে, সেই সৌন্দর্যের বিজ্ঞান থাকে, থাকে যুক্তি আর নৈতিকতা। আমরা তবে *সুহাসিনীর পমেটম* পাঠে যাই। এটিকে কেউ কেউ বাংলা কথাসাহিত্যের জটিলতম উপন্যাস বলতে চাইছেন, বলতে চাইছেন নিরেট ব্যাকরণহীন উপন্যাস, — একে কেউ হয়ত বলবেন এক নৈরাজ্যিক অবস্থার নাম, বেহুদা প্যাঁচানোর এক লীলাভূমি মাত্র! এইভাবে একে নানাভাবে চিহ্নিত করার বিষয় আছে। এমনতর বিষয় যে আছে তাতে হতবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ঔপন্যাসিক সযত্নে এইসব প্রস্তাবনার ব্যবস্থা রেখেছেন।

আমরা কি এ উপন্যাসের শুধু থিম দেখব, নাকি কাহিনিসনেও মিতালি করব? কাহিনির এত নিরীহ ভাব এখানে আছে যে, তা যেন আমরা স্মরণ না করলেও পারি। বিষয়টা কি অতই সরল? কোনো উপাখ্যান-আয়োজনই তাতে নেই! কেবলই থিমের টসটসা আয়োজন আছে তাতে? কাহিনি কিন্তু এখানেও আছে। তবে এই কাহিনির প্রক্রিয়াটা উপন্যাসের ঐতিহ্যকে ফলো করে না। আসলে এতে কাহিনির মারপ্যাঁচ এত বেশি যে, উপকাহিনির প্রাবল্য এত প্রকট যে, এর ভেতর থেকে একটা রমরমা কাহিনি বের করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশকিলই। তবু এর কাহিনি আমরা খুঁজব। এবং আমরা তা কিন্তু পেয়েও যাব। এই কাহিনির শুরুটা ঠিক করা কিন্তু মুশকিলই, কারণ এটা যেন বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির ঢাকার মতোই অনেক অনেক প্যাঁচানো এক ব্যাপার। ফলত, একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে এর কাহিনি আদায় করা যাবে না। আমরা তবু সুহাসিনীতেই নজর নির্দিষ্ট রাখব। তার পমেটমসনে আমাদের অনেক অনেক বোঝাপড়া হতে পারে। আমরা দেখি যে বালিকা বয়সের সুহাসিনীর কাছে একটা পমেটম আছে। পমেটম হচ্ছে একটা কৌটা, যেখানে একজনকে সুন্দর করে রাখার সামগ্রী রাখা হয়। এই কথাটা স্বয়ং সুহাসিনী তত সাপোর্ট করে না, সে বলে, সে যে সুন্দর তার কারণ হচ্ছে তার কাছে সুন্দর থাকার জাদু আছে। সে এক পোস্টমাস্টারের কন্যা, অয় হচ্ছে সেই মাস্টার। অন্যসব চরিত্রের মতো সেও এই উপন্যাসে অসুস্থ — কালাজ্বর আক্রান্ত। তার বদলে সুহাসিনীই টিকিট বিক্রি করে, টুকটাক কাজ করে। তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু পণের টাকা হিসেবে পনেরো টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্য সে আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে পারে না। সে যেতে চায়, কিন্তু বাবাই টাকাটা দিতে পারে না। এই পনেরো টাকা সেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কালের পনেরো টাকা। ওর স্বামীও কম বয়সের, ১৮ হয়নি। সেও বউকে নিতে চায়, কিন্তু তার বড়ভাই এ বিষয়ে খুব কড়া, সেই লোক টাকাবিনে সুহাসিনীকে ফেরত নেবে না। এমনই হতভাগী সুহাসিনীর সৌন্দর্যের কথা আমরা শুনব। সে রবিবর্মা কর্তৃক অঙ্কিত শকুন্তলার চেয়েও অধিক সুন্দরী। তার রূপের বর্ণনা আমরা একটু শুনি — 'সে আপনকার অতীব শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের খাসা সীম বীজ নাসার বেসর সেখানে ঝুটাপান্না,... যদ্যপি সে অল্পবয়সী তত্রাচ তাহার শরীর বৈভব সুকুমার লাল, পুরুষ অভিমানী'। সে এমনই মীনগন্ধবৈধ বাসনায়, কালিয়া চতুর দেহ সুতপ্ত, — তবু তার যে বরভাগ্য ভালো নয়। স্বামীর বাড়ির লোকজন তাকে বাপের কাছে ফেলে রাখে। সে কাজ করে আর যোহন একাদশীর সঙ্গে কাইজা-ফ্যাসাদ করে। যোহন একাদশী পোস্ট অফিসের পিয়ন, নিতান্তই বুড়ো মানুষ। জাতে দেশজ খ্রিষ্টান, তার বউও তাকে ফেলে চলে গেছে। যোহন একাদশী সারাক্ষণ অয় মাস্টার আর তার কন্যা সুহাসিনীর সঙ্গে ঝগড়া করছেই। তাদের ভেতর খোলা জানালার মতো আছে কিশোর বয়সের লখাই। তার বাপের ঠিক নাই। তারা এসেছে মেদিনীপুর থেকে চব্বিশ পরগনায়। তার মা অনেক কুৎসিত। অপরের বাড়িতে কাজ করে, ধান বিক্রি করে, চুরিদারিও করে, — আর তার ছেলের বিষয়ে বলে যে তার বাবা আসলে ব্রাহ্মণ গোত্রীয়। তার বলার ধরনটা একেবারেই সরল। ফলে, এ নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করে। সামাজিকভাবে সে কোনো মর্যাদাই পায় না। তার এ অবস্থা দেখে যোহন একাদশী বলে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকের কাছে লখাই যেন তাকেই বাপ বলে জানায়, — সে তা বারবার বলে। আসলে লখাই আর তার মাকে সে লজ্জা থেকে বাঁচাতে চায়। এখানে আরো এক চরিত্র হচ্ছে কামিনী দিদি, যার স্বামীকে ব্রিটিশরা স্বদেশি বলে সন্দেহ করে মেরে ফেলে। আছে নাপিত মাখন আর পাখিশিকারি হরিয়াল। যোহন একাদশীরও একটা পাখি আছে। তার শখের ভেতর সে পাখিটাই পালে। সে স্বপ্নও দেখে, তার কাছে মঙ্গলবার রাতে পরী আসে। চাঁদের আলো তখন ফুটফুট করে, চুড়ির আওয়াজ হয়, দরজার হাওয়া খুলে যায়, রূপের বন্যা বয়, আলো আসে! সে যেন পাখিটি নিতেই আসে, নেয় না। অদ্ভুত রোমান্টিক এক আবহ তৈরি হয় তখন। সেই পরীর অপেক্ষা করে, নিজের জাত খ্রিষ্টানত্ব নিয়ে খানিক বাহাদুরিও করে। যিশুর গান গায়; বিজয় পতাকা ওড়ায়। তবে তার এ গানের কথা তার রোমান্টিকতায় বদলে যায়, লখাইয়ের মাকে বিয়ে করতে চায়, সে প্রেম গীতিও গায়। যোহন আসলে দারুণ এক শিল্পিত প্রতীকী চরিত্র। লেখকের সৌন্দর্যের যে বহুকামিতা, মাধুর্যময় রূপকথার বিস্তার যে আছে, যে নিজস্ব নৈতিকতা বা জাদুময়তা লেখক তৈরি করতে চান, যোহন হচ্ছে তারই একটা অনুষঙ্গ। যোহন নিজের খ্রিষ্টানত্ব নিয়ে খানিক তৃপ্ত হয়, কিন্তু তার মনের ভেতর যেন বহুবর্ণিল প্রিজম বসানো, সে সৌন্দর্যের অদ্ভুত এক আধার হয়ে থাকে। লখাইয়ের মা-ই সুহাসিনীর পমেটম চুরি করে, নিজেকে সুন্দর করে, সুন্দর শাড়ি পরে, এক পুরুষের সঙ্গে দেহদানের জন্য চলে যেতে থাকে; যোহন লখাইয়ের মাকে দুষ্টা চরিত্র জেনেও বিয়ে করতে চায়, লখাই-সুহাসিনীর সঙ্গে এক জগৎ তৈরি করে, তাতেই কমলকুমারের সৌন্দর্যের প্রকৃত আকুতি কী তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। এ কাহিনির একেবারে শেষে দেখা যায়, রথের মেলায় যোহনও যায়, কলেরা রোগীর সেবা করে, হারিয়ে যায়, পাখিকে ছেড়ে দেয়, স্বাধীন একটা জীবনের ইঙ্গিত দেয়, পাখিটি মনুষ্যনির্মিত একটা বন্ধনের ভেতর আকাশপানে চলে যেতে থাকে, লখাই তখনো তার জন্মপরিচয় চায়, বামুনের ঔরসে জন্ম বলেই দাবি করতে চায়। হয়ত তা-ই তার রক্তের দাবি, অথবা কিছুই নয়। কারণ লখাই স্বাধীনতাপিপাসু, তাই তো পাখিকে সীমাহীন আকাশে উড়ে যেতে দেখে বলে, ইহা সুন্দর। আমরা পাঠকসমূহ অতঃপর এই সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে চাইব। আমরা নানাভাবে সৌন্দর্য দেখব, নিজেদেরকে আবিষ্কার করব। তদীয় কমলকুমার পাঠককে আবিষ্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন।

সুহাসিনীর পমেটম প্রথম প্রকাশ পায় *কৃত্তিবাসে*; ভাষার জাদুতে, বহুবর্ণিল বিষয়ে, গদ্যশৈলীতে যা একেবারেই ভিন্নমাত্রার উপন্যাস। প্যারাগ্রাফহীন, দাঁড়িহীন এ লেখা লেখককেই যেন ছাড়িয়ে গেছে। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকুল হয়ে ভাবি, আচ্ছা, তাঁর গদ্যে, কথাসাহিত্যের ঘটনায় প্যারাগ্রাফ নাই, দাঁড়ি নাই! এ কেমন ব্যবস্থা? আমরা একে একধরনের সাহিত্যিক-স্বাধীনতা হিসেবেই দেখব। সবই যেন নতুন, তাঁর এই নতুন ভাষাব্যবস্থা আমরা দেশভাগের পরে দেখি। তার গদ্য বঙ্কিমের মতো নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মতোও নয়, প্রমথ চৌধুরীর মতোও নয়, রবিঠাকুরের মতো তো নয়ই, — তাহলে তাঁর গদ্য কার মতো? তাঁর গদ্য কমলকুমারের মতো। এ গদ্য পুনঃসৃজন করা যায় না। তাঁর চিহ্ন, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রয়োগ তাঁর প্রতি প্রণত হয়। এ যেন এ-সময়ের এক মহাকথন। তাহলে তাঁর সৃজিত সময়টা কোন সময়ের? মুক্ত দেশে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আমলের ভেতর সৌন্দর্য সৃজন করতে চাইলেন? তিনি ক্ষণে ক্ষণে পেছনের দিকে কেন গেলেন? উত্তর-উপনিবেশকালে উপনিবেশ-পূর্ব অনুষঙ্গ নিয়ে এত কায়দাকানুন কেন করলেন? তিনি কি ব্রিটিশের নাজেলকৃত ভাষাব্যবস্থাপনাকে হিসাবে আনতে চাইলেন না? তাঁর লৌকিককথন কি রামকৃষ্ণসনে অধিক মিতালি করে? বঙ্কিম আর রবিঠাকুর লালিত প্রমিত ব্যবস্থাপনাকে তিনি যে মানতে চাইতেন না, তা তো সহজেই অনুমেয়। তিনি যে সৌন্দর্য আঁকতে চাইলেন তাতে ব্রিটিশ নাই, গ্রিক মিথোলজি নাই, এমনকি ভারতীয় সনাতন সংস্কার নাই, যা আছে তা হচ্ছে, রামকৃষ্ণ জারিত বাঙাল সংস্কৃতি। তাতে সর্বজীবন একসঙ্গে হওয়ার আকুল তাড়না বোধ করে। আমরা তার *সুহাসিনীর পমেটমে* দেখি যে সনাতন জীবন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তাতে সরাসরি অপদস্থ করার জন্য লখাই আছে, আছে যোহন একাদশী। সুহাসিনী যে দেবতার পক্ষে কথা বলে, তারও জোর নাই, যেন লখাই যে সর্বমানবের স্বাধীন কথনের জয়ধ্বজা উড়াতে চায়, তার এই কথাকেই শান দেয়।

আমরা এবার এর ভাষা নিয়ে কথা বলি। ভাষা একটা ব্যবস্থার নাম, মানুষ তার কথাকে অর্থবহ করে প্রচার করার, মানুষতা কায়েমের একটা ব্যবস্থা করে যায়। মায়ের ভাষা হচ্ছে চলমান নদী, বাঁক নেওয়ার দরকার মনে করলে তা নিজেই করে নেয়। কারো শাসন সে মানে না, বা হিসাবে নেয় না। কিন্তু ভাষার রাজনীতি ভিন্ন জিনিস, তাতে পরিকল্পনা থাকে, নিজেকে বিকাশের ধান্ধা থাকে। ভাষার ভেতর যে সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞান থাকে, তা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষা-পরিকল্পনা একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার নাম। কিন্তু কমলকুমারের ভাষায় সেই ব্যবস্থা নাই। তিনি নিজের বিজয় পতাকা নিজেই উড়াতে চেয়েছেন, তাকে রক্ষাও করতে চেয়েছেন। তিনি একধরনের ভাষিক নৈরাজ্য তৈরি করেছেন। সেটা পজেটিভ অর্থেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁর রীতি তাঁর থাকলেও এর ভেতরকার অনুষঙ্গ আমাদেরকে মুক্ত স্বাধীন রাখতে প্রেরণা জোগায়। এটি পড়তে শুরু করলেই বেশি করে বোঝা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কেন বলেছেন, লেখার ভাষা আর কথার ভাষা এক কেন হবে? তিনি হয়ত মনে করতেন, সৌন্দর্যের দেবী নিজে ভাষার ওপর একটা প্রভাব রেখে যাবেন। এখানকার ভাষাটি তাঁর নিজস্ব হলেও; এর কোলাহলটি ধরতে পারলে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ততা বোঝা যায়। *গোলাপ সুন্দরী* থেকে *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*-এ তিনি পাঠককে একধরনের নৈরাজ্যিক জটিলতায় ঢুকিয়েছেন। কিন্তু এখানকার কাহিনি-জটিলতা ভিন্ন ঘরানার। এখানে তিনি আমাদেরকে অনবরত দৃশ্য দেখান — পাঠকের ক্লান্তিও আসবে বলে মনে হয় না, তবে তাকে ধৈর্য ধরতে হবে; নিজেকে প্রকাশের বা বিকাশের ধৈর্য। যদি আমরা কাহিনির ধাঁচ আর থিমটি ধরে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা দেশজ হবো, বহুমাত্রিক হবো। সনাতন ধর্ম শুধু নয়, মাজার, শিরনি, খ্রিষ্টানত্ব, নষ্টভ্রষ্ট জীবন, নৈরাজ্যবাদ, পাখির নিজস্ব কোলাহল, সৌন্দর্যের তুমুল হট্টগোল তাতে দেখব। আমরা ক্রমে ক্রমে দেখতে থাকব, ধর্ম কী! সবচেয়ে প্রাচীন এই ব্যবস্থাটি কী করে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে যায়। আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আসলে শিল্পের কাজ কী? আমরা কোন ধরনের শিল্পের দুয়ারে যাব, বা যাওয়া দরকার, তাই ভাবব। সৌন্দর্য কি নেশার আস্বাদনেই থাকে? হৃদয়ের তন্ত্রিতে কি এর ছোঁয়া লাগবে না! এখানে তো আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এমনকি লখাইয়ের মা, যে আসলে বৈশিষ্ট্যহীনভাবে এখানে বিরাজ করে, তার জীবনকামনাও আমাদের ভাবায়। আমরা নানাধরনের নৈতিকতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হই। যোহন একাদশীই বা কত স্তর পার হয়ে আমাদের ভালোবাসার সঙ্গে থাকে? অথচ ব্রিটিশ আমলে যেখানে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজরূপী খ্রিষ্টানদের হাতে ভারতীয়রা মরছে, আমরা সেখানে একজন যোহনকে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখি। আমরা এ উপন্যাসের শেষে দেখি যে একটা মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে, কলেরায় প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে, অথচ ইংরেজরা মোটরে আসে, ফুর্তিতে গান গাচ্ছে তখন! তারা নির্লজ্জ, তারা বেহিসেবি, তারা বিদেশি শোষক। এখানেই যেন একজন কমলকুমার আলাদা সত্তা হয়ে উপনিবেশ দেখেন, ইংরেজকে চিহ্নিত করেন। অথচ রবিঠাকুর আর বঙ্কিমরা সর্বদাই ইংরেজকে ভালো আর খারাপে বিভক্ত করছেন। কমলকুমারের কাছে বিষয়টা অনেক রাজনৈতিক। এমনকি কামিনী দিদির স্বামীকে যে ইংরেজরা নির্দয়ভাবে মেরেছে, তাও সুহাসিনী তার পাঠককে জানায়। কমলকুমার সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণ আর মূল্যবোধের একটা হিসাব দাঁড় করাতে চেয়েছেন। পরদেশি-শোষণ সম্পর্কে নিজস্ব একটা মেসেজ তিনি রেখে গেছেন। এখানেই একজন কমলকুমার অনেক স্পষ্ট আর যৌক্তিক। চিন্ময়রূপের ভেতর মৃন্ময়ের একটা আলোছায়া তিনি রেখেছেন; স্পিরিচুয়াল জীবনের প্রতি মায়া রেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীই হয়ত তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে এই কাজটি করাল। সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁর আদর্শ কী তা আমরা অতি সহজে নির্ণয় করতে পারব না। কোন ধরনের আদর্শ আমাদেরকে কীভাবে শান্তি দেয় তা একটা বিষয়! সবই তো ক্ষমতার বিষয়। ধর্ম তার জায়গাটা নিজেই নিজের জন্য রাখতে চায়। কোনো ধর্মই অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না। আবার প্রগতিশীল জীবনব্যবস্থাও মানুষের অনুভূতির মৌলিক চাহিদাকে একধরনের তন্ত্র নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ক্যাডারশিপই যেখানে মুখ্য সৃজনশীলতার স্বচ্ছ কামনা সেখানে তেমন আবেদন রাখতে পারে না। তাই তো একজন কমলকুমারে যে নৈরাজ্যিক প্রগতিশীলতা দেখি, তাই যেন সঠিক মনে হয়। তিনি আসলে বাস্তবের ভেতরই সৌন্দর্য খোঁজেন, জীবনের তাৎপর্য যেন সেখানেই নিহিত আছে! এ জন্য তার হয়ত একটা পরিকল্পনা ছিল, — এত ভিন্ন ভিন্ন জাতপাতময় চরিত্রের সমাহার আর তিনি কোথাও করেননি। এখানে তিনি আরোপিত শাক্ত বৈরাগ্যেও ঢুকেননি। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র যোহন একাদশী। উপন্যাসের লাইটস্পটটি তার ওপরই তাক করা। স্ত্রী পরিত্যক্ত আর অসহায়। ওর স্বপ্নে পরী দেখার বিষয়টিও বেশ চমৎকার। তাকে কখনো মনে হতে পারে মৌলবাদী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এ অবস্থানটি মোটেই থাকেনি। স্বোপার্জিত হাহাকার থেকে মুক্তির জন্যই তার চেনাজানা গির্জায় আশ্রয় নেয়। লখাইকে বাবা ডাকতে বলে; এমনকি খ্রিষ্টান হতেও বলে। আসলে লখাইকে তার জন্ম-পরিচয়ের লজ্জা থেকে, হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর জাতপাতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর জন্যই সে তা করে। লখাইর জন্ম তো ব্রাহ্মণের ঔরসে, নীচুকুলজাত মায়ের গর্ভে। ওর মা আসলে চোর। লখাইও তো নিষ্ঠুরতার ভেতরই বেড়ে ওঠা মানুষ। সমাজে তো তার মানবিক স্বীকৃতিটা পাচ্ছে না। মা-টাও তার যাচ্ছেতাই কুৎসিত। এ জন্য ভগবানের ওপর তার কি অভিমান কম? সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না, গৌরী সাধকের সঙ্গে ভগবানের কেন এত ভাব? কামিনী দিদির ভাতারকে ভগবান কেন অসময়ে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রাখে না? সুহাসিনী বলে অন্যকথা। কামিনী দিদির ভাতারকে নাকি ইংরেজরাই মেরেছে। কারণ সে স্বদেশি সশস্ত্র গ্রুপের লোক ছিল। এমনই লখাই সবুজ ঘাস দেখে পরম মমতায়; পৌরাণিক সৌন্দর্য যেন তার চোখে-মুখে খেয়াল করলেই পাওয়া যায়। সে আবার বিভিন্ন সময় গালিগালাজও করে। এ উপন্যাসে সুহাসিনীর পরিবর্তনটা প্রাচীন দীঘির মতো গভীর। সমাজকেও সে দেখে বড় আচানক কায়দায়। সবকিছুতে তার উদাসীনতাও থাকে। এভাবেই কমলকুমার বিবর্তনশীল মনটাকে আঁকতে থাকেন। একসময় যোহন একাদশীর জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদে। ইংরেজও খ্রিষ্টান; আবার যোহন একাদশীও খ্রিষ্টান। কিন্তু এ দু-দলকে লেখক ভিন্ন ধাঁচেই পাঠককে দেখান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তাঁর লেখায় বঙ্কিমীয়, বিদ্যাসাগরীয় ধোঁয়াটে ভাবটি কিছুটা থাকে। স্বাধীনতার প্রিয় স্লোগান তাঁর কাছে — বন্দে মাতরম। অথচ এটি আর শেষ পর্যন্ত এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একক স্লোগান থাকেনি। কংগ্রেসের হয়ে যায়। এবং এ কংগ্রেস ধীরে ধীরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়। তবে কমলকুমার এদিকটি কখনো দেখতে চাননি। এ উপন্যাসেও তিনি তাঁর মতো করে সৌন্দর্য খোঁজেন। এ খোঁজাখুঁজিও আসলে তাঁর কাছে অন্য অর্থে মুক্তিরই প্রতীক। ট্রেনের নিচে কাটা পড়া রমণী দেখেও পাঠককে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিতে চান তিনি।

সুহাসিনীর সৌন্দর্য এ লেখার অন্যতম চমৎকার দিক। সেই সৌন্দর্যের প্রতীক তার পমেটম মানে রূপের কৌটা, যা লখাইয়ের মা চুরি করে তার কালোত্ব দূর করার জন্য। সেই মা-ই মুখে পমেটম ব্যবহার করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে যায়। এটিই এ লেখার উল্লেখযোগ্য দিক। আরো এক চমৎকার দৃশ্যের দেখা পায়; কারণ তারা পরস্পরকে পাগলের মতো খুঁজে। মেলায় ওলাওঠার খবর ছড়িয়ে পড়ে। সুহাসিনী আর লখাই যেভাবে যোহন একাদশীকে খুঁজতে থাকে; তাতে মানবিক ধর্মের মেকি গিঁট পেরিয়ে ভিন্নমাত্রা পায় এ উপন্যাসটি। তবে এ লেখায় শরৎচন্দ্রীয় হালকা আবেগও দেখা যায়; কখন কমলকুমার তাদেরকে মহৎ কিছু একটা করে দেবেন, সবাই যেন অমৃতের সন্তান হওয়ার খায়েশ নিয়ে তাই অপেক্ষা করে। এ উপন্যাসে জীবন প্রায়শই এসেছে মুক্ত-জীবনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। রক্তমাংসের মানুষ বেশি দেখি আমরা। লখাই অন্ধকারকে চিহ্নিত করতে চায়, গুলি করে তা তছনছ করে দিতে চায়। গাছের ছায়া, প্রকৃতি, অবারিত জীবন যেন তাদের ভেতর নানান মানবিক সূত্র তৈরি করতে থাকে। বাইবেলীয় মমত্ব, মা-মনসা, শিব, জগন্নাথ, রামকৃষ্ণ, পীর-মাজার মিলে অদ্ভুত এক জীবন দেখি, — এক বাংলা দেখি, একটা সামাজিক অবস্থান দেখি। একজন কমলকুমারের নিখুঁত শৈল্পিকতা দেখি।

স্বপ্ন আর মিথ এখানে একাকার হতে থাকে, — এক ঈশ্বর নয়, সামগ্রিক এক চৈতন্য দেখি! নায়কও এক নয়, সকলে মিলে এক নায়ক সৃজিত হয়, স্বপ্নবীজ পাই আমরা। এইভাবেই আমরা কঠিন অক্ষরে সহজ বচন দেখি, নিজেদের জীবন নিতে নিতে তৎপর হই। ঘাস, আকাশ, সৌন্দর্য, সাদামাটা মানুষজন, স্বাধীনতার তুমুল কামনা দেখে আমরা বিহ্বল হই। মায়া বাড়ে। যেন এ জগৎটাকে বহন করারও বাসনা হয়।

১৩.৭.২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামহীন গোত্রহীন মানুষের দুর্ভিক্ষকথা

কমলকুমার মজুমদার তো কেবল কথাশিল্প রচনা করেননি, এর ভেতর দিয়ে নিজের এক-একটা ছায়া স্থাপন করে গেছেন। তাঁর লেখায় একাল-সেকাল যেমন আছে, আছে ইউরোপ, গ্রিক, ভারত, কলকাতা, — তারচেয়ে বেশি আছে ধুলার জীবন, লৌকিকতার তুমুল স্পর্শ! তিনি প্রতিষ্ঠানের মায়ায় পড়েননি, বরং এস্টাব্লিশমেন্টকে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করেছেন, পাঁপড় ভাজার মতো সবই চুরচুর করে তছনছ করেছেন। সাধারণ জীবনটাকে তাঁর সৃজিত শৈল্পিক আবহ দিয়ে নির্মাণ করে গেছেন। তাতে তাঁর নিজের জীবনের বেড়ে ওঠা, প্রণতি মিশেছে — তা ঠিক, ভাষার কাছে তিনি নিজে গিয়েছেন, তিনি ক্রমে ক্রমে কথাশিল্পের প্রচলিত অংশীদারিত্ব অচল করতে ছিলেন! তিনি দ্বিধাহীনই থেকেছেন। কখনো রামকৃষ্ণ, কখনো মাটিঘেঁষা আচরণের প্রতি মায়া প্রকাশ করেছেন, তবে তাঁর মূল বাসনা ছিল লৌকিক জীবনের মুখচ্ছবি আঁকার দিকে। তিনি অনেকটাই মুক্ত, দ্বিধাহীন, হয়ত অনেকটাই প্রতিষ্ঠানহীনও।

আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করব, *খেলার প্রতিভা* যার নাম। এতে যত রকমের ক্যারিশমা আছে, মানুষ, সমাজ, প্রতিষ্ঠানকে চেনানোর কৌশল আছে, ভাষাকে তছনছ করে নিজের রাজত্ব কায়েমের প্রচেষ্টা যে আছে, আমরা তাও স্মরণ করব। আমরা তাঁকে পাঠ করি, — এবং এইসব নিয়ে তাঁর সনে আমাদের সময়-যাপন হয়। আমরা প্রতিসময় একই কথার পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকি, — কমলকুমার মজুমদার নিয়ে আমরা কথা বলি, তাঁর সখিতা ছাড়তে মন চায় না। কেন তাঁর সঙ্গে কথা বলি? কেন আমরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করি না? কারণ আমাদের মনোজগতে মায়া তবু রহিয়া গেল। কার জন্য তা রয়ে গেল? তা কার জন্য আবার, কমলকুমারের জন্য, তাঁর পাঠকের জন্য, সর্বোপরি মানুষের জন্য তো বটেই!

সময় যাচ্ছে, সময়ের স্রোতের ভেতর নিজেকে জাগ্রত রাখতে পারছেন কমলকুমার — আলোকিতও হচ্ছেন। এই সময়েও তিনি যেন চুপচাপ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারপাশটা জাগিয়ে রেখেছেন। একজন সফল শৈল্পিক কূটনীতিক তিনি। কারণ তিনি এখন তো আমাদের মাঝে জৈবিক সত্তা হিসেবে নেই; নিজে নিজেকে জাহির করতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর আশপাশ তাঁকে ঘিরে জেগে উঠছে। সময়কে নিজের আওতায় নেওয়ার নিগূঢ় কৌশল তাঁর আছে। তার উত্তরসূরি বা পূর্বসূরি নেই, তিনি একা একাই নিজের পথ রচনা করেছেন। কখনো বিদ্যাসাগর, কখনো বঙ্কিম তাঁর লেখায় কিঞ্চিৎ ঝিলিক দেন, মৃত্যুঞ্জয় বা রামমোহনও আসেন, তবে তিনি নিজের মতোই একটা জায়গা করেছেন। বিদ্যাসাগর যত স্থিরলক্ষ্যমুখী, প্রতিষ্ঠানকে উঁচিয়ে ধরতে চেয়েছেন। তিনি তা করেননি। পথ নিজের মতো সাজাতে চেয়েছেন, বাক্যস্থ চিহ্ন তার অধীনে নিতে তৎপর ছিলেন, ক্রিয়া ব্যবহারে সাধু বা চলিত রীতির কাছে তেমন থাকেননি, বরং দেশজ বা নিজস্ব একটা মিশ্ররূপ তিনি দিয়েছেন। এতে প্রথাগত ব্যাকরণ নেই, ভদ্রজনদের বইপত্রর নীতিমালা নেই, আছে বাংলার একটা গেঁয়ো রূপ। তিনি যেন নিজের ভাবে দেখছেন, বুঝেছেন, — বর্ণনা তাঁর কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে। কিউবিস্ট শিল্পবোধও নয়, তবে এই বাংলার জল-হাওয়ার একটা রূপ তাঁর কাছে ছিল। তাই দিয়ে বিশাল ক্যানভাস তিনি এঁকেছেন। ইউরোপের মোহ যাদের আছে, বা, যারা ইউরোপতা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, বইপত্র বুকে নিয়ে স্কুল-কলেজের নিয়মের কাছে নিজেকে বন্ধক দিতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি ছিলেন না। তাঁকে তো সেখানে থাকতে হয় না। কারণ তিনি নিজেই নিজের একটা জগৎ রচনা করেছেন, একধরনের শৈল্পিক দশা তাঁর ছিল।

উপন্যাস ইউরোপের, বা তথা হতে আগত — এমনটি যারা ভাবেন, তিনি সেইভাবে আমাদের উপন্যাস নির্মাণ করতে চাননি। তাঁর উপন্যাসে দেশজ ঐক্য আছে, আলাদা একটা সুর আছে, জটিল একটা স্বর আছে। জল-হাওয়ার গন্ধ আছে। গঙ্গাজননী আছে। দেশজ ঠাকুরের কৃপা তাঁর প্রয়োজন হয়। এ এক রূপ, এক কামনা, বা আরাধনা, যা এই বঙ্গে তখন ছিল। উনিশ শতকের ব্যক্তি তখন লৌকিক জীবনকে আশ্রয় করে ক্রমে ক্রমে আধুনিকতার মায়ার দিকে যাচ্ছে। তাঁর সৃজিত মধ্যবিত্ত খুব বেশি ভদ্র নয়, কারণ তারা জননীর দিকে, নদীর দিকে, সর্বোপরি মৃত্তিকালগ্ন থাকতে চেয়েছে। তিনি যে সৌন্দর্য সৃজন করেছেন, রূপের জোয়ার আনতে চেয়েছেন, তা দেশজ জল-হাওয়ার মায়ায় যে সিক্ত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আমরা সেইসবকে স্মরণ করেই তাঁর থিমমুখর উপন্যাস *খেলার প্রতিভা* পাঠ করি, সমস্ত নিয়ম যেন এখানে তছনছ করা উপন্যাস *খেলার প্রতিভাসনে* বোঝাপড়া শুরু করি।

খেলার প্রতিভা দুর্ভিক্ষের ওপর লেখা অতি-আশ্চর্য এক চিত্রকল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক তাঁর অনেক লেখার মতোই এর মুখবন্ধে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কিছু নমুনা হাজির করেছেন। বন্দনাগীতের মতোই রামকৃষ্ণ, মহাপ্রভু, বর্গভীমার নাম নিয়েছেন। তিনি যেন ভুলতেই চান না যে, সনাতন ধর্মের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, আছে লৌকিকতার দুর্দান্ত প্রণয়। তিনি জীবনকে জমিন-ধুলা-ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে চেখে চেখে উপস্থাপন করেন। আমরা এ উপন্যাসে মানুষের মিছিল দেখি। তাদেরকে সরাসরি মানুষ না বলে মনুষ্যদেহের কঙ্কালই বলা দরকার। তারা একটা দল, তাদের আলাদা কোনো নাম নাই, জাত নাই, ভিন্ন শরীরও যেন নাই — তাদের আছে কেবল দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। তারা বেড়িবাঁধের দিকে চলছে, একজন আরেকজনকে অবলম্বন করে কাদাজলে পা টিপে চলছে। সড়ক বড় পিচ্ছিল, মাটি দোঁআশ, কখনো বা এঁটেল। তারা লৌকিক জীবনের ভেতর দিয়ে চলা মানুষ, তাদের ভাষায় সূক্ষ্মতা নাই, তারা গেঁয়ো, তারা বিদ্যাসাগরের ভাষার সূক্ষ্মতা স্বপ্নে দেখার প্রত্যাশী। তারা নামহীন, সমাজহীন, এমনকি সত্তাহীন মানুষ যেন। তারা ক্ষুধার ভাষা দ্বারা চালিত হচ্ছে। তাদের পেটে ক্ষুধার অন্ধকার, চোখ কোটরে বসা, হস্তপদ প্যাংলা, তারা তীব্র-তীক্ষ্ণ কষ্টে নিপতিত। ক্ষুধা তাদের জীবনকে নামবঞ্চিত করছে, সমাজ থেকে আলাদা করছে। নাম অনেক স্থলে থাকে না, যেমন হাসপাতালের রোগী, কারখানার শ্রমিক, হোস্টেলের বর্ডার, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এইসব দলীয় মানুষদের কথা বলা যায়। তারা মৌলিক জীবন হারায়, প্রতিষ্ঠানের মেকি জীবন পায়। জীবন-মৃত্যু নিয়ে তাঁর লৌকিক চরিত্রসমূহ নিজেদের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, — সেখানে জীবিতের খেলা খতম হলেই তাদের ডাক পড়ে।

আমাদের মনে হতে পারে, এ উপন্যাসে কোনো চরিত্রেরই নাম নেই। আসলে এ দলটি বিনে উপন্যাসে যারা উচ্চবর্গীয় তাদের কিন্তু পরিচয় আছে। তাদের চিহ্ন আছে, — তারা কেউ হাজী সাহেব, কেউ পীর, কেউ রায়বাহাদুর, খানসাহেব, রায়সাহেব, ডাকাত, পুলিশ, ডাক্তার। আছে বিদেশি সংস্থার কাজ, আছে বিদেশ-বাণিজ্য! তারা বিভিন্নভাবে এ দলটির সঙ্গে রিলেটেট হয়। কেউ-বা সাহায্য করে। তারা একটু চালের জন্য মারামারি করে, খুন হয়, চিকিৎসা চায়, নানান মানুষের কাছে সাহায্য চায়। তারা আদিম পুস্তকে বর্ণিত ধরনে যেন ক্ষমা পাওয়ার জন্য দলবেঁধে চলে। তাদের এই যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষতাড়িত জীবনকে পাপের ফসল মনে করে। তারা সেই পাপ থেকে উদ্ধার চায়। তারা সামন্ত আবহের কাছে নিজের চরিত্র, কষ্টের মূল কারণ নির্ণয় করতে জানে না। ধর্ম, সমাজ, প্রতিষ্ঠান তাদেরকে মোহিত করে রাখে। তারা লোকাচার করেই ক্ষুধার ভেতর দিয়ে চলে। শোষণের কারণের কথা তারা জানে না, শ্রেণির কথায় মাথা দেওয়ার মতো সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা তখনো তৈরি হয়নি। তবু মানুষজনের নানান সম্ভাবনার ভেতর দিয়ে কমলকুমার আসল সত্যটি প্রকাশ করতে ভুলেন না। সমাজের নানান স্তরের উদাসীন, বেভুল আচরণই আমাদেরকে দুর্ভিক্ষের মৌলিক কারণ বলে চিহ্নিত করায়। আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ইতিবৃত্তে যাই, মুনাফার ফন্দি দেখি। আকালের অতি ভয়াবহ মূর্তি দেখি। আমরা যেন আঁতকে উঠি। জীবন কত যে ভয়ঙ্কর! অন্যদিকে, মানুষ কীভাবে মৌলিকত্ব অর্জন করতে পারে, সহজ জীবন পায়, লৌকিক আবহে নিমজ্জিত হতে পারে, ঠাকুরের স্পিরিচুয়াল মায়া পায়, তারই নানান বয়ান আমরা শ্রবণ করি। এত কিছুর ভেতর নিষ্ঠাবতীদের উপবাসও হয়, তারপর হয় পারণ, ঋতুস্নান, অম্বুবাচীর নিবৃত্তি! আমরা বারবার একটা অতিলৌকিকতার স্পর্শ পাই, পুরো গ্রন্থে বারবার এসেছে 'বড়ো আশা করে এ পিঞ্জরে...' — একটা পিঞ্জর, পাখি, মানুষের মায়া বারবার কমলভাবনায় এসেছে। মানুষের প্রতি মানুষের সৃষ্টিশীল সহজাত মায়ায় তাঁর জীবনভাবনার একেবারে মৌলিকত্বে লেগে আছে। তাঁর মায়ার কাছে আমরা বারবার আসি, একে দেখতে চাই, বুঝতে চাই, স্পর্শ করতে চাই। এ উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে এক পাওয়ালা যে ভিক্ষুক আসে, সেও যেন তার কষ্টের ভেতর, চিহ্ন প্রকাশের ভেতর এমনই মায়া রাখিয়া যায়। সেই মায়া, সেই কণ্ঠস্বর না জানি কত বছর আগের মানুষের কণ্ঠ হতে এসেছে! এই দেহে মানুষ আর প্রকৃতি দুইই নাকি মরে! এমনই জাদুর ভেতর, বাস্তবতার গভীর ছায়ার ভেতর আমাদেরকে তিনি রেখে দেন। কমলকুমারের ঈশ্বরত্ব এমনই জ্যান্ত, রূপময়! প্রকৃতির কাছে বারবার নিজেকে উজাড় করে রেখেছেন। দেহের মায়ায় পড়েছেন, মায়ার অন্তস্থ মায়ার কাছে নিজেকে হাজির-নাজির রেখেছেন। মানুষকে, সর্বতো অতি সাধারণ মানুষের জীবনবন্দনা তাঁর ছিল। এখানেই তাঁর মৌলিকতা।

তাঁর ভাষায় কবিতা আছে, লৌকিক আবহ আছে, নিজেকে ভাসিয়ে রসিয়ে প্যাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। ভাষার এমনতর মায়াময় আচরণ আর কোনো কথাশিল্পীর আছে বলে বলা যায় না। তাঁর যেন কোনো পরিকল্পনা নাই, নীতিও তেমন নাই, আছে নিজের ভেতর দিয়ে, ভাষার কুহকী মায়ার ভেতর দিয়ে, সমাজকে দেখানোর তুমুল বাসনা। প্রচলিত ভাষারীতিকে তিনি এখানে নিজেই উপহাস করলেও তিনি তাঁর স্বনির্মিত স্টাইল থেকে মোটেই নিজেকে বিযুক্ত করেননি। এর লৌকিক আবহ একটা উল্লেখ করার মতোই ঘটনা বটে। আমরা ভাষার আলাদা জৈবিকতা দেখি, জীবন পাই, এ জীবন প্রতিষ্ঠানের বাইরের, একেবারে লেখকের নিজের জিনিস। আমরা তাতে নিমজ্জিত হই। একধরনের শিল্পত্ব এখানে নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব চরিত্র মিলে একটা আকাঙ্ক্ষা বা যন্ত্রণার দিকেই ধাবিত হয়েছেন তিনি। ইয়ং প্রযোজিত সমন্বিত চৈতন্যপ্রবাহ এই সৃজনশীলতার প্রধান দিক। ক্রমশ তিনি যেন এমনই সাধনার দ্বারা একটা কিছু সিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছেন। ভাষার কত যে স্বাধীন নৈরাজ্যিক নমুনা আমরা পাই — এর প্রথম প্যারাগ্রাফটি পাঠ করা যাক —

'মাধব যে তুমি মহাপ্রভুতে, মাগো যে তুমি বর্গভীমা, ঠাকুর জয় রামকৃষ্ণ! যে এখন আমরা এখানেতে নিজেরা বিস্তারিব, যাহা ঘটিল, তাহারে নির্মাণ করি, এবং এই অভিমান ভুয়া না হউক, যে মানে, আমাদের বোধিত হওনের যেমন ধারা, যেমন প্রকৃতি, যেমন উপাদান, যেমন ভিৎ তা এইটিতে উল্লেখ থাকিবেক; যে আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব।' এই স্থলে ভাষার প্রচলিত কোনো নিয়মই ফলো করা হয়নি। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, সাধু, চলিত, লৌকিক, আলালীয় ভাষা, যৌগিক বাক্য, অচেনা ক্রিয়াপদ, মিশনারি বাংলার এক অতীব আশ্চর্য মিশ্রণের ফলে ভাষার মুখোমুখি হই আমরা। কোনো নিয়মই যখন ফলো করা হলো না, তখন ভাষার এই নৈরাজ্যিক অবস্থাকে আমরা কী বলব? প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়া-গুঁড়া করার মনোবিলাস? তা কি বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার মনোতৃষ্ণা? নাকি নিজেকে আলাদা করে দেখানোর এ এক তুমুল পরিকল্পনা? এখানে সমন্বিত ভাবনার ভেতর দিয়ে আলাদা জগৎ নির্মাণের পরিকল্পনা আমরা পাই। চরিত্রবিহীন, প্রায়-নির্দিষ্ট মানুষহীন একধরনের সমন্বিত চৈতন্য আমরা পেলাম। সারাটি উপন্যাসে এমন অপ্রচলিত শিল্পের স্বাদ নিই আমরা।

আবারো বলতে হয়, এখানে কারো নাম তিনি ব্যবহার করেননি, অর্থাৎ কোনো চরিত্রেরই কোনো নাম তিনি দিতে চাননি। কেন? তার মানে কি নাম-ধাম ছাড়াও তবে সমাজ হতে পারে। ঊনবিংশ শতকের '৪২-এর দুর্ভিক্ষে কি এমন নাম-ধামহীন সমাজের অস্তিত্ব ছিল? তবে তিনি কেন এমনটি করলেন? তা কি শুধু নিজেকে নিজে ভাঙার কৌশল থেকেই? নাকি এমন সোসাইটির স্বপ্নও তিনি দেখেন? মানুষ তখনই নিজেদেরকে বেশি অচেনা করে যখন নিজেদের স্বকীয়তার ব্যাপারে বেশি সচেতন হওয়া শুরু করে? নাকি তার মনের গভীরে লালন করা সনাতন যুগই বারবার চোখের সামনে ভাসতে থাকে? তা হলে সনাতন ধর্মের কাছে, সংস্কারের কাছে কেন মানুষের ক্ষুধাকে সমূলে সঁপে দেবেন! এখানে আমরা দেখি যে তাঁর কোনো চরিত্রই ক্ষুধাকে নিয়ে কোনো বাদ-প্রতিবাদই করে না। কেবলই নিয়তির কাছে, ধর্মের কাছে, ধর্মের শৃঙ্খলের কাছে নিজেদেরকে সঁপে দিয়ে তীক্ষ্ণ অন্ধকার উপভোগ করেন তিনি। কী যে অচিন জীবন আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষ দেখে-দেখে চমকে উঠি! মনে হয় এসব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক সমন্বিত ইঙ্গিতই তিনি দিতে চান না। নিজেকে কি তিনি নিজের মতোই সাজিয়েছেন! কাউকে তিনি তা হলে তাঁর নিজের সাজানো এলোমেলো বাগানে ঢুকতে দেবেন না? সবই তাঁর আরোপিত? অমিয়ভূষণ যদি হোন প্রবৃত্তি-জাগানিয়া মানসসত্তার ধারক, সুবোধ ঘোষ যদি হোন আচরণ-জাগানিয়া অপূর্ব শিল্পী; কমলকুমার তা হলে অসাধারণ সৌন্দর্যপিপাসুর স্ব-আরোপিত জটিলতা প্রত্যাশী লৌকিক কথক।

কমলকুমার কি নিয়তিঘেঁষা কুসংস্কারময় জীবনের ছবি আঁকার জন্যই আটঘাট বেঁধে নামেন? এখানকার প্রতিটি মানুষ যেন অন্ধকার দিয়েই তৈরি। আলোর কোনোই পরশ কোথাও চোখে পড়ে না। এত কষ্টের পরও তিনি ওদেরকে কোনোভাবেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর একটা ইশারাও দেবেন না? নাকি এ আসলে সেইসব সনাতন ধারণা, যা আসলে মানবসমাজের প্রজন্ম বেয়ে-বেয়ে অন্য প্রজন্মে পৌঁছে? তা হলে ধরে নিতে হয় তিনি ঘুরে-ফিরে সনাতন জীবনের চারপাশে আমাদেরকে রেখে দিতে চান! তা নয় তো। তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পাঠককে অভাব-অনটন-দুর্ভিক্ষের মূল কারণ, তার সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে সরাসরিও ছড়াতেন। এমন নির্মোহ যন্ত্রণা পাঠককে সহ্য করতে হতো না। তাঁর কথা, কথার ভেতরকার শক্তি, ডেসপারেটনেস অন্য জায়গায়, তা তাঁর রূপকে, সাংকেতিকতা, হেঁয়ালিতে, চিহ্নে, ঠাকুরকে স্মরণের ধরনে প্রকাশ পায়। সমাজকে তিনি তখন ধসিয়ে দিতে চান। মুক্ত জৈবিক স্বাধীনতার প্রকাশ তখন আমরা বুঝি।

এ উপন্যাসের সঙ্গে অন্যগুলির একটা মৌলিক ভেদ আছে, তা কিন্তু শুধু চরিত্রবিন্যাস দিয়েই নয়, উপন্যাসের মৌলিক ব্যাপ্তিতেও এর পার্থক্য তুমুল আকারেই বিদ্যমান। সোজা হিসাবেই বলা যায়, *খেলার প্রতিভার* ব্যাপ্তির সঙ্গে অন্যগুলির তুলনা চলে না। দুর্ভিক্ষকে চেনানোর কৌশল, জীবনকে একেবারে ভেতর থেকে দেখার তাড়না, চরিত্রবৈশিষ্ট্য, ভাষার নানাবিধ পরিচর্চা, সাংস্কৃতিক ইতিহাস চেনানোর প্রচেষ্টা, বৈষ্ণবীয় ধারার কথকতা, সাহিত্যিক চরিত্র (বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, *রামায়ণ/মহাভারতের* চরিত্র), দারিদ্র্যের অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ই এখানে নানান আঙ্গিকে চিহ্নে পূজনে স্থান পেয়েছে। এখানে গল্পবলার ধরনও অনেক জাগতিক, মৌলিক, সুরাসুরে ভরপুর। জীবন অনেক কাছের মনে হয়।

এ সৃজনে *অন্তর্জলী যাত্রা* বা *সুহাসিনীর পমেটমের* মতো ব্যাপক আয়োজন নেই; আলাদা কোনোকিছুই যেন দেখা যায় না। এর ভেতরই যেভাবে তিনি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এঁকেছেন তা সত্যিই দুর্লভ। নিজেকে যিনি অতিক্রম করার ধ্যান-জ্ঞান করে তাঁর কথাসাহিত্যের ডালপালা বিস্তার করেন তিনিই তো কমলকুমার। এবং তিনি তাঁর *খেলার প্রতিভায়* রীতিমতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তা-জাগানিয়া কাজটিই করেছেন। এমন দৃশ্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে বিরল। একের পর এক দৃশ্য যেন নাট্যমঞ্চে ঘটাচ্ছেন। লেখায় দাঁড়ি বা প্যারাগ্রাফ না থাকলে কী হবে, তাঁর চরিত্রসমূহের নানামাত্রার বাঁকবদল আমরা যেন তাঁর সাজানো জীবনগাথায়ও দেখতে পাই।

এ উপন্যাসে যে চরিত্র আছে যেন ভাবসমান এক-এক সত্তা। উত্তর-আধুনিকতার এমন ধারাও দেখা যায়, যেখানে লেখকের নামও বিলুপ্ত করার পক্ষে তারা। পাঠকের স্বাধীনতা আর সৃষ্টিশীলতা তাতে হয়ত প্রকাশ করার একটা ধারণা থাকে। মানুষকে গ্লোরিফাই করার একটা বিষয় থাকতে পারে। ব্যক্তির দাপট তাতে কমে কি না জানা নাই, তবে এইভাবে শিল্পের বিকাশ সম্ভব কি না তা একটা তর্ক বটে! তাহলে তো লেখকের দায়ভার কেউ নেবে না। তেমনি আরো থিওরি দেখা যায়, যাকে রিডার-রেসপন্স-থিওরি বলা হচ্ছে। এখানে পাঠকই সৃষ্টিশীলতার বা টেক্সটের মিনিং আবিষ্কার করবে। কমলকুমারের নামহীন চরিত্রের সঙ্গে এইসবের আদৌ কোনো মিতালি বা ভাবনা আছে কি না তার কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, তবে চরিত্রের নাম মুছে দেওয়ার ভেতর যে নিম্নবর্গীয় হতচ্ছাড়া মানুষের প্রতি ভিন্নধরনের সহমর্মিতা আছে তা এতে বোঝা যায়। এভাবেই শিল্পের বহু দিক প্রকাশ্য হয়। আমরা নানা দিকের কথা ভাবতে পারি। তা ভাবতে বাধ্য হই আমরা। তিনি হচ্ছেন আমাদের সেই কথাজন, তিনি ক্রমশ আলো ছড়াচ্ছেন। আমাদের বিকশিত করছেন। আমরা একান্ত লৌকিক হতে আছি। আমরা তাকে নিয়ে জীবন উদ্‌যাপন করতে পারছি।

১৬-৯-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবপূজারি কমলকুমার

তিনি, কমলকুমার মজুমদার, যাঁর সম্পর্কে আমরা খানিক কথা বলব, কার্যত তিনি এক মানবপূজারি। তাঁকে আমরা দেখে দেখে চিনে নেব, চিনতে চিনতে নিজেদের ভেতরকার মানুষটাকে আরেকবার পরখ করে নেব, মনুষ্যজন্মের নানান স্তর চিহ্নিত করতে থাকব। তবে আমরা তাঁর সাহিত্যে সৃজিত ঈশ্বরের কাছে যাব না, বরং তাঁর স্বোপার্জিত ঈশ্বরকেই চিহ্নিত করব। তবু তাঁকে তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা স্মরণ করব, খানিক যাচাই-বাছাইও না হয় করে নেব। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যসম্ভার থেকে যা-ই পাঠ করি, তাতে কেবলই মনে হয়, বিশাল বাংলার বিশাল ল্যান্ডস্ক্যাপে তিনি প্রকৃতি, মায়া আর স্বভাবকেই এঁকেছেন। তাঁর যত কিছু সৃজনকর্ম সবই এইসবের ছায়া ধরেই অগ্রসর হয়েছে। তবে কথাক্রমেই বলতে হয়, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সমগ্র জীবন, মৃত্যু আর রামকৃষ্ণের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে তিনি আনতে চাইতেন। হয়ত তাঁর ব্যক্তিত্বও তাই চাইত। তিনি নিজে হয়ত রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের বাইরে যেতেও চাননি। নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শান দিয়ে, শিবের মতো শ্মশানচারী না হোক, খালাসীটোলার নেশাবাহিত জীবন সহযোগে নিজেকে একেবারে ভেঙে দুমড়েমুচড়ে, চেখে, নিংড়ে দেখতে চেয়েছেন। আসুন পাঠক, আমরা তাঁকে দেখি, এর ভেতর দিয়ে আমরা নিজেকেই হয়ত দেখি, পাঠক হিসেবে কিছু সৃজনও করি। পাঠকেরও সৃজনশীলতা তো থাকা লাগে। তবে তাঁকে পাঠের ভেতর তাঁরই সৃজিত কিছু ব্যবস্থাপত্রও মেনে চলতে হয়। কারণ তিনি কিছু শাসনেরও প্রবক্তা বটেন! আমি অবশেষে সিদ্ধান্ত নিই, তাঁকে কোনো মুগ্ধতার ভেতর দিয়ে দেখব না। আবার একটা প্রণালির ভেতর তাঁকে আটকেও রাখা যাবে না। বিশাল মাঠের বিপুল জমিনের মতো লম্বা জায়গায় তাঁকে একেবারে উদোম করে দেখতে হবে। তাঁর স্বাধীনতা, তাঁর প্রেরণা বা রঙ্গ-রস একেবারে তাঁর অন্তর্জগতে প্রবেশ করে দেখা দরকার। যখন তাঁকে পাঠ করি, তখন একধরনের মাদকতা আমাদের মনোজগতে ভর করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ত রামকৃষ্ণের জীবনপ্রীতি আমাদের অন্তর্গত বোধের কোথায় যেন বিচরণ করে। কমলকুমার পাঠ করব, কিন্তু রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হবে না তা তো হতে পারে না! তাঁকে আমরা মোকাবেলা করতে চাই, ততই হয়ত একটা না একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন করেন তিনি। তাঁর জীবনলীলার বাইরে থাকা মুশকিলই, — অন্তত কমলকুমার পাঠে তাঁর কর্মযজ্ঞের আনাগোনা থাকেই। কাজেই কমলকুমার পাঠ মানেই কথাসাহিত্যের ভেতর দিয়ে রামকৃষ্ণের লোকায়ত জীবনকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করে যাওয়ার এক ব্যাপারও বটে। তাঁর লোকায়ত লীলা যদ্দূর পারা যায় খানিক দূরে রেখে একজন কমলকুমারকে, বিশেষত, তাঁর উপন্যাসজগতে খানিক বিচরণ করে নিই না হয়। কমলকুমার মানেই আমাদের কথাসাহিত্যের জগতে এমন এক যুবরাজ, যিনি উদ্ভাসিত করতে জানেন। তাঁকে আমরা দেখি, কখনো দেখি না। কারণ তার রূপ কখনো সৃজনে, কখনো স্থিতিতে, কখনো-বা ধ্বংসে প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি রামকৃষ্ণ সহযোগে তিনি এ যুগের কালচারে এক বাসরও বসিয়েছেন মনে হয়। আমাদেরকে তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না; অথবা, আমাদের ভেতর অপেক্ষার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। কারণ কমলকুমার এসেছেন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে, — তবে তাঁর এ নিঃসঙ্গতা ক্রমাগত কাটতে থাকে, তিনি ক্রমে বহু জনে লিপ্ত হন, ধীরে ধীরে নিজের হাজিরা পাকাপোক্ত করার নিমিত্তে অনবরত কাজ করে যান। তবে তাঁর এ পদচারণা একেবারে বিস্ময়মুক্তও নয়। বরং বলা যায়, তাঁর কাজই হচ্ছে, পাঠককে কখনো মুগ্ধতা, কখনো চঞ্চলতায়, কখনো-বা দারুণ টেনশনে রাখা। আমরা হয়ত এভাবে ভাবি যে তিনি কি ঠিক বলছেন, — এভাবেই কি সাহিত্যের সত্য রচিত হয়! এইসবের কি আদৌ কোনো মানে দাঁড়ায়? এমন বহু আলোচনা তাঁর ভাগ্যে ঘুরঘুর করে। কিন্তু তিনি কারো সমালোচনার দিকে তাকানোর তেমন প্রয়োজনও মনে করেন নাই। তিনি আপন সৃজনকর্মটি আপনার মতোই করে গেছেন। তাঁর জগতে তিনিই ঈশ্বর, তিনি নান্দনিক ধারদেনার ধারও তেমন ধারেননি। কারো কাছ থেকে তিনি খুব বেশি সাংস্কৃতিক ঋণও করেননি। হয়ত তদ্‌বিষয়ে বঙ্কিম/বিদ্যাসাগর বা মধুসূদনের নামটি কেউ কেউ নিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বে তিনিই বাদশা। কেউ তা মানেন আর না-ই মানেন; তিনি কাউকে তোয়াজ করেননি, প্রচলিত সত্য রচনা করেননি। তাঁর সৃজনকর্মের শুরুর দিকটা ভাবলে হয়ত এ কথা বলা যায় না। কিন্তু অচিরেই তিনি নিজের জায়গা ঠিক করে তাঁর জমিদারি শুরু করে ছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আয়-ব্যয়ের বা ধারদেনার একটা সম্পর্ক থাকতেও পারে। ঘটনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবহমানতা, বর্ণনার মায়াজাল, যতিচিহ্নের প্রয়োগ, মানবকুলকে দেখার ধরন ইত্যাদি মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের একটা ছায়া তাঁকে মাড়াতে হয়েছে বলে জোর দাবি করাই যায়। তবে এর সঙ্গে বৈদিক সাহিত্য, ইংরেজি-ফরাসি, লোকায়ত জীবনসাধনাও যুক্ত হয়।

তিনি কী লেখেননি! গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন; সম্পাদনা করেছেন, নাটকের ডিরেকশন দিয়েছেন। আড্ডার মধ্যমণি হয়ে থেকেছেন তিনি। মদে চুর হয়ে থেকেছেন, অন্যকে সমানে খারিজ করে দিয়েছেন, বারবার বাসা বদল করেছেন। দুনিয়ার তাবত বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ। সবচেয়ে বেশি পাঠ করেছেন মানুষ। মানুষকে তিনি রীতিমতো সাধনা করেছেন। ভাষা, সময় আর লেখকদের ভেতর অতি সহসাই নানান বিষয় পরখ করতে পেরেছেন। এর সব মিলিয়ে আমরা একজন কমলকুমারের সাহিত্যিক ন্যাচার দেখার চেষ্টা করব। তবে এ দেখার শুরুতেই আমার সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে বরং কিছু কথা বলি।

তিনি আমাদের বাংলা ভাষাভাষী লেখক হলেও আলাদা রাষ্ট্রের এবং পরিবেশের লেখক বলেই তাঁকে আমরা বিবেচনা করতে চাই। এতে দোষ-গুণের কিছু নাই, আছে বাস্তবতার বাঁধন। প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র তার ভাষাকে আলাদা করে, পরিবেশকে আলাদা করে দেয়। জীবন আলাদা হয়। তবু একই ভাষার ধারাবাহিকতার ছাপই যে-কোনোভাবে থাকবে, তা তো আমরা জানিই। বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর প্রেম তো ভাষা দিয়েই, সেখানে সংস্কৃতির হেরফের খানিক আছে, তবু সেইভাবেই তাঁকে বিচার করা দরকার। তাঁকে আমরা সেইভাবেই দেখিও, — যেখানে থাকে খানিক মমতা আর খানিক ক্রিটিক্যালি দেখার ভাবপ্রবণতা। তাঁর প্রতি যে আমাদের মোহ আছে, যে ভয় বা বিচ্ছিন্নতা আছে, তারও কারণ নির্ণয় করতে চাইতে পারি আমরা। আমরা বলতে চাই যে, '৪৭-এর পর আমাদের রাষ্ট্র আলাদা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীর মনোজগতে আলাদা আলাদা ভাবের পয়দাও হয়েছে। আমরা ভাষা পেলাম, যাকে বলে রাষ্ট্রের ভাষা, — কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কর্কশ শাসকদের কঠিন থাবার মুখোমুখি হলাম আমরা। ভাষার জন্য জীবন দিতে হলো, আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনবাসনার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করলাম। জল-কাদা-হাওয়া-নদ-নদীর বাঙালরা, বিশেষত মুসলমানরা, বাঙালি হওয়ার বাসনা লালন করতে থাকল। শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমরা তো কবেই এই বাঙালদের বাঙালি হওয়ার কাহিনি বা বাসনাকে একরকম খারিজ করেই রেখে ছিলেন। তবু ভাষার দাবিতে, সাংস্কৃতিক অবস্থাকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা গণঅভ্যুত্থান ঘটালাম, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে অস্ত্র হাতে অংশ নিলাম আমরা। বাঙালির লড়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মাত্রায় পৌঁছাল, ২৬টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ একটা রাষ্ট্রের জন্ম নিতে দেখলাম। এই যে আমাদের এই লড়াই, সাংস্কৃতিক অবস্থানকে স্পষ্ট করার দ্রোহ, তাতে বাঙালিত্বের স্ফুরণও ঘটল, — এত-এত বাস্তবতার ভেতর দিয়ে গেলেও কমলকুমারের লেখায় তা খুব বেশি আসেনি। কোনো লেখায় তার ছায়া তেমন করে পড়তে দেখলাম না আমরা! যে দেশে রজনী নাই, তিনি সেই দেশে যেতে চান, কিন্তু কঠিন কঠিন সব রজনীর ভেতর দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ তাদের সময় পার করল, সেই দিকে তিনি খুব বেশি কেন দেখলেন না! আফসোস! একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যে মানুষ অকাতরে জীবন দিলো তা অনুধাবন করে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। মানুষের যন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু যারা কলকাতায় গিয়ে নানান অনুষ্ঠানে মজেছেন, সরাসরি যুদ্ধে যাননি, একধরনের ক্ষমতার চর্চা করেছেন, টাকা জমানোর নামে অনুষ্ঠান করেছেন, তা সহ্য করতে চাননি তিনি। এই হচ্ছে কমলকুমারের দিক থেকে আমাদেরকে দেখার বহুমাত্রিক নমুনা। আর আমাদের অবস্থানটা কী? পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় অবস্থা আর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নানান কঠোর বাস্তবতার ভেতর দিয়েই আমাদের যেতে হয়েছে, — সাতচল্লিশের দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহের খানিক ছায়া দিয়ে আমাদের ভেতর নিজস্ব একটা জীবনবোধ দানা বেঁধেছে। আমাদের টোটাল সাংস্কৃতিক আবহের ভেতর একজন কমলকুমারকে কোথায় জায়গা দেওয়া যাবে? সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন বটে। কারণ আমরা তো সাংস্কৃতিকভাবে একজন রামকৃষ্ণ, মা শ্যামা, বৈদিক জীবনবোধের সঙ্গে অত নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারি না, যা আসলে একজন কমলকে জানার, বোঝার, এমনকি তাঁকে চোখস্থ করার জন্যও দরকার। এর সঙ্গে কমলকুমারের নিজস্ব জটিল সাহিত্যধারা তো আছেই। তো, এতসব বিষয়-আশয়ের ভেতর একজন কমলকুমারকে কি অপরিহার্য মনে করতে পারি আমরা? তা অবশ্যই পারি, কারণ তা পারতে হবে। বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র, রবিঠাকুর, মধুসূদন, প্রমথ চৌধুরী যেমন আমাদের সাহিত্যিক প্রণোদনার অপরিহার্য অংশ, একজন কমলকুমারও ঠিক তাই। তাই আমরা আমাদের জটিল বাস্ত ব অবস্থার ভেতরও একজন কমলকুমারকে সাধনা করব।

আমরা বরং তাঁর মনোজগতের কিছু বিষয় এখানে স্মরণ করি। এটা বলতে হবে যে তাঁর পাঠক খুব বেশি নেই। পাঠকের তিনি ধারও ধারেননি, এমনটি আমাদের মনে হতেও পারে। আবার তা সঠিক বলে ধরতে ধরতে মনে হবে, তা তো নয়, তিনি তো পাঠকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন! সাহিত্যকে তিনি একটা ভিন্ন সাধনার স্থল বলেই মনে করতেন। সাহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ভাষাও নিজের মতো করে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, ভাষাযোগে তুষ্ট করার কথাও তিনি সরস্বতী সমীপে ভিন্ন বলেছেন। তার মানে, তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মীয় আবহ একটা বিষয় বটে! তবে তাঁর যে পাঠক, তারা হয়ত সাহিত্যমগ্ন মানুষই। এটা তো বলতেই হয়, জনপ্রিয়তার কোনো ইশারা বা আয়োজন তাঁর সাহিত্যপাঠে নেই। ভাষা, পাঠকের সংখ্যা, টিকে থাকার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নানাভাবে তাঁকে নাজেহাল করার একটা প্রবণতা সাহিত্যজগতে আছে। এমনকি তাঁকে খারিজ করার লোকের অভাব নাই। তারা বলে যে তাঁর ভাষা সঠিক নয়, ভাব ঠিক নয়, তিনি অতি-পশ্চাদগামী, তাঁর ছিল সাংস্কৃতিক বাহিনী, যারা তাঁকে অমর করার পাঁয়তারা করছেন, সাহিত্যিক কতিপয় বন্ধু তাঁকে অমর করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছেন বলেও প্রচারণা চালানো হয়। তো, কথা হচ্ছে, বান্ধব মারফত সাহিত্যে কি এভাবে নেশা লাগানোর বিষয়? একজন সাহিত্যিকের একেবারে অন্তর্দেশে যদি নিজেকে দীর্ঘজীবী করার রসদ না রাখতে পারেন, তাহলে তিনি কী করে নিজেকে সদা-জাগ্রত রাখবেন? বিশেষত তার মৃত্যুর পর তা আদৌ কি সম্ভব? এ বিষয়টাও আমরা দেখার চেষ্টা করব। আমরা বরং তাঁর সাহিত্যসাধনার একেবারে গোড়ার খবরই নিই। তাঁর জন্ম ১৯১৪-এর ১৪ নভেম্বর, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তাঁর বাবা প্রফুল্ল কুমার মজুমদার ছিলেন পুলিশ অফিসার, দারুণ স্বাধীনচেতা, ছেলেকে তাঁর স্বোপার্জিত স্বাধীনতার কথা বলতেন, নিজের নিয়মে বাড়তে অনুমতি দেন। তাঁর মা রেণুকুমারী মজুমদার, যিনি ছিলেন সাহিত্যমগ্ন মানুষ। এই মগ্নতাই কমলকুমারকে সাহিত্যের জগতে আগমনের ইশারা দেয়। বালককাল থেকেই পারিবারিক সাহিত্যযোগ্য পরিবেশের ভেতর তিনি বড় হন, — পড়েন *রামায়ণ*, *মহাভারত*, অন্যসব বৈদিক সাহিত্য। তাঁর নজরে আসে মধ্যযুগের কাব্যসৌকর্য। তিনি পড়েন মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন। নানান সাংস্কৃতিক পেশার সঙ্গে হয় তাঁর পরিচয়। ফিল্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়ে। সত্যজিতের সঙ্গে একধরনের রিলেশন তাঁর ছিল। আবারো স্মরণ করতে হয় যে, নানামুখী কাজের ভেতর তিনি মঞ্চনাটকের ডিরেকশনও দিয়েছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন তাতে ইংরেজি সাহিত্য যেমন ছিল, ফরাসি সাহিত্যের প্রতি ছিল তীব্র ঝোঁক। পশ্চিমা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেককিছুই তাঁর জানা ছিল। রামকৃষ্ণ আর রামপ্রসাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে তাঁর। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে প্রান্তজন বিষয়ে অনেক স্টাডি করেন তিনি। লক্ষ্ণৌ, মুলতান থেকে শুরু করে পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান। মানুষের জীবন দেখেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাহিত্য বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর পাণ্ডিত্য তিনি নানাভাবে অর্জন করেন। সাহিত্যের নতুন জগৎ সৃজন করার দিকে তিনি নজর দেন। তিনি ক্রমশ হয়ে ওঠেন লোকায়ত জীবনবোধের এক কাণ্ডারি। জীবনকে তিনি একেবারে স্পর্শ করে দেখে চেখে নেয়ে তাঁর শিল্পভুবন ভরে তুলেছেন। তিনি তিরিশি সাহিত্য জগতে যাননি; কোনো সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছেও যেতে চাননি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, মার্কসীয়, অস্তিত্ববাদী, বা কথিত নৈরাজ্যিক বাস্তবতার কাছেও যাননি। তিনি মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন রামকৃষ্ণীয় লৌকিক প্রবণতা নিয়ে, উত্তর-উপনিবেশের ভেতর জীবনযাপন করে উপনিবেশের কাছে নিজেকে সঁপে দেন তিনি। তিনি যাননি ইংরেজের কাছে, তাদের একেশ্বরবাদের কাছে, বা ব্রাহ্মধর্মের কাছেও। বঙ্কিম তাঁর প্রিয় সাহিত্যজন হলেও কৃষ্ণের কাছেও যাননি; রামমোহনে আস্থা রাখেননি। রবিঠাকুর তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বলে মনে হয় না। কোনো পশ্চিমা দর্শনের প্রতি তাঁর মাখামাখি নাই। বরং তিনি নিজেকে নিজের প্রতিস্পর্শ করেছেন। লোকায়ত ধর্মের কাছে নিজেকে ঠাঁই দিতে চেয়েছেন। তিনি ভাষা নিয়েছেন তাঁর একটা আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে। সেখানে তিনি কখনো-বা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বা ফরাসি বাক্যরীতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। তিনি যে কথাশিল্প চর্চা করলেন, সেখানে ভাষার একটা নৈরাজ্যিক অবস্থা আছে। তিনি যে জীবন চেনাতে চেয়েছেন, সেখানে এই ভাষারীতির হয়ত প্রয়োজনও ছিল। তিনি যে চলচ্চিত্রিক একটা আবহ তাঁর কথাশিল্পে সৃজন করতে চান, তা তাঁর একেবারে প্রথম বাক্যেই থাকে। একধরনের মায়ার ভেতর দিয়ে তিনি উপন্যাস শেষ করতে চান, যা তাঁর উপন্যাসের শেষদিকে থাকে। তিনি যে সনাতন হিন্দুধর্মের, বিশেষত, রামকৃষ্ণের লোকায়ত জীবন ভাবনা বা লাইফস্টাইল দ্বারা প্রভাবিত হতে চান, তা তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে লেগে থাকে। তাঁর এ সৃষ্টির নানান মাত্রা, রূপ, নবতর ভাষাকৌশল, কাহিনি-চরিত্র-থিমের সম্মিলিত রূপ, আখ্যানের নতুন ধরন, কাব্যসুধা ইত্যাদি যে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন, আমরা বরং তাই দেখে নিই।

কমলকুমারকে চিনতে গেলে আমাদের চেনা লাগবে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে, তার চেয়েও বড় কথা মা কালীকে। রামপ্রসাদের কাব্যবিগ্রহ তাঁকে জড়িয়ে আছে। তাঁর সহজতা, লৌকিক গান, মায়ের আরাধনা, কালিকাকীর্তনমুখর ব্যক্তিত্ব কমলকুমারকে খুব আকৃষ্ট করেছে। বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমলীলার স্থলে মানবলীলার জন্য তিনি যেন বঙ্গ-সংস্কৃতির এক অপরিহার্য সংযোজন। সেই যোজনের দিকেই কমলকুমার তাঁর মন-প্রাণ যুক্ত করেছেন। রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যেমন তাঁর লেখার সমস্ত ধারণায় প্রকাশ পেয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি এ দেবীর অষ্টরূপকে তিনি তাঁর কথাশিল্পে প্রয়োগ করেছেন। ভাষার নানান পরিবর্তন, মাটির কাছাকাছি নিয়ে জীবনকে দেখা, কলোনিয়াল যুগে একজন মাটিলগ্ন কলির দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল যথার্থ এক কর্ম বটে। আমরা এখানে ব্রাহ্মধর্ম আর আর্যবাদকে স্মরণ করতে পারি। ঈশ্বরের প্রতিস্পর্শী হিসেবে এই দুই ধর্মমত তখন ছিল সোচ্চার। তবে তাদের কাজ ছিল ইন্টেলেকচুয়াল সোসাইটিতে। তাঁদের ধর্মমতের বাইরে, এমনকি সীমানার বাইরে, একেবারে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে শিকড়লগ্ন মানুষ ছিলেন রামকৃষ্ণ, যাঁর ভক্ত ছিল প্রচুর। কালীদর্শনেই ভগবান দর্শন মনে করলেও তিনি যত মত তত পথের অনুসারী ছিলেন। সনাতন ধর্মের পূজারি হলেও সর্বমহলে ছিল তাঁর আনাগোনা। এক সত্তার ভেতর বহু সত্তার লেনদেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দিয়ে তিনি অনেক কাজই করতে চাইলেন, — বর্ণভেদে ভরপুর নিজের ধর্মকে বাঁচাতে চাইলেন, কলোনিয়াল যুগে খ্রিষ্টধর্মমতকে না ক্ষেপিয়েও নিজের ধর্মের মান-ইজ্জত রক্ষা করলেন, রামকৃষ্ণের লৌকিক আচরণ দিয়ে কলকাতার বাবু-কালচারকে মোকাবেলা করলেন, প্রতিষ্ঠানকেও মোকাবেলা করতে পারলেন তিনি। এই যে এতগুলি কাজ, একটা মাত্র কালচারকে ফলো করে করা গেল, কমলকুমারও এইসবকে মগজে নিয়ে তাঁর সাহিত্যকে আলাদা জায়গায় স্থাপন করতে পারলেন কিন্তু! আমাদের যেটা মনে হয়, কমলকুমারকে এইভাবে চর্চার একটা পজেটিভ দিক আছে, যেখানে তাঁর সাহিত্যকেও একেবারে অন্তর্জগতে পৌঁছে দেখা যেতে পারে। তার মানে এটা অতি স্পষ্ট বিষয় যে, কমলকুমারকে পাঠ করতে গেলে, উত্তর-উপনিবেশ যুগে উপনিবেশ কালের একজন ব্যতিক্রমে-মুখর-কথাশিল্পীকে যাচাই করাই যায়। এই ক্ষেত্রে রবিঠাকুর, মার্কসীয় চেতনার বিষয় আর বঙ্কিমকেও তিনি কীভাবে দেখলেন তার একটা স্পষ্ট ধারণা সাংস্কৃতিকভাবে আমরা করে রাখতে পারি।

এবার দেখা যাক, তার কালে কী কী ধারার সাহিত্যিক স্রোত ছিল! রামমোহন-বিদ্যাসাগরের একটা গদ্য ছিল, গদ্য ছিল বঙ্কিমের, মার্কসীয় রিয়েলিস্টিক ধারা তো তখন ছিলই, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য তো কলকাতার ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ করে ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মপুকুরে স্নানকরত তদীয় একটা রূপ নিল, একেই আবার অনেকেই প্রকৃত সাহিত্যিক গদ্য বলে মেনে নিচ্ছেন। প্রমথ চৌধুরীরা একটা গদ্য চালু করতে চাইলেন তখন। *কালি-কলম* মারফত আমরা নানান ধরনের গদ্য পেলাম। বাংলাদেশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-সৈয়দ হক-শহীদুল জহিররা চৈতন্যপ্রবাহরীতির একটা গদ্য চালু করলেন। হাসান আজিজুল হকের শিল্পমুখর স্নিগ্ধ একটা গদ্য আছে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নানান বাঁক নিয়েও ভিন্ন একটা গদ্য তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালু করতে পারলেন। সুবিমল মিশ্র যে প্রতিবেদনধর্মী স্টাইলের সরাসরি একটা গদ্য চালু করতে চাইলেন, তাও বাংলাদেশে একটা সময়ে খুব চর্চা হতো। সন্দীপন আর অমিয়ভূষণের গদ্যও কখনো কখনো চর্চা হতে দেখি। এমনিতর নানান ধরনের গদ্যের ভেতর কমলকুমার এত ভিন্ন ধরনে আছেন যে সেখানে তাঁর ফলোয়ার খুব একটা দেখাই যায় না। তার মানে তাঁর রাজত্বটা তাঁরই; তবে তা চেনা যায়। আমরা তাঁর চেনা ভাষাটা নিয়েই প্রথমত কিছু কথা বলে নিই।

প্রথমেই আসা যাক তাঁর সৃজিত গল্পসমূহের আলাপনে, — প্রথম দিককার গল্প, যেমন, 'জল', 'মধু', 'তেইশ' ইত্যাদির ভাষারীতি অনেকটাই সনাতন ধারার। তাঁর ভাষার পরিবর্তন আসা শুরু করে 'তাহাদের কথা', 'কয়েদখানা', 'নিম অন্নপূর্ণা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তাঁর গল্পে ভাষার চূড়ান্ত জটিলতা দেখা যায় 'পিঙ্গলাবৎ', 'খেলার বিচার', 'বাগান কেয়ারি', 'খেলার আরম্ভ' ইত্যাদিতে। তবে ভাষার বিষয়টা একেবারে নিপুণভাবে দেখতে গেলে তাঁর উপন্যাস জগতেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। গল্পের মতো তাঁর সব উপন্যাসেও ভাষার তারতম্য আছে। *শবরীমঙ্গলের* ভাষা তো আর *অন্তর্জলী যাত্রায়* নেই। আবার *শ্যাম-নৌকা* বা *খেলার প্রতিভার* ভাষা তো *সুহাসিনীর পমেটম* বা *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক-এ পাওয়া যাবে না। *শবরীমঙ্গলের* ভাষাশৈলী একেবারেই প্রথাগত। আমরা বরং *অন্তর্জলী যাত্রা* থেকে কিছু কথা বলতে পারি। তাঁর ভাষার যে চমৎকার কাব্যিক চলিষ্ণুতা তাও শুরু এই উপন্যাস থেকেই। তাঁর শব্দ যেন শব্দ নয়, যেন চিত্র গলে গলে পড়ছে। শব্দ দিয়ে এক মহৎ চিত্রায়ণ আমরা আলাদা দেখছি যেন। আমরা শব্দের এমন আলোকময়তা আর কোথাও পাই না, রূপও একেবারে নতুন মনে হয়। ভাষার শক্তি কত প্রবল হতে পারে, তা আমরা এখানে পাই। আমরা গদ্যের প্রথাগত বিন্যাস থেকে ক্রমাগত সরে যেতে দেখি। এমনকি যতিচিহ্নের ব্যবহার আমাদের ব্যাকরণমাফিক থাকে না। তাতে লৌকিক ক্রিয়াপদ যেমন থাকে, থাকে প্রমিত বর্ণনার ভেতর সাধুভাষার ক্রিয়াপদ। আরবি/ফারসি/সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখি। তবে বাক্যের যে স্বর পাই, তাতে বৈঠকি তীব্রতাও আছে। তাঁর এক-একটা সৃজনকর্মের প্রথমদিকে বাক্যের যে কাঠিন্য থাকে, তা ক্রমে সরে যায় কিন্তু। আমরা ক্রমে মজাদার এক গল্পের জগতে ঢুকি। গদ্যে যে মানবিক-ঈশ্বর থাকেন, সনাতন রূপ থাকে, তা আমরা দেখি। আমরা ভাবি, একসময় আমরা পাই যে বাক্যের তুমুল প্রবাহে আসলে স্বোপার্জিত এক ঈশ্বর থাকেন! আমরা ক্রমে আমাদের ভেতর উদ্ভাসিত এক সামাজিক চিত্র দেখি। বাংলার এক জমিন এখানে উন্মুক্ত হয়, যাতে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, বাঙালির যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশ্র সংস্কৃতি আছে, দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে, তাই তাঁর গদ্যে একধরনের দলিল হিসেবে হাজিরা দিয়েছে। আবার তাঁর ভাষা বদলে যেতে দেখি *শ্যাম-নৌকায়*। ভাষায় যে উদাসীনতা, যন্ত্রণা, হাহাকার থাকে, তা তো *খেলার প্রতিভায়* এসে কী যে অদ্ভুত জগৎ তৈরি করতে থাকে। এসবে ভাষার যে চিত্র থাকে, যাতে হয়ত খানিক গুরুচণ্ডালী ভাব বা নৈরাজ্যকর অবস্থা দেখি। তবে এ নিয়ে লেখকীয় কিছু ব্যাখ্যা হয়ত থাকতেও পারে। এ উপন্যাসে মানুষের সব হারানোর যে বিষয়, দুর্ভিক্ষের যে নিয়মহীন জীবন আমরা দেখি, নাম না পাওয়ার সিম্বল ধরে ভয়ঙ্কর জগৎ সেখানে যে পাই, তাতে কিন্তু স্বেচ্ছানির্মিত এই ভাষার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতেই হয়। ভাষা তো নয় যেন দাবিপূরণের এক-এক ল্যাবিরিন্থ সৃজিত হয়েছে এখানে। সমস্ত *সুহাসিনীর পমেটমে* এক প্যারায় যে নানামুখী জীবন দেখি, অনেক চরিত্র দেখি, শকুন্তলার চেয়ে সুন্দর রমণী দেখি, বর্ণপ্রথা ভেঙে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি হতে দেখি, — সেখানে শব্দ, বাক্য, প্যারার প্রচলিত নখরামি থাকার কোনো প্রয়োজন আছে কি? এমনকি *গোলাপ সুন্দরী* বা *অনিলা স্মরণে* উপন্যাসে আমরা যে জীবনের রূপ পাই, জাদুবাস্তবতা দেখি, ভালোবাসার বিচিত্র বিন্যাস দেখি, তাতেও ভাষা নিয়ে আমাদের তেমন অবজেকশন থাকার কথা নয়। এ তো কার্যত সাহিত্যিক এক-এক জীবনদশা! আর চূড়ান্ত দশা অবস্থায় তো স্বাভাবিক পর্যায়ের বিষয় কামনা করলে চলে না।

কথা হচ্ছে, ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে কথা বলে রাষ্ট্রীয় একাডেমি, ভাষার সমাজ, ভাষাব্যবস্থাপনা, — সর্বোপরি রাষ্ট্র। ইতিহাস তাতে থাকে। একটা শৃঙ্খলাও তাতে বিরাজ করে। কিন্তু কমলকুমার বা তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ বা তাঁদের গুরু নৃমুণ্ডুমালিনী শ্যামা কি সেই নিয়মের ধার ধারতেন? অন্যায় আর শৃঙ্খলকে কি তিনি একধারসে কচুকাটা করেননি? লোকায়ত সমাজ, মিথিক অ্যারেঞ্জমেন্ট কি এই ইতিহাসকে, মিথের এই বিষয়কে পূজা করছে না? তাহলে চৈতন্যমুখর আর মুক্ত মানুষের কাছে যার দায়বদ্ধতা থাকে; সেই তিনি, মানে কমলকুমার কেন অত নিয়ম মানবেন? নিয়ম কারা মানে? যারা নিয়ম নিয়ে আজীবন নিয়মের দয়া চায়, নিজের সত্তা বিকিয়ে দেয়, — তারাই তো নিয়ম মানে? তাহলে একজন নৈরাজ্যিক স্বপ্নচারীর কাছে অত নিয়ম কেন আশা করি আমরা? তার তো অত নিয়ম-টিয়ম মানার দরকারই নাই। কারণ তিনি মানামানি ধরনের নাটুকেপনার জন্য তো শিল্পের কাছে যানইনি।

কমলকুমারের সাহিত্য, বিশেষ করে, উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে গেলেই তাতে সাকার/নিরাকার, থিম বনাম আখ্যান, শুদ্ধতা বনাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগাখিচুড়ির প্রসঙ্গ আসেই। তাঁর সাহিত্যে মনোজাগতিক কাজ হয়। তিনি পাঠকের অন্তর্জগতে এমন ক্রিয়া জায়মান করতে সমর্থ হন যে পাঠকের মনোজগৎ আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না। যেহেতু তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত, যেহেতু কথিত ঈশ্বর দর্শনে তিনি নিজেকে সঁপে দেন, রামকৃষ্ণের ভাব আর রামপ্রসাদের কাব্যবিগ্রহে আস্থা রাখেন, তাই তাঁকে নিয়ে অত কথা হয়। তিনি প্রায় সব উপন্যাসের শুরুতে দেব-দেবীর নামে বন্দনা করেন; কাজেই কথনশিল্পে সাকার/নিরাকার, থিম ইত্যাকার বিষয় নিয়ে তো কথা আসবেই। আমাদের যা মনে হয়, দেব-দেবীর নামে তাঁর এ বন্দনা হচ্ছে এক কর্মকৌশল মাত্র মূলত তাঁর ভক্তি রামকৃষ্ণে আছে, সেই রামকৃষ্ণ হচ্ছেন মানুষকে সহজভাবে ভালোবাসার এক প্রতীক মাত্র। কমলকুমার তাঁর নানান উপন্যাসে মা শ্যামার নানান রূপের মাধ্যমে মানবপূজাকে আরাধ্য করেছেন। তবে কথাক্রমে আবারো বলতে হয়, শ্যামা মায়ের সংহার রূপকেই আমরা প্রণম্য মনে করি, — কিন্তু তাঁর তো আছে অষ্টরূপ। সেই রূপের নানান মায়া তাঁর শিল্পে আছে। যেমন, *অন্তর্জলী যাত্রার* টোটাল ইমেজের ভেতর শ্যামার শ্মশানরূপই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈজুর নানান ক্রিয়াকর্মে, তার অন্তর্জ্বালায়, প্রেমে; এ রূপ বারবার একটা অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে। *সুহাসিনীর পমেটমে* শ্যামার প্রেম রূপ একটা দরকারি প্রসঙ্গ, আবার *শবরীমঙ্গলে* শ্যামার সংসার রূপ প্রতীকরূপী একটা বিষয় বটে। আবার *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক নামের উপন্যাসে শিবের নানান রূপ বেশ প্রভাববিস্তারী একটা বিষয় হয়ে আছে। *শ্যাম-নৌকায়* আছে সংসারের মায়ারূপ, *খেলার প্রতিভায়* দেখি প্রাণক্ষয় রূপ। চরিত্র যেন এমন সব রূপের আবহে পড়ে তাদের সময় পার করছে, এমন একটা ভাবনাকেও কমলকুমার স্থায়ীরূপ হিসেবেই ছেড়ে দেন না। তিনি মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেন।

থিম তাঁর উপন্যাসের একটা বিষয় হলেও তাতেই সব ছেড়ে তিনি বসে থাকেন না। *শবরীমঙ্গলে* মানবের প্রেমের বিষয়টা থাকলেও তাতে নানান ধরনের আবহ তৈরি হয়। এর প্রথম দিকে মাধালী আর রুমনির জাগতিক প্রেমই মুখ্য মনে হয়, তারপর মাধালীর সঙ্গে চার্চের বোঝাপড়ার বিষয় আছে; এবং শেষে দেখি, মাধালীর খ্রিষ্টীয় বৈরাগ্য আর অন্যসব চরিত্রের নানান দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবস্থান। তবে মাধালীর চরিত্রের ভেতর দিয়ে একজন রামকৃষ্ণকেই তিনি হাজির করতে চেয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অত সরল উপস্থিতি তাঁর আর কোনো সৃজনকর্মে নেই। এ উপন্যাসের একেবারে শেষ দিকে মাধালী আর রোমনির প্রেমের ভেতর দিয়ে পুরো সমাজকে একটা ঝাঁকুনি তিনি দিলেন। রোমনিকে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধালীর কম্পমান অবস্থার চিত্ররূপটি এ উপন্যাসের প্রাণভোমরা হয়ে আছে। *অন্তর্জলী যাত্রায়* ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে মানবতার একটা বোঝাপড়া বরাবরই ছিল। যশোবতী ধর্মের কাছে নিজেকে বলিই দেয়, তবু তার ভেতর যে পতিগতা প্রাণ, এমনকি সতীদাহের মতো কাজেও নিজেকে সমর্পণের আপাত কর্তব্যপরায়ণ অবস্থা আছে বলে মনে হয়, তা সবই মেকি। সীতারাম নামের মৃত্যুমুখী বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হওয়া এ নারী জীবনের প্রতি ভালোবাসা প্রতি পদে পদে দেখিয়েছেন। সেটা বাবার বিদায়ের সময়, স্বামীর প্রতি কর্তব্য, সর্বোপরি বৈজু চণ্ডালের প্রতি একধরনের আকর্ষণ চরিত্রটিকে মানবিক রূপই দিয়েছে। *শ্যাম-নৌকা* আর *অনিলা স্মরণে* নামের উপন্যাসে ধর্মীয় অনুষঙ্গ বারবার এলেও রক্তমাংসের মানুষ কি আমরা দেখি না? *অনিলা স্মরণে* নামের উপন্যাসে বাবার প্রতি অনিলার জৈবিক টান যেমন আছে, তেমনি অনিলার মা লাবণ্য দেবী যে তার জৈবিক টানে বৈধব্যকে উদযাপন না করে বরং আরেকটা সংসার-জীবনের দিকে নিজেকে সমর্পণ করলেন, তাই জীবনের জয়গানে ভরপুর। তার জীবনের নতুন প্রেম তাকে যেন নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ করে দেয়! *শ্যাম-নৌকায়* অভাবের কাছে পিতৃটান পর্যন্ত তছনছ হয়ে গেছে। তবে এখানেও মায়া আছে, আছে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার অতিজাগতিক বাসনা। এ স্বল্পায়তনের উপন্যাসের কাব্যবিগ্রহ একেবারে *সুহাসিনীর পমেটম*কে স্মরণ করায়। মায়ার বাঁধন আর যতিচিহ্নের স্বোপার্জিত ব্যবহার একে আলাদা এক মর্যাদা দিয়েছে। এ উপন্যাসের অন্যতম দিক হচ্ছে, মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর-অবিনাশী প্রচেষ্টা। পরাজিত না হওয়ার তুখোড় মানবিক চেতনার ভেতর কাজ করেই মানুষ এগোয়। কমলকুমার এসব অত্যন্ত কাব্যময়তায়ই আঁকতে থাকেন। ছোট্ট এ উপন্যাসটির প্রধান নান্দনিক দিক হচ্ছে এর ভাষাসৌকর্য। অবশ্য ভাষার যে স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে দেখা যায়, তাতে কারো-কারো বঙ্কিমের অপরূপ ভাষামাধুর্যের কথা মনে পড়তে পারে। তবে এখানে ফরাসি-ইংরেজি ঢঙে তিনি তাঁর ভাষাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছেন। কমলকুমারের ভাষার যে জটিলতা এখানে আছে, একে কষ্টার্জিত বলা যাবে না নিশ্চয়ই। তাঁর এ নিপুণতা তিনি পুরো উপন্যাসটিতে দেখাতে পেরেছেন। *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক-এর আরম্ভটি খুবই চমৎকার। ভক্তি, মুক্তি, জ্যোতির্ময় শিবপুরীর বর্ণনা বেশ মনোহর এক আয়োজন। মুক্তির আনন্দের ভেতর আধুনিক জীবনের সীমাবদ্ধতাও এখানে দেখার এক বিষয় বটে। যে কারো মনে হতে পারে, কমলকুমার সনাতন ধর্মীয় আবেশের প্রতি খুবই সহনশীল। কিন্তু পাঠকের এমনতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহ ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বৈরাগ্যসুন্দর সাধক কত হিংস্রভাবে মন্দির নিজেদের দখলে রাখে তাই তিনি দেখান। বর্ণবাদকে তিনি স্পষ্ট করেছেন, সেই মেসেজ পায় পাঠক। এইসব সাধকদের ধানাই-পানাই তাদের নেশার সময়ও দূরে থাকে না। এ হিংস্রতা এ উপন্যাসের মূল চরিত্র, শিবপুরীতে হারিয়ে যাওয়া বালক সুঘরাইকে হতবাক করতে থাকে। ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় জীবনদর্শন; এর অন্তর্নিহিত বর্ণ দেখে পাঠক আঁতকে উঠতে পারেন। তবে উপন্যাসটির বড় বিষয় হচ্ছে, বর্ণনার তুমুল আয়োজন, চরিত্রকে একেবারে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার দুরন্ত বাসনা। এখানেই কমলকুমার একেবারে অনন্য হয়ে ওঠেন। *সুহাসিনীর পমেটমে* বর্ণময় জীবনের স্বাদ আমরা পাই। একটা প্যারাগ্রাফে লেখা এ উপন্যাসের বিচিত্রমুখী মায়াবী রূপ বাংলা কথাসাহিত্যের এক মাইলস্টোন, এর কাছেও বারবার আমাদের ফিরে আসার প্রয়োজন আছে। ভাষার কাঠিন্য সরিয়ে পাঠক যখন এর অন্তর্জগতের মায়াবী রূপ দেখবেন, বা দেখতে সমর্থ হবেন, তখনই তিনি কথাশিল্পের এক স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যমুখর জগতে প্রবেশ করবেন। এখানেও জাদু আছে, জীবনের জাদু — *গোলাপ সুন্দরী*র মতো এর অন্তর্জগতে যেন তরতাজা গোলাপ সদা বিকশিত হয়। মৃত্যুও তাঁর কথনশিল্পের একটা অনুষঙ্গ হয়ে আছে। *অন্তর্জলী যাত্রা*, *শ্যাম- নৌকা*, *অনিলা স্মরণে*, *খেলার প্রতিভায়* তা ঘুরেফিরে এসেছে। মৃত্যু নিয়ে তাঁর একধরনের ঘোর হয়ত ছিল।

উপন্যাসের প্লট সৃজনে সমাজের বহুস্তরে তিনি নিত্য ভ্রমণ করেছেন। *শবরীমঙ্গলে*র কথাই ধরা যাক, এখানে তিনি ক্ষুদ্র একটা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে যেমন এনেছেন, খ্রিষ্টীয় জীবনকথাও আছে তাতে। *অন্তর্জলী যাত্রায়* সনাতন ধর্মীয় নানান উপচারের ভেতর থেকে মানবিক সত্তার এক নির্যাস স্পষ্ট করেছেন। *সুহাসিনীর পমেটম* তো নানান রঙের এক রঙিলা দুনিয়া আমাদের সামনে একেবারে অদ্ভুত এক ল্যাবিরিন্থ হয়ে ধরা দেয়। *খেলার প্রতিভায়* যে দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষের জীবন আছে, তাদের বদলে যাওয়া জীবনের জান্তব রূপ আছে, তা আর কোনো উপন্যাসের সঙ্গে মিলে? *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক-এ মনে হতে পারে লয়ের দেবতা শিবের এক বিশাল জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করালেন তিনি। আসলে তো এই উছিলায় ধর্মের জাতপাতের গোষ্ঠীই তিনি উদ্ধার করে ছাড়েন। তাঁর দেখার নিপুণতা কথাশিল্পে আর কোথায় আছে? এও এক মজাদার চ্যাপ্টার বটে!

তাঁর লেখায় থিম তো আছেই, কাহিনিও আছে, আর তা নিয়ে শিল্প হলো কি হলো না, তা নিয়ে মাপামাপির কিছু দেখি না। প্রত্যেকটা উপন্যাসের নিজস্ব চরিত্র আছে। চরিত্রের বিকাশও তাতে আছে। সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিলা স্মরণেই হোক আর নামধামহীন চরিত্র-সমাহারের উপন্যাস *খেলার প্রতিভার* কথাও যদি আমরা বলি। এখানে দুর্ভিক্ষের কঠিন-ছায়া আলাদা এক মাত্রা নিয়ে এসেছে। আমরা জানি যে কারাগার, হাসপাতাল, হোস্টেল ইত্যাদি মানুষের স্বভাবজাত চরিত্র বদলে দেয়, সেখানে মানুষ তার সামাজিক চরিত্রের নাম পর্যন্ত হারিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এখানে দুর্ভিক্ষ নামের ভয়াল বাস্তবতাও মানুষের নাম মুছে ফেলেছে। সারাটি উপন্যাসে মানুষের কোনো নাম নেই, — নামহীন কিছু ছায়া কঠিন যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে তাদের সময় পার করে। আমাদের টোটাল কথাসাহিত্যে এমন বিষয় আর দেখি না।

তাঁর ভাষা নিয়ে তো কথার শেষ নাই। এ ভাষা তাঁর চেনা জগতে ছিল, সে জগৎ হয়ত আর কেউ চেনে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে আঠারো শতক বা তারও আগের ভাষার সংমিশ্রিত ধরন কে আর খুঁজে বার করেন? এখানে একটা বিষয় সরাসরি বলে নেওয়া ভালো, সৃজনশীল সাহিত্যের ব্যাকরণ সাহিত্যের অন্য শাখার নিয়ম-কানুনের সঙ্গে যে মিলে না, তাই তিনি বারবার যেন প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রতিটি শব্দের, চিহ্নের, বাক্যের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তিনি যেন খোদাই করে করে তার মায়াবী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে বসে তার চরিত্র, ঘটনা, এমনকি থিমের ভেতরও নানান সময়ের, নানান ভাবনার সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন। তাতে সাধুরীতির সঙ্গে প্রমিত, এমনকি লোকায়ত গদ্য একেবারে মিশে গেছে। যতিচিহ্নের ব্যবহার এখানে পাল্টে গেছে। বিশেষ্য আর বিশেষণের ব্যবহার উল্টে গেছে, বাচ্য তার জায়গা বদল করেছে। এসব মানা যায় কি? ব্যাকরণ বা প্রতিষ্ঠান বলে কিছু মানলে তা মানা যায় না। তো, কথা হচ্ছে, একজন সৃজনশীল মানুষ কি একাডেমির কাছে নিজেকে বন্ধক দিতে বাধ্য? তার কি স্বাধীনতা নাই? এটা একধরনের সত্য যে আমরা যতই স্বাধীনতার কথা বলি, রাষ্ট্র কখনো তার বান্দাকে স্বাধীনতা দেয় না, — তার আচরণের কাছে, নিয়মের কাছে, শৃঙ্খলের কাছে, বন্দি রাখে। সাহিত্যকে বন্দি রাখার বড় কৌশল হচ্ছে তার ভাষারীতি। কিন্তু প্রকৃত লেখক কখনো প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেন না, নিজেকে বন্ধক দেওয়ার কোনো সিস্টেমে তিনি থাকেন না। মুক্ত হওয়ার অনেক উদাহরণ আছে, আমরা বরং এখানে কমলকুমারেরই দ্বারস্থ হই, তিনিও তো নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। নিজেকে স্বাধীন রাখার পাঠ আমরা তো তাঁর কাছ থেকে নিতে পারি। রামকৃষ্ণ যেমন নিজেকে ইংরেজ, আর্যবাদ, ব্রাহ্মবাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, নিজেকে মাটিলগ্ন রাখতে প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন; কমলকুমারও তা-ই করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে রামকৃষ্ণ নিজের জাতপাত ভুলে সনাতনী-খ্রিষ্টান-মুসলিম তথা সবার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার অপূর্ব বাসনা রাখতেন, কিন্তু কমলকুমারের তা ছিল বলে মনে করা মুশকিলই। তাই তো একই ভাষাভাষী হয়েও, গায়ের সঙ্গে গা লাগানো পূর্ববঙ্গের কোনো রাজনৈতিক সংকট তাঁর বিবেচনায় আসেইনি!

তিনি মূলত সাহিত্যিক সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এ তাঁর সাধনাও বটে। তাঁর মনোজগতে আছে চিরন্তন সজীবতা। আমরা যে উপন্যাস চিনি, মানে ইউরোপতা যেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে, তিনি তা লালন করতে চাননি; বরং এর থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন, তাতে মৌলিকত্ব আনতে চেয়েছেন। তিনি কিছু মানুষের কথা বলেছেন, সেই মানুষকে তিনি চেনেন, তাদেরকে সাধনা করার মতো কায়দা ও করণকৌশল তাঁর জানা আছে। যার জন্য, যে চরিত্র তাঁর আওতাধীন নয়, যে মানুষকে সাধন-ভজন করা যায় না (যদিও তারা বাংলায় কথা বলেন), তিনি তাঁর পছন্দসই মানুষের কাছেই গেছেন, পাপ-তাপ-সংস্কারের কাছেও নিজেকে নিয়ে গেছেন। এটা একধরনের সীমাবদ্ধতা বলে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু বায়বীয় সত্য তিনি রচনা করেন না। এখানে তাঁর মৌলিকত্ব, এখানেই তাঁর দৃঢ়তা।

তিনি যে বাংলা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য বীজপুরুষ তা স্বীকার না করে উপায় নেই, যদিও কেউ কেউ তাঁর লেখাকে হেঁয়ালিপূর্ণ আর উদ্ভট গদ্যশৈলী বলেছেন। সেটা তিনি হয়ত বলতেই পারেন; কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, তিনিই সফল লেখক যিনি শুধু অপরকে নন, নিজেকেও উৎরে যেতে পারেন। কমলকুমারও তা-ই করেছেন — অনবরত নিজেকে ভেঙেছেন, ফের ভিন্নমাত্রায় গড়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে সন্দীপন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমল চক্রবর্তী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদুল জহির বিনে আর তেমন লেখকের নাম বোধ হয় নেওয়া যায় না, যাঁরা অনবরত নিজেদেরকে ভেঙেছেন এবং কখনো কখনো নিজেদেরকে শিল্পসৌকর্যতায় অতিক্রমও করে গেছেন। সম্পূর্ণ যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে সমুদয় সৌন্দর্যকে উপস্থাপনের সম্ভাবনা বিস্তৃত করার সম্ভাবনা তৈরি করতে চাননি তিনি। সত্যম-শিবম-সুন্দরমের নান্দনিক দাবির বাইরে খুব একটা বিচরণও করেননি। তাঁর চৈতন্যে ধর্মীয় চিন্ময়ীরূপ হয়ত বিস্তৃত হয়েছে, তবে মানুষের জৈবিক আকর্ষণ বা ন্যাচারকে তেমন ভোলেনওনি। তিনি অনেকটা দার্শনিক-নন্দনতত্ত্ববিদ হেগেলের সৌন্দর্যবিষয়ক ভাববাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাত্ম ধরনের ভাবনা সহযোগে পৌরাণিক ধারণার পঞ্চভূতের অপার রূপদর্শনের মৌতাতে মেতেছিলেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা হয়ত স্বনির্ভর হয়নি। এমনকি তা হয়ত তিনি করতে চানওনি। তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব কায়দায় মানব-পূজা প্রচণ্ড দাপটে নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর ভাষায় চিত্রশিল্প আঁকতে চেয়েছেন। এ তাঁর নিজস্ব ধারার এক আয়োজন। তাঁর ব্যক্তিত্বও তাঁর কথনশিল্পের এক মায়ার আধার হয়ে আছে। তাতে বাংলা কথনশিল্পের শৈল্পিক ভ্রমণ অপরিহার্য বলেও আমরা ধরে নিতে পারি।

মানুষ সর্বতো স্বাধীন হতে চায়, নিজের বিকাশ চায়, তার প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ চায়, সর্বোপরি আনন্দের নিত্য অগ্রায়ন তার একটা দরকারি জিনিস। তিনি নৈরাজ্যবাদী, তবে তা পজেটিভ অর্থেই। তাঁকে ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদী বলা যাবে না হয়ত, তাঁকে বলা যেতে পারে প্রবৃত্তিমুখর নৈরাজ্যবাদী। ব্যক্তির নির্জন অস্তিত্ব নিয়ে তিনি ভাবনায় থাকেন বলে মনে হয় না। তিনি সামাজিক জীবনের আনন্দময়তা চান। তিনি ধুমধাড়াক্কা টাইপের জোরালো কিছুই মানেন না, সমাজের নিগূঢ় চমৎকার বিকাশ তাঁর দরকার। তিনি রাষ্ট্রের ধারণা বা স্বাধীনতা বিষয়ে নিজের একটা স্বাধীন মতামত রাখেন। কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাকে স্বস্তি দেয় বলে মনে হয় না। '৪৭-এর দেশভাগ, স্বাধীন ভারত, এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধরন তাকে শান্তি দিয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি অবিরাম স্বাধীনতা চান, কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁর মনের বিষয় নয়। তিনি হয়ত আন্তর্জাতিকতাবাদীই, যার সঙ্গে হয়ত নৈরাজ্যবাদ বা ধর্মীয় আবহের যোগ আছে। রামকৃষ্ণবন্দনা বা সনাতন ধর্মও কোনো জাতীয়তাবাদী বিষয় নয়। এর আন্তর্জাতিক চেহারা একেবারে ঝলঝল করে। রামকৃষ্ণের ভক্ত হিসেবে, প্রকৃতির প্রতি উদার মায়ামমতার জন্যই হোক, স্বাধীনতা তাঁকে শান্তি দেয়নি। তিনি যে শিল্পের কথা বলেছেন বা ভেবেছেন, রঙের অবাধ আচরণ দেখাতে চেয়েছেন তা সহজ কোনো বিষয় নয়; এরিয়াভিত্তিক তো নয়ই। নৈরাজ্যবাদের সশস্ত্র রূপ তাঁর ভালো লাগত না। কিন্তু তিনিই তো ভাষাকে অনবরত রক্তাক্ত করেছেন। নতুন নির্মাণ চেয়েছেন। ভাষাকে বাঁচানোর জন্য, তাকে মহিমান্বিত করার জন্য ভাষার ওপর সাংস্কৃতিক আঘাতকে যথার্থ মনে করতেন।

২৬.১০.২০১৩/০১-১০-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~